সেবকের নিবেদন

অর্থাৎ

শ্রীমদাচার্য্য কেশব চন্দ্র সেনের

উপদেশ।

তৃতীয় খণ্ড।

চতুর্থ সংস্করণ।

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

১৮৩৬ শক, ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ।

[মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা।

৭৮নং অপার সারকিউলার রোড।

বিধান প্রেস।

আর্, এস্, ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচী পত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।

সেবকের নিবেদন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

ব্রাহ্মসমাজ ও নববিধান।

রবিবার ১৯শে পৌষ, ১৮০২ শক; ২রা জানুয়ারি ১৮৮১।

দুই জন ঈশ্বরপ্রেরিত সাধু যথাসময়ে বঙ্গদেশের অন্ধকার ভেদ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রেমের পথ প্রকাশিত করিয়াছেন। সেই দুই জনের নাম অনেকেই জানেন, বলা বাহুল্য। এক জন এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, আর এক জন অনেক বৎসর এই ব্রাহ্মসমাজ পরিপোষণ করিয়াছেন। এক জন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়া বঙ্গদেশের ভ্রম, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি অন্ধকার অনেক পরিমাণে দূর করিলেন, আর এক জন ব্রহ্মপ্রেম প্রচার করিয়া ব্রহ্মোপাসনাকে পরিপুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে পরিণত করিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন। এক জন জ্ঞানাস্ত্রে ভারতবর্ষের অনেক শতাব্দী সঞ্চিত ভ্রমজাল এবং জঙ্গল কাটিলেন, আর এক জন ব্রহ্মপ্রেম প্রকাশ করিয়া নানা স্থানের লোককে একত্র করিয়া সেই পরিস্কৃত ভারতভূমিতে একটি উপাসক-

মণ্ডলীরূপ উদ্যান প্রস্তুত করিলেন। ইহাঁরা উভয়েই ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের বেদবেদান্তপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনাতে জীবনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই দুই জন সাধু মহাত্মা ধন্য! ইহাঁদিগকে ব্রাহ্মসমাজ চিরদিন অবনত মস্তকে কৃতজ্ঞতার সহিত নমস্কার করিবে। এই দুই জনের সাহায্যে হিন্দুসমাজ হিন্দু থাকিয়া যত দূর উন্নত হইতে পারে উন্নত হইয়াছে। এই দুই জন আপন আপন হৃদিস্থিত ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মানুরাগ বলে হিন্দুসমাজকে অনেক দূর উন্নত ও বিশুদ্ধ করিয়া অবশেষে এত দূর উচ্চ স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন যে, সে স্থানে হিন্দুসমাজ আর কেবল হিন্দুসমাজ থাকিতে পারিল না। তাঁহাদিগের দ্বারা সংস্কৃত সেই হিন্দু সমাজ তখন বিস্তীর্ণ পৃথিবীর দৃষ্টিপথে পড়িল। পৃথিবীর দশ দিক হইতে নানা জাতি আসিয়া তখন সেই সংস্কৃত সমাজকে বলিল;—"স্বার্থপর হিন্দুসমাজ, ঈশ্বরের সত্য কত কাল আর তুমি কেবল আপনার জাতির মধ্যে বদ্ধ রাখিবে? আমরা কি ঈশ্বরের কেহ নহি; আমরা কি তোমার সত্যরাশির অংশগ্রহণে অধিকারী নহি? হে হিন্দু, কি কারণে তুমি অপরাপর জাতিকে তোমার স্বর্গীয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবে?"

এ সকল কথা শুনিবামাত্র সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজের স্বার্থপরতা বন্ধন খসিয়া পড়িল। হিন্দুসমাজ আপনার ভ্রান্তি ও সঙ্কীর্ণতা বুঝিতে পারিলেন। কেবল স্বীয় জাতির প্রতি পক্ষপাতী

হইয়া জগতের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করা যে অনুচিত ব্রাহ্মসমাজ তাহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন ঝনাৎ করিয়া হিন্দুস্থানের দ্বার উন্মুক্ত হইল। চীন দেশ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত দেশ ও যত জাতি আছে সমুদয় হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিল। সমুদয় জাতি আসিয়া হিন্দুস্থানের ধর্ম্মকে আপন আপন ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিল। গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধর্ম্মের নিশান, সড়াৎ করিয়া এখন সেই নিশান ভূতলে পড়িয়া গেল, হিন্দুধর্ম্মের নিশানের পরিবর্ত্তে এখন গগনে সার্ব্বভৌমিক নববিধানের নিশান উড়িল। ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম এত দিন কেবল হিন্দুস্থানের ব্রহ্ম ছিলেন, এখন তিনি সমস্ত জগতের ব্রহ্ম হইলেন। যেখানে কেবল বেদ বেদান্তের আদর ছিল, সেখানে বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তার প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র আসিল। নববিধানানুসারে যেমন বেদ বেদান্ত পবিত্র তেমনি বাইবেল, কোরাণ ও বৌদ্ধশাস্ত্রও পবিত্র। নববিধানের ডালে বসিয়া হিন্দু পাখীদের সঙ্গে খৃষ্টান পাখী, মুসলমান পাখী, বৌদ্ধ পাখী সকলে একত্র হইয়া সুরে সুরে মিশাইয়া ব্রহ্মনাম গান করিতে লাগিল। নববিধানে জাতিভেদ, স্থানের ব্যবধান, কালের ব্যবধান রহিল না। নববিধানে সকল জাতি এক মনুষ্যজাতিতে পরিণত হইল। নববিধানে গঙ্গাজলের সহিত টেম্‌সনদীর জল সম্মিলিত হইল। নববিধানের আমেরিকাস্থিত প্রকাণ্ড এণ্ডিস গিরি-

শিখরোপরি হিমালয় চড়িল। নববিধানে বঙ্গীয় সাগরের সঙ্গে প্যাসিফিক্ সমুদ্র এবং আটলাণ্টিক সমুদ্র এক হইয়া গেল। নববিধানের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এক দিকে একটি সূর্য্য ছিল, নববিধানের আগমনে দশ দিকে কোটি সূর্য্য প্রকাশিত হইল।

পূর্ব্বোক্ত দুই মহাত্মা বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজকে এত দূর উন্নত করিয়াছেন যে সেই উন্নতির অবস্থায় নববিধান অনিবার্য্য। ব্রাহ্ম সমাজ এই দুই জনের দ্বারা এত দূর উচ্চ অবস্থায় আনীত, যেখানে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে ইহার যোগ হইবেই হইবে। পৃথিবীর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মসমাজ প্রশস্ত হইয়া বিশ্বব্যাপী হইল। নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মকে আপনার ভিতরে বিলীন করিলেন, ইনি সমুদয় ধর্ম্ম হইতে ঈশ্বরের সম্পত্তি আপনার অধিকার বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আদিম অবস্থা হইতে পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, নববিধান সমুদয় হইতে সার ব্রহ্মতত্ত্ব গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পৃথিবীও নববিধানের নিকট আপনার সমস্ত উৎকৃষ্টতম সামগ্রী সকল আনিয়া উপস্থিত করিল। পৃথিবী নববিধানকে বলিলেন, "হে নববিধান, আমাকে ঈশ্বর যত প্রকার সত্যরত্ন, সৌন্দর্য্য, এবং মহত্ত্ব দিয়াছেন, সে সমস্ত তোমার হইল। বেদ বেদান্ত, পুরাণ তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার। তুমি কিছুই পরিত্যাগ করিতে পার না।

বেদ বেদান্তের পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাও তোমার। তুমি কেবল এক দেশের কিংবা এক যুগের সচ্চরিত্র সাধুদিগকে ভক্তি করিয়া ক্ষান্ত হইতে পার না, তুমি আদরের সহিত পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে বরণ কর।”

প্রকাণ্ড নববিধানের প্রাদুর্ভাবে হিন্দুস্থানের চারিদিকের সীমা ভাঙ্গিয়া গেল। হিন্দুর সঙ্কীর্ণ ঠাকুরঘর বিস্তৃত ও প্রশস্ত হইল হিন্দুর ভাগিরথীর দুই পার্শ্ব ভাঙ্গিয়া গেল। সকলই জলময়, নববিধানের অকূল সাগরে সমুদয় ডুবিল। নববিধান ইহকাল পরকাল এবং সমস্ত স্বর্গ মর্ত্ত্য আলিঙ্গন করিয়াছেন। পূর্ব্বকার বেদ বেদান্তের সীমা ছিল, এখনকার বেদের সীমা নাই। এখনকার বেদ সত্য। নববিধান মতে সত্যই বেদ, সুতরাং সত্যের অন্ত নাই। পূর্ব্বে দশ অবতার ছিল, এখন অপরাপর ধর্ম্মের সমুদয় অবতারও ঐ দলে সন্নিবিষ্ট হইল। নববিধানের সকলই অসীম। ইহাতে কিছুই সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক নাই। কোন বিশেষ দেশ কিংবা কোন বিশেষ কালে বদ্ধ নহে। যখন বেদ বাইবেল ছিল না, তখনও নববিধান ছিল এবং যখন বেদ বেদান্ত কিছুই থাকিবে না, যখন সমস্ত পৃথিবী চলিয়া যাইবে তখনও ইহা থাকিবে। পৃথিবীর সকল বিধান যাহার মধ্যে নিহিত তাহাই নববিধান। যাহা সমুদয় বিধানকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করে না, তাহা নববিধান নহে। নববিধান প্রকাণ্ড, ইহার বাহু অত্যন্ত দীর্ঘ, ইহার তনু বীরের ন্যায় বৃহৎ। কিরূপে ইহা

সঙ্কীর্ণ বস্ত্রে বদ্ধ থাকিবে? যেমন ইনি বাহু প্রসারণ করিলেন তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র গাত্রাবরণ ছিঁড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড হস্তী একবার আস্ফালন করিল, আর চারিদিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। যাঁহার বাসগৃহ সমস্ত পৃথিবী, তিনি কিরূপে হিন্দুর একটি ছোট ঘরে অবরুদ্ধ থাকিবেন? প্রকাণ্ড আকাশ কি আর্য্য মুষ্টিতে বদ্ধ থাকিবে? নববিধান সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। নববিধানের মস্তক স্বর্গে, হস্ত দ্যুলোকে, চরণ পাতালে। প্রকাণ্ড বিধান দেশ কালে অপরিচ্ছিন্ন। যে দিন হইতে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছি সেই দিন হইতে প্রশস্ততর পথে অগ্রসর হইতেছি।

যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল হিন্দুস্থানের ধর্ম্ম ছিল, সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম এখন সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত মানবমণ্ডলীর ধর্ম্ম হইল। নববিধান কেবল হিন্দুদিগের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়া ক্ষান্ত নহেন, ইনি পৃথিবীর সমুদয় জাতির সঙ্গে বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। এই নববিধান ঈশ্বরকে প্রেমদান করিয়া, ঈশ্বরের সমুদয় সন্তানকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন। নব-বিধান বলিলে ইহার সঙ্গে পৃথিবীর সমুদয় পুরাতন বিধানের ভিন্নতা ও যোগ উভয়ই বুঝায়। ইহা একটি বিধান, সুতরাং ইহার সঙ্গে অন্যান্য বিধানের সাদৃশ্য আছে। ইহা নূতন বিধান সুতরাং অপরাপর সমুদয় বিধান হইতে ইহা বিভিন্ন। একটির পর আর একটি এইরূপে যতগুলি বিধান সৃষ্টি অবধি

আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে তাহার পূর্ণতা এই বর্ত্তমান বিধানে সমাধা হইল।

যদিও নববিধান হিন্দুস্থানের গর্ভে জাত, তথাপি ইহাঁর সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধ আছে। ইনি একটি ক্ষুদ্র দেশের রাজা নহেন, ইনি বিশ্বী রাজ্যের রাজা। কয়েক জন হিন্দু প্রজা ইহাঁকে কর দিতেছে, ইহাতে ইনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। জগজ্জননীর ইচ্ছা যে ইনি সমস্ত বিশ্বরাজ্য অধিকার করেন। সেই জন্য দেখ ইহাঁর দক্ষিণ বাহু হিমালয়কে ধরিয়াছে এবং বাম বাহু ইউরোপকে ধরিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ সমুদয় ইহাঁর রাজ্যান্তর্গত। কোথায় য়িহুদী বিধান, কোথায় বৌদ্ধ বিধান, কোথায় গৌরাঙ্গ বিধান, কোথায় মুসলমান বিধান, কোথায় শিক বিধান, সমুদয়ের সঙ্গে ইনি সম্বদ্ধ। নববিধান কিছুই ভাঙ্গিতে আসেন নাই। ইনি সমুদয় ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিতে আসিয়াছেন। ইনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান সকল ধর্ম্মকে পূর্ণ করিবেন। ইহাঁর নিকটে কোন ধর্ম্মাবলম্বী এবং কোন জাতি অপদস্থ বা উপেক্ষিত হইবে না। ইহাঁর নিকটে যিনি যাহা চাহিবেন তিনি তাহা পাইবেন। যাঁহার যে অভাব তাহা ইনি পূর্ণ করিবেন।

এই নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মের সত্যমালার সমষ্টি। ইহাতে সমস্ত ধর্ম্ম ও নীতি একীভূত। এই নববিধানকে টানিতে গেলে, জড়রাজ্য, মনোরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে

সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সকল প্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। ইনি বিজ্ঞানবিরোধী নহেন, ইনি বিজ্ঞানের বন্ধু। নববিধান আকাশের বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, এবং পৃথিবীর সাগর, পর্ব্বত, সকলের সঙ্গে ঈশ্বরের নামে সংযুক্ত এবং সকল বস্তুর ভিতরে ইনি সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম উপলব্ধি করেন। নববিধান আর্য্যজাতি, য়িহুদীজাতি, মুসলমানজাতি প্রভৃতি সকল জাতিকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন, কাহারও পক্ষে পর নহেন। ইনি যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, সেবা, ফকিরী, বৈরাগ্য প্রভৃতি ধর্ম্মের সমুদয় অঙ্গকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। নববিধান ঈশ্বরের কোন সামগ্রীকে পরিত্যাগ করেন না। নববিধান, সজন, নির্জ্জন, পারিবারিক, সামাজিক, সকল প্রকার সাধন ভজনের প্রতি অনুরাগী। ইনি ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, সাধু অসাধু, অসভ্য সুসভ্য সকলকেই আপনার আশ্রয় দেন। ইনি ঈশ্বরের কোন সন্তানকে অবজ্ঞা করেন না। ইনি প্রাচীন আধুনিক সকল জাতিকে সম্মান করেন। ইনি বালক যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, সকলকে যথোপযুক্ত আদর ও সম্ভ্রম প্রদান করেন। ইনি ঈশ্বর, পরলোক, বিবেক, প্রভৃতি ধর্ম্মবিজ্ঞানের যত গূঢ় সত্য আছে সমুদয় স্বীকার করেন।

নববিধান বিজ্ঞানের ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে কোন প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ কোন মত স্থান পাইতে

পারে না। হে নববিধান, তুমি অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মবিধানের চাবি, যাই তোমাকে অন্যান্য ধর্ম্মসিন্দুকের কুলুপে সংলগ্ন করিলাম তন্মধ্যে যত ধর্ম্মরত্ন গুপ্ত ছিল সমুদয় প্রকাশিত হইল। তোমার প্রসাদে অন্যান্য সমুদয় ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিলাম। য়িহুদী মুসলমান বন্ধুগণ, তোমরা এত দিন গালে হাত দিয়া ভাবিতেছিলে তোমাদের ধর্ম্মের গৌরব কেহ বুঝিতে পারিল না, আজ নববিধানের প্রসাদে তোমাদের আদর হইল। বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তোমাকেও জগৎ ভালরূপে জানিত না, সভ্য ও জ্ঞানীরা তোমাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। নববিধানের আবির্ভাবে তোমার নিগূঢ় তত্ত্বসকল আবিষ্কৃত হইতে লাগিল এবং তোমার সম্মান বাড়িল। এই নববিধান প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতে অমৃত উদ্ধার করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম হইতে সত্যরত্ন বাহির করিবেন। ইনি সকলকে উদ্ধার করিবেন। সকলে ইহাঁর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ইনি সমুদয় ধর্ম্মের সার লইয়া জগৎকে প্রকৃত ধর্ম্মবিজ্ঞানের সামঞ্জস্য ও মিলন বুঝাইয়া দিবেন। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসাশাস্ত্রে পরিণত করিবেন। ইনি পৃথিবীর সমুদয় মহাপুরুষ এবং ভক্ত যোগীদিগকে এক আসনে আদর করিয়া বসাইবেন।

সকলেই নববিধানের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া ইহাঁকে এক দিন প্রণাম করিবে। আমাদের বন্ধু নববিধান, তুমি এত দিন ছিলে কোথায়? তোমা বিহনে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান,

মুসলমান, সকলেই পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করিত এবং সকলেই ভ্রাতৃবিরোধনিবন্ধন দুঃখে কষ্টে ম্লান ছিল। তুমি এত কাল কেন আমাদের মধ্যে আসিয়া বিবাদভঞ্জন করিলে না? নববিধান, আগে যদি আসিতে সকল দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতে পারিতে। কিন্তু তুমি আপন ইচ্ছায় আসিতে পারিতে না। ভগবান্ তোমাকে যথাসময়ে পাঠাইলেন। যাহা হউক, তোমার আগমনে পৃথিবীর আশা ও আনন্দ হইল। তোমার প্রভাবে পৃথিবীর চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আসিয়া পরস্পরের হস্ত ধারণ করিতে লাগিলেন। জয় নববিধানের জয়, জয় নববিধানের জয়!!

পৃথিবীর মহাজনগণ।

রবিবার ২৬শে পৌষ, ১৮০২ শক; ৯ই জানুয়ারি ১৮৮১।

উৎসব নিকটবর্ত্তী। এ সময়ে ঋণচিন্তা আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য। সময়োচিত কার্য্য ঋণ আলোচনা। সামান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মেরা বলিবেন, "আমরা দুই জনের নিকট ঋণী. সেই দুই জনকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিব, আর কাহাকেও কৃতজ্ঞতা দিব না।" তাহারা কেবল দুই জন উপকারী বন্ধুর নিকট কৃতজ্ঞ হইবে, তাহারা ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক ও ব্রাহ্মসমাজের পুষ্টিসাধক মহোদয় দ্বয়ের নিকট কৃতজ্ঞতাভারে প্রণত হইবে। সামান্য ব্রাহ্ম বলেন "এই দুই জনের নিকট আমি ও দেশ

উপকৃত, সুতরাং ইহাঁদের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।” উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্ম বলিলেন, “না, আমি কেবল এই দুই জনের নিকট ঋণী নহি, যদি এই সপ্তাহে আমার ও ব্রাহ্মসমাজের ঋণ গণনা করা উচিত হয়, তাহা হইলে অনেক মহাজনের নিকট আমি ও আমার দেশ ঋণী।” দুই জন কেন, শতাধিক ব্যক্তির কাছে আমরা ঋণী। সমস্ত হিসাব পর্য্যালোচনা করা হউক, কোন্ মহাজনের নিকট কত ঋণ করিয়াছি তাহা দেখা হউক, এমন কত মহাজন আছেন যাঁহারা সুদ পর্য্যন্ত পান নাই। উৎসবের আগে সমুদয় মহাজনদিগের হিসাব পরিষ্কার করিয়া লই।

সর্ব্বপ্রথমে যিনি আমাদের সকলকে জীবন দান করিয়াছেন সেই ব্রহ্মাণ্ডপতির নিকটে আমরা সকলেই ঋণী। তার পর সাধু মনুষ্যদিগের নিকটে আমরা ঋণী। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে যত সাধু দেশে দেশে, যুগে যুগে, অবতীর্ণ হইয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকটে ব্রাহ্মসমাজ ঋণী। আপাততঃ দেখিতে গেলে গ্রীক্ দেশের মহামতি সক্রেটিসের সঙ্গে ভারতের কোন সম্পর্ক নাই। গ্রীক্দিগের সঙ্গে হিন্দুগণের না ভাষা, না ধর্ম্ম, না রাজ্যসম্পর্কে কোন সম্বন্ধ আছে। মহামতি সক্রেটিস্ এথেন্স নগরের যুবকদিগের গুরু। তিনি আদি মনোবিজ্ঞানবিৎ ছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে বহু দূরে তাঁহার বাসস্থান। বৃদ্ধ সক্রেটিস্, তুমি কখন ভারতবর্ষে এস নাই, তুমি ভারতবর্ষ

দেখও নাই, তথাপি ভারতবাসী কেন তোমার কাছে ঋণী হইল? তোমার নিকটে কিরূপে ভারত মনোবিজ্ঞান শিখিল? বৃদ্ধ সক্রেটিস্, তুমি ভারতে না আসিয়াও ভারতে মনোবিজ্ঞানের গুরু হইয়াছ। তোমার নিকটে ভারত মনোবিজ্ঞানের জন্য ঋণী।

য়িহুদীদিগের প্রধান নেতা মুসা, তুমি বহুদূরস্থ য়িহুদীদিগের ভক্তিভাজন নেতা ছিলে, তুমি কিরূপে হিন্দুস্থানের শ্রদ্ধা ভক্তির আস্পদ হইলে? হিন্দুস্থানে বড় বড় আর্য্য সাধু আছেন, যাঁহারা তোমাকে বিজাতীয় ম্লেচ্ছ মনে করেন, এবং তোমার নাম উচ্চারণ করিতে ঘৃণা করেন, তথাপি কিরূপে তুমি নববিধানাশ্রিত ভারতবাসীদিগের শ্রদ্ধাস্পদ হইলে? নববিধান আগমনের পূর্ব্বে তুমি কেবল স্বজাতির নিকট গৌরব পাইতে, এখন নববিধানের প্রভাবে তুমি ভারতবর্ষের আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র হইলে।

মহর্ষি ঈশা, তুমি পৃথিবীর অনেকাংশ অধিকার করিয়াছ, অনেক জাতিকে তুমি স্বর্গের শোভা দেখাইয়াছ, তুমি অনেকের উপকার করিয়াছ। সূর্য্য তোমার রাজ্যে অস্তমিত হয় না। ইউরোপ, আমেরিকা সর্ব্বত্র তোমার রাজ্য, কিন্তু আর্য্যজাতি কেন তোমাকে গ্রহণ করিবে? ভারতসন্তান কেন বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত তোমার নাম সাধন করিবে। হিন্দুস্থানের রাজা তুমি নও। অন্যান্য দেশের রাজা হইয়াছ বলিয়া কি তুমি এই দেশের রাজা হইবে আশা কর, দুরাশা তোমার। উপ-

বাঁতধারী ব্রাহ্মণ, আর্য্য হিন্দুস্থান কি তোমার পদধূলি লইবে? তুমি বিজাতীয় বিদেশী সাধু, তোমাকে কিরূপে হিন্দুরা গ্রহণ করিবে? সামান্য ব্রাহ্মেরাও বলিতেছে তাহারা তোমার কাছে ঋণী নহে। ব্রাহ্মেরা যে উৎসব করিবে তাহাতে কি তাহারা তোমার নাম করিবে, তোমাকে আদর করিবে? কোন্ ব্রাহ্ম সরলান্তরে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলিতে পারেন, "আমি এই এই সত্য ঈশার নিকট শিখিয়াছি, কুড়ি হাজার টাকা ঈশার নিকট ঋণ করিয়াছি।"

চিন্তাহীন অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মেরা বলিতেছে, "বিজাতীয় মহাজনেরা আমাদের নিকট এক কড়া কড়িও পাইবে না।" কিন্তু প্রত্যেক সরল ব্রাহ্ম উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সমুদয় বিদেশীয় মহাজনদিগের চরণে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিতেছেন। বিদেশীয় মহাজনদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘরে আসিয়া দেখি সমুদয় হিন্দু মহাজনেরাও আমাদিগের কাছে দাওয়া দাবি করিতেছেন। যোগপরায়ণ যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুভক্ত নারদ, প্রজাবৎসল রাম, সত্যনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির এবং ভারতের অন্যান্য সমুদয় সাধু ও মহাত্মাগণ আমাদিগকে রাশি রাশি সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিতরণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রতিজনের নিকটে আমরা ঋণী। কৃতবিদ্য দাম্ভিক যুবা সগর্ব্বে বলিতে পারে "আমি বেদ পুরাণের কুসংস্কার ভ্রম হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমি কিরূপে মন্ত্র তন্ত্র, রাম সীতা গার্গী মৈত্রেয়ী প্রভৃতিকে মানিব?" অহঙ্কারী যুবা বলিতে পারে "যেমন

আমি বিদেশীয় মহাজনদিগের নিকট ঋণী নহি, তেমনি দেশীয় কোন মহাজনের নিকটেও আমি ঋণী নহি।” অহঙ্কারী ব্রাহ্ম বলিতে পারে, “আমি প্রাচীন কোন মহর্ষির নিকট ধ্যান শিক্ষা করি নাই, আমি নূতন প্রণালীতে ধ্যান করি, আমার ধ্যান নিজস্ব, সুতরাং এই বিষয়ে আমি প্রাচীন যোগী ঋষির গুরুত্ব কেন স্বীকার করিব?

আর এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেব ভারতবর্ষে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্ম, তুমি এই মহাজনের নিকটে কি কিছু ঋণ গ্রহণ করিয়াছ? ব্রাহ্ম হাসিয়া বলিলেন “আমি কি বুদ্ধের ন্যায় নির্ব্বাণ সাধন করি? বুদ্ধের নিকটে কিরূপে আমি ঋণী হইলাম?” শাক্যসিংহের শেষ জীবন কি হইল? তিব্বত দেশে, চীন দেশে, লঙ্কাদ্বীপে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইল; কিন্তু হিন্দুস্থানে তাহার নাম লোপ হইল। হিন্দুস্থানে শাক্য সিংহের নাম লোপ হইয়াছে সত্য, কিন্তু হিন্দুস্থানের অস্থির ভিতরে শাক্যসিংহের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শাক্যের নিকটে ব্রাহ্মেরা অশেষ ঋণে ঋণী।

আরও নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ, ওহে ভক্তির অবতার চৈতন্য, তুমি কি ব্রাহ্মদিগকে কিছু ঋণ দিয়াছ? জ্ঞানগর্ব্বিত ব্রাহ্ম বলিতেছে, ব্রাহ্মের ভক্তি সভ্যতার ভক্তি, ব্রাহ্মের ভক্তি বৈষ্ণবদিগের অন্ধভক্তি নহে। সভ্য ব্রাহ্ম জিজ্ঞাসা করেন, ব্রাহ্মেরা কি বৈষ্ণব-দিগের ন্যায় দশাপ্রাপ্ত হয়? ব্রাহ্মেরা কি প্রেমোন্মত্ত হইয়া

অচেতন হয়? জ্ঞানী সুসভ্য ব্রাহ্মেরা কেন শ্রীচৈতন্যকে মানিবে? চৈতন্য আপনার স্ত্রী সন্তান প্রভৃতি ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া গেলেন, ব্রাহ্মেরা সংসার ত্যাগ করা অধর্ম্ম মনে করেন, সুতরাং ব্রাহ্মেরা চৈতন্যকে কিরূপে ভক্তি দিবেন। হে অহঙ্কারী অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, কি স্বজাতীয়, কি বিজাতীয় কোন মহাজনের নিকটে তুমি ঋণ গ্রহণ কর নাই এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে তুমি ব্রহ্মোৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছ; কিন্তু দাঁড়াও, গম্ভীর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখ, যথার্থই তুমি অঋণী কি না। ভয়ানক ঋণের ভার কমাইবার জন্য তোমার মনে অকৃতজ্ঞতা এবং নীচ ভাবকে স্থান দিও না। অনন্ত ঋণে তুমি ঋণী, সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তু এবং প্রত্যেক জীবের নিকটে তুমি ঋণী।

সৃষ্টির দিনে যে সত্য সূর্য্য উদিত হইল, যে প্রেমচন্দ্র আকাশে উদিত হইল, তাহার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক। প্রত্যেক দেশের কি জাতীয় কি বিজাতীয় সকল গুরুর নিকটে তুমি সত্যঋণে ঋণী। প্রত্যেক গুরুর পদতলে তুমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিবে। নববিধানের ব্রাহ্ম, তুমি কোন জাতির সাধু গুরুকে অনাদর করিতে পার না। ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য সকলেই তোমার ভক্তিভাজন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাধুদিগকে সমাদর করে। খ্রীষ্টান কেবল খ্রীষ্ট এবং বাইবেল, মুসলমান কেবল মহম্মদ ও কোরাণ, শিখ কেবল নানক ও গ্রন্থকে আদর করে, কিন্তু

নববিধানের লোকের নিকট বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র আদৃত। নববিধানের লোকের ঋণ অনেক। এই ঋণনদী যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া কত দূর গিয়াছে কেহ তাহা নিরূপণ করিতে পারে না। এই নদী কেবল অস্মদ্দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষে বদ্ধ নহে। ইহা কেবল ভারতের বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র এবং বৌদ্ধধর্ম্মের ঋণে ঋণী নহে; কিন্তু এই ঋণনদী সমস্ত এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদয় ভূমি হইতে প্রবাহিত হইতেছে। পৃথিবীর সমুদয় জ্ঞানী পণ্ডিত ধার্ম্মিক সাধু-দিগের ঋণজাল আসিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে। আমাদের সাধ্য নাই যে আমরা এই ভয়ানক ঋণভার হইতে মুক্ত হই। যে ব্রাহ্ম দর্প করিয়া বলে যে আমি কাহারও নিকটে ঋণী নহি, দর্পহারী ঈশ্বর তাহার দর্প চূর্ণ করিবেন।

হে ভ্রান্ত অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্ম, তুমি কি একবার বিচার করিয়া দেখিলে না যে তোমার ধর্ম্মজীবনের প্রত্যেক রক্তবিন্দুর মধ্যে পৃথিবার সাধু মহাজনদিগের ঋণ রহিয়াছে। তুমি কি একবার ভাবিয়া দেখিলে না যে, কাহার নিকটে তুমি ব্রহ্মস্তবস্তুতি, ব্রহ্মারাধনা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি যোগ ধ্যান শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সাধুসেবা শিখিলে, কাহার নিকটে তুমি সংসারে বৈরাগ্যসাধন শিখিলে। তুমি যে আপনার রাজ্য মধ্যে বিবেককে রাজসিংহাসনে স্থাপন করিতেছ, ইহা তুমি কাহার নিকটে শিখিলে? তোমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু বলি-

তেছে আমার গুরু অমুক, অমুক। পৃথিবীর সমুদয় মহাজন-দিগের নিকটে ধারে ধারে তুমি বিক্রয় হইয়া গিয়াছ। সাধু-দিগের নিকটে তোমার সর্ব্বস্ব বিক্রী হইয়াছে। অমুক সাধু বলিতেছেন, বঙ্গবাসী অমুক ভাব আমা হইতে পাইয়াছে, আর এক সাধু বলিতেছেন, বঙ্গবাসী অমুক দৃষ্টান্ত আমা হইতে পাইয়াছে। মিসর দেশ, আরব দেশ, চীন দেশ, পৃথিবীর সমস্ত দেশ বলিতেছে, বাঙ্গালীর মাথার মুকুটে যত রত্ন আছে, সমুদয় আমাদের হইতে। তবে কেন দাম্ভিক ব্রাহ্ম তুমি বলিতেছ যে তুমি কাহারও নিকটে ঋণী নহ। তোমার বাড়ীতে যেমন দশখানি সামগ্রী দশ স্থান হইতে আনীত, তোমার ধর্ম্মের ভাবসকলও সেইরূপ নানা স্থান হইতে সংগৃহীত।

যখন পৃথিবীর সমুদয় মহাজনেরা আপন আপন ঋণের কথা বলিলেন, তখন গুরুতর কৃতজ্ঞতার ভারে ভারতের মাথা অবনত হইয়া পড়িল। অসরল হওয়া পাপ। ঋণ অস্বীকার করা ও অসত্য বলা পাপ। আমাদের মস্তক ধারে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ভারতমাতা আমাদিগকে বলিতেছেন, ব্রাহ্ম-গণ, যদি সত্যই তোমরা আমার সুসন্তান হও, তবে আমাকে আর ঋণী রাখিও না, ঋণ পরিশোধ কর। ভারত যে পৃথি-বীর অন্যান্য দেশ হইতে কত ধার করিয়াছেন তাহা গণনা করা যায় না। ইংরাজ রাজা ভারতকে কত ঋণ দিয়াছেন। রাজ্যসম্পর্কে, সাহিত্যবিজ্ঞানসম্পর্কে ভারত ইংলণ্ডের নিকট

কত ঋণে ঋণী। ভারত, তুমি কি ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিৎ এবং কবিদিগকে অস্বীকার করিতে পার? বিলাতের বিজ্ঞান, কবিত্ব, ভারতকে কত উন্নত করিয়াছে। বিলাতের উন্নতিকর ও মঙ্গলময় বিজ্ঞানাদি ব্যতীত ভারতের দিন চলে না। যেমন এক দিকে বিদেশীয় মহাত্মারা ভারতের কৃতজ্ঞতাকর গ্রহণ করিতে লাগিলেন, তেমনি অন্য দিকে ভারতের আপনার বুদ্ধ, ব্যাস, কবীর, নানক প্রভৃতি সকলে দাঁড়াইলেন, আর ভারত সকলের চরণে প্রণাম করিলেন।

কত লোকের কাছে ভারত ঋণ করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা করা যায় না। অতএব ব্রাহ্মগণ, তোমরা বিবেচনা কর, আলোচনা কর, কায়মনোবাক্যে মার ঋণ পরিশোধ কর। ঋণ স্কন্ধে করিয়া যোগীর গুণ, ভক্তের গুণ কীর্ত্তন কর। আনন্দ-মনে সাধু মহাত্মাগণের গুণগান করিতে করিতে উৎসবে যাত্রা আরম্ভ কর। পৃথিবীর মহাজনদিগের চরণ ধরিয়া বল, দাও বুদ্ধদেব, আমাদের হস্তে তোমার নির্ব্বাণ নিশান দাও, মহর্ষি ঈশা, তুমি আমাদিগকে তোমার পিতার ইচ্ছা পালনের নিশান দাও, মহম্মদ, তুমি আমাদিগের হস্তে তোমার এক-মেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের নিশান দাও, শ্রীগৌরাঙ্গ, তুমি আমা-দিগকে হরিপ্রেমোন্মত্ততার নিশান দাও। কৃতজ্ঞতা, বিনয়, নম্রতা সহকারে সেই মহাজনদিগকে স্মরণ কর। মহাজন-দিগের কাছে সাধুতা ও সত্যরত্ন সকল লইতেই হইবে। অদ্যকার দিন মহাজন স্মরণের দিন। আজ সাধু মহাজন-

দিগের নামে এই মন্দিরের প্রাচীর সকল সুশোভিত হইল। তাঁহাদিগের সাধুজীবনের শোণিত এই মন্দিরের উপাসক-দিগের শোণিতে প্রবেশ করুক। আমরা কেবল হিন্দুস্থানে বসিয়া আছি তাহা নহে। বিশ্বেশ্বরের সমুদয় বিশ্ব মধ্যে আমরা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। হৃদয়, আজ পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে প্রণাম কর। তাঁহারা সকলে আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিজয়নিশান।

রবিবার ৪ঠা মাঘ, ১৮০২ শক; ১৬ই জানুয়ারি ১৮৮১।

অদ্য শুভ দিনে ব্রহ্মমন্দির আপনার শিরোদেশে বিজয়-নিশান উড়াইলেন। ইতিহাস ইহা লিখিবে। ভবিষ্যদ্বংশেরা ভাবিবে ব্রহ্মমন্দির কেন এই সময়ে বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ পতাকা আপনার মস্তকে ধারণ করিলেন। এই ব্যাপারে কি পরি-বর্ত্তন প্রদর্শিত হইতেছে? কোন্ ভাবব্যঞ্জক এই ব্যাপারটি? ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে এই ঘটনার তাৎপর্য্য বিচার করিবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে আম্মা-দিগের পক্ষে এই ঘটনার অর্থ নির্দ্ধারণ করা উচিত।

তোমরা কি মনে কর, এই রজতধ্বজার কোন নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ নাই? এই সময়ে এত বৎসর পরে ছড়াৎ করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের মস্তকে একটী ধ্বজা কেন উঠিল?

ইহার ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় অর্থ আছে। যখন কোন পুরুষ দক্ষিণ বাহু প্রসারণ করিয়া নিশান ধারণ করেন, তখন তিনি স্বীয় বীরত্বের পরিচয় দান করেন। যখন তিনি কথোপকথন, আহার শয়ন প্রভৃতি জীবনের সামান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তখন লোকে জানে তিনি মনুষ্য; কিন্তু যখন তিনি বলে, কৌশলে, আপনার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া, নিম্নে ফেলিয়া, নিশান হাতে ধরিয়া বলেন আমি দিগ্বিজয়ী, তখন লোকে জানিতে পারে যে তিনি এক জন বীর। যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া বিজয়নিশান ধারণ করিলে বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে পতাকার সংযোগ। যে বীর যোদ্ধা রণে জয়ী হয় তাহারই বিজয়নিশান ধারণ করিবার অধিকার হয়। ভীরু কাপুরুষ নিশান ধরিতে পারে না। সাহসবিহীন ভীরু কিরূপে জয়ী বীরের নিশান কলঙ্কিত করিবে? যখন রণক্ষেত্রে দুই দলই সমান ভাবে আপন আপন পরাক্রম প্রকাশ করে, তখন লোকে জানে কোন পক্ষের জয়পতাকা উড়াইবার সময় হয় নাই। দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, দেখিতে দেখিতে রণ ঘোরতর হইয়া উঠিল, লোকে মনে করিল এমন ভয়ানক যুদ্ধ কখনও দেখি নাই। এমন সময় গভীর জয়ধ্বনি সহকারে এক দলের জয়পতাকা গগনে উঠিল। এক দল ঝঙ্কার করিয়া জয় বাদ্য বাজাইল এবং গগনে জয়নিশান উড়াইল।

পৃথিবীকে নববিধানের জয় দেখাইবার জন্য এই বিজয়-

নিশান উড়িল। নববিধানের বল, পরাক্রম এবং বিজয়-নিশান আমি দেখিলাম, তুমি দেখিলে, বঙ্গদেশ দেখিল, সমস্ত ভারত দেখিবে, চীন হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী দেখিবে। নববিধান হিন্দুস্থান জয় করিবে, সমস্ত পৃথিবী জয় করিবে। আজ আমরা ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ার উপরে বাহ্যিক বিজয়নিশান উড়াইলাম; কিন্তু যথার্থ বিজয়নিশান এই নব-বিধানের মস্তকের উপরে। সকল জাতি যথাকালে এই নববিধান গ্রহণ করিবে। সর্ব্বত্র নববিধানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, নববিধান সকল দেশ অধিকার করিবেন। ইনি নানা প্রকার শত্রু নিপাত করিবেন। কুসংস্কার ও পাপ অধর্ম্মের বুকে দুই পা দিয়া নববিধান দাঁড়াইলেন।

এই জন্য যে সকল কাপুরুষ ব্রাহ্ম এখনও সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার ও পাপ পরিত্যাগ করে নাই, এখনও যাহারা পাপের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে চাহে, তাহারা সকোপে বলিতেছে দূর হউক নববিধান, দূর হউক ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির। তাহারা মনের সহিত নববিধানকে চিরদিনের জন্য অভি-সম্পাত দিতেছে। তাহারা মনে করিত এই ব্রহ্মমন্দির সাহসবিহীন কাপুরুষদিগের ব্রহ্মমন্দির; কিন্তু এখন তাহারা ব্রহ্মমন্দিরের দুর্জ্জয় তেজ সহ্য করিতে পারিতেছে না। ব্রহ্মমন্দির আপনার মস্তকে বিজয়নিশান উড়াইলেন দেখিয়া তাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার ও পাপের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা

জানিত ব্রহ্মমন্দির ভীরুতার স্থান, এখানে সাহস এবং জ্বলন্ত উৎসাহের মৃত্যু হয়; কিন্তু তাহারা দেখিতেছে যে বৎসর বৎসর ইহার বল পরাক্রম ও সাহস বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং তাহারা ইহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া, দলে দলে সংসারের দিকে, অসত্য অধর্ম্মের দিকে, পশ্চাৎ গমন করিতেছে। কিন্তু যে সকল সাহসী ধর্ম্মবীর এখনও ইহার মধ্যে রহিয়াছেন ইহাঁদিগের ভিতর হইতে সহস্র সহস্র লোক উঠিবে।

নববিধানের বিজয়নিশান উড়িল আর কি এখন কেহ বলিতে পারে যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্মের একটী দুর্ব্বল শাখা? নববিধান কোন একটী বিশেষ ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহে। সময়ে ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিবার জন্য ইহাঁর আগমন। ব্রহ্মমন্দির, আজ তোমার মস্তকের উপরে নববিধানের বিজয়নিশান উড়িল, আজ তুমি নববিধানের জয়ধ্বনি করিয়া হুঙ্কার রবে তোমার সন্তানদিগকে কাঁপাও। ব্রহ্মমন্দির, আজ তোমার মাথার উপরে বিজয়-পতাকা উড়িতেছে, আজ তুমি তোমার রাজার জয়ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে কাঁপাও। তুমি কি সামান্য রাজার প্রজা? তোমার রাজার প্রতাপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ, আর তোমরা ভীরু কাপুরুষদিগের সঙ্গে থাকিও না, এখন দুর্জ্জয় সাহস ও অপ্রতিহত পরাক্রমের সহিত ঈশ্বরের জয় ঘোষণা কর। এই লও বিশ্বাসের বর্ম্ম, এই লও স্বর্গীয়

সাহসের ঢাল, এই লও শান্তি অসি, এই সকল স্বর্গের অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অসত্যের বিরুদ্ধে, অপ্রেম অধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর।

আজ দেখ ব্রহ্মমন্দির নড়িলেন, আজ একখানি অতি সুপরিষ্কৃত রজতধ্বজা মস্তকে ধারণ করিয়া ব্রিটিস্‌রাজ্যে মস্তক উত্তোলন করিয়া ব্রহ্মমন্দির দাঁড়াইলেন। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, তোমরা সকলে সাক্ষী হও; আজ ব্রহ্মমন্দির বিজয়পতাকা আপনার মস্তকে ধারণ করিলেন। এই পতাকা ধারণ করিয়া ব্রহ্মমন্দির সমস্ত পৃথিবীর নিকট নববিধানের জয়, ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছেন; এবং সিংহ রবে বলিতেছেন—"আমার নববিধানাশ্রিত কোন সন্তান মরিবে না, আমার প্রত্যেক সন্তান অমর।" আজ প্রকাণ্ড বিশ্বাস এবং প্রবল উৎসাহে ব্রহ্মমন্দিরের বক্ষ স্ফীত হইতেছে।

যদি বল অন্যান্য দিন কি ব্রহ্মমন্দিরের উৎসাহ বিশ্বাস কম ছিল, কম কি অধিক একবার নিশানের দিকে তাকাইয়া দেখিও। এই ব্রহ্মমন্দিরে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি। ইঙ্গিত হইল উপর হইতে, শত্রুকে ভয় করিও না, শত্রুতা দ্বারা পরাস্ত হইও না, শত্রুকে প্রেম দ্বারা পরাস্ত কর। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মভক্তদিগের মনে শক্তি সঞ্চার হইল, রাজার ভাব প্রস্ফুটিত হইল। বিজয়নিশান ব্রহ্মভক্তদিগের বীরত্বের পরিচয় দিতেছে। কয়েক বৎসর হইতে শত্রু-

দিগের উৎপাতে নববিধানাশ্রিতদিগের বীরত্ব বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে।

যেখানে বীরত্ব, যেখানে জয়, সেই স্থানেই ঝণ্ডা। এই নববিধান রাজা হইয়া পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিতে আসিয়াছেন। নববিধান এই ধরাধামে রাজাধিরাজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন। নববিধানের প্রেরিত দূতগণ যে দেশে যাইবেন এই বিজয়নিশান সঙ্গে লইয়া যাইবেন। আগামী রবিবারে আমরা এই মন্দিরে এই বিজয়নিশান প্রতিষ্ঠিত করিব। ভারতবর্ষের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নববিধান-বাদীদিগের সমাজ আছে সে সকল স্থানে এই নিশানের প্রতিনিধি নিশান উড়িবে। প্রত্যেক ভক্তের বাড়ীতে এই বিজয়নিশান থাকিবে। যেখানে যেখানে নববিধানের মন্দির আছে সে সকল স্থানে প্রত্যেক মন্দিরের মস্তকে এই বিজয়-নিশান সংলগ্ন থাকিবে। হে বিশ্বাসী নরনারীগণ, তোমরা এই বিজয়নিশানকে বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরের জয়নিদর্শন জানিয়া ইহার আদর কর, ইহাকে বরণ কর, ইহা দর্শন করিয়া স্বর্গীয় বীরত্ব ও পরাক্রম লাভ কর।

একবার এই প্রকাণ্ড নিশান ধরিয়া দাঁড়াও। বিশ্ববিজয়-ধর্ম্মরাজের জয়নিশান স্পর্শ করিয়া কে ভীরু থাকিতে পারে? যে এই জয়ধ্বজা স্পর্শ করিল তাহার আর ভয় ভাবনা কি? এই জয়ধ্বজা দর্শন মাত্র ষড়রিপু আপনা আপনি পলায়ন করে। আজ ব্রহ্মমন্দিরের মস্তকের উপরে জয়ধ্বজা উড়িল,

আজ সেই দুর্দ্দান্ত শত্রুগণ, সেই সকল দৈত্য দানব কোথায়? যাঁহারা জয়ধ্বজা উড়াইলেন, তাঁহাদিগের মনের ভিতরে আর ভয় নিরুৎসাহ রহিল না। যে সকল ধর্ম্মবীর আত্ম জয় করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন তাঁহারাই নববিধানের জয়ধ্বজা স্পর্শ করিবার অধিকারী। ভীরু অবিশ্বাসীর কি সাহস যে এই নববিধানের বিজয়নিশান স্পর্শ করে? কাহারা নববিধানের জয়ধ্বজা ধরিলেন? যাঁহারা আপন আপন মনের শত্রু সকল দমন করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন। যাহারা আপনার অন্তরস্থ শত্রুসকল দমন করিতে পারে নাই, তাহারা বাহিরের শত্রুদিগকে কিরূপে পরাস্ত করিবে?

হে নববিধানবাদী তুমি ধন্য, কেন না যে নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মবিধানকে আলিঙ্গন করিয়াছে, তুমি স্বহস্তে সেই বিধানের জয়ধ্বজা উড়াইলে। বিশ্বাসী বন্ধুগণ, তোমরা দলে দলে এই নিশান উড়াইয়া ঈশ্বরের জয়, নববিধানের জয় ঘোষণা কর। আজ হইতে তোমরা বিশেষরূপে পৃথিবীর অধর্ম্ম কুসংস্কার, পাপ তাপ, শোক মোহ বিনাশ করিবার জন্য যোদ্ধা নিয়োজিত হইলে। সর্ব্বত্র ঈশ্বরের জয়পতাকা উড়াইয়া পৃথিবী হইতে কাম ক্রোধাদি ষড়রিপু দূর করিয়া দাও। প্রত্যেক ভক্ত গৃহস্থের বাটী এক একটী নববিধানের দুর্গ হউক, এবং তাহার মস্তকে বিজয়নিশান সংলগ্ন হউক। যে বিজয় নিশানের প্রতাপে পৃথিবী হইতে সকল প্রকার অধর্ম্ম এবং অসত্য চলিয়া যাইবে সেই বিজয়-

নিশান আজ ভাল করিয়া ধারণ কর। আগামী রবিবারের জন্য প্রস্তুত হও। নগরকীর্ত্তন সমাধা হইলে ব্রহ্মবাদিনী কুলকামিনীগণ এই বিজয়নিশানকে বরণ করিবেন। প্রাণের ভাই বন্ধুগণ, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তোমাদিগের প্রতিজনের মনে তেজ বীর্য্য সঞ্চারিত হউক। তোমরা সকলে শত্রু-দিগকে জগতের রাণীর অসুরনাশিনী ভয়ঙ্করা তারা মূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার ভক্তদিগকে রক্ষা কর। জগজ্জননীর নব-বিধানের জয়ধ্বজা ধরিবার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও।

ঈশ্বরের সখ্যভাব।

রবিবার প্রাতঃকাল, ১১ই মাঘ, ১৮০২ শক;
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৮১।

এই নবধর্ম্মবিধানে যাহা এখন হইতেছে পৃথিবী তাহা পরে বুঝিতে পারিবে। বুঝিবার সময় এখনও হয় নাই, এখন দেখিবার সময়, সম্ভোগ করিবার সময়, মত্ত হইবার সময়। এ সকল ঘটনা লেখক লিখিবে, ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবে। যে ব্যাপার বর্ত্তমান সময়ে ঘটিতেছে, ইহা সর্ব্বদা ঘটে না। অনেক শতাব্দীর অন্ধকারের পরে একেবারে এক নব সূর্য্য বঙ্গদেশের আকাশে, ভারতের আকাশে, উদিত হইয়াছে। ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া ইতিহাসলেখক ভারতের প্রতি, জগতের প্রতি, ঈশ্বরের এই বিশেষ করুণা, এই নববিধান-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবে।

তোমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের এত দয়া কেন হইল? শরীর দিয়াছেন, শরীর রক্ষার জন্য দয়া করিয়া অন্ন বস্ত্র দিতেছেন; মন দিয়াছেন, মনের উন্নতির জন্য জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন; আত্মা দিয়াছেন, আত্মার জীবন জন্য ধর্ম্ম দিয়াছেন; আবার আমাদিগের নিকট নববিধান প্রেরণ করিলেন কেন? গত মাঘ মাসের ব্রহ্মোৎসবে নববিধান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এক বৎসরের মধ্যে নববিধান শিশুর বাহুবল ভারতবর্ষ বিলক্ষণ-রূপে অনুভব করিয়াছে। এক বৎসর হইল বঙ্গদেশ নব-বিধানশিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কত আদর করিল; আজ ঈশ্বরের বন্ধুগণ বিশ্বাসী ভক্তগণ এই শিশুর অঙ্গ লাবণ্য, সাহস, বীরত্ব, এবং স্বর্গীয় পরাক্রম দেখিয়া সুখী হইতেছেন। বঙ্গমাতা কি আমাদিগকে এই জন্য তাঁহার গর্ভে স্থান দান করিয়াছিলেন যে, আমরা এই নববিধানের বিশেষ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিব? পৃথিবীতে অতি অল্প লোকই এই সৌভাগ্য ভোগ করিতে পায়। কখন কোন কালে যুগ যুগান্তরে পৃথিবীতে এক একটী ধর্ম্মবিধান প্রেরিত হয়। চারি শত বৎসর হইল শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে ভক্তিবিধান প্রচার করিয়াছিলেন। চারি শত বৎসর পরে আবার কেন বঙ্গদেশে নববিধানের সুসমাচার শুনিতেছি? নববিধানবিশ্বাসী ভাই, এই বর্ত্তমান সময়ে তোমার আমার সৌভাগ্য মানিতে হইবেই হইবে। কেন আমরা এত সৌভাগ্যশালী হইলাম? এত বড় ধন বিধানরত্ন ঈশ্বর কেন আমাদের হাতে আনিয়া

দিলেন? আমরা যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণাপাত্র হইয়াছি ইহা স্বপ্ন নহে, ইহা জীবনের পরীক্ষিত সত্য, ইহা অভ্রান্ত সত্য। ঈশ্বর প্রসন্নমুখে বলিতেছেন,—"সন্তানগণ, এই নববিধানরত্ন গ্রহণ কর।" ঈশ্বরের প্রসন্নতায় সত্যসত্যই আমরা তাঁহার নববিধানভুক্ত হইলাম।

প্রাচীন কালের এক একটি বিধানে এক এক জন মহাপুরুষ নেতা হইতেন, সমস্ত জগৎ তাঁহারই মাথায় মহিমার মুকুট পরাইয়া দিতেন। এবারকার নববিধান সেরূপ নহে। এবার ঈশ্বর তাঁহার দয়াকে ছড়াইয়া দিলেন, এবার কেবল কোন একটী সাধুর নামে তিনি বিধান প্রেরণ করিলেন না; কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে একত্র করিয়া এই নববিধান গঠন করিলেন। পৃথিবীতে সাধুজীবনরূপ যত ফোয়ারা ছিল, এই নববিধানের শুভাগমনে সে সমস্ত খুলিয়া গেল। পৃথিবীর সমুদয় জাতি এবং সমুদয় ধর্ম্মবিধান এই নববিধান সমুদ্রে ডুবিল। এমন কাল ছিল যখন প্রাচীন ধর্ম্মবিধানে বিশেষ বিশেষ লোক একাকী ব্রহ্মচরণে বসিয়া সুধা পান করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান বিধানে সেইরূপ স্বতন্ত্র নির্জ্জন সাধনের বিধি নাই। এই বিধান একটী দলের বিধান। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যুগে যুগে সাধুবন্ধু বিধান গঠন এবং স্থাপন করিয়াছেন, এবার দীনবন্ধু আপনার নামে এই বর্ত্তমান বিধান গঠন করিতেছেন।

হে লীলারসময় হরি, হে ভক্তবৎসল বিধাতা, তুমি দেশে দেশে যুগে যুগে এক এক জন সাধুর মাথায় মুকুট পরাইয়াছ, এবং সেই সাধুকে তোমার প্রেরিত বলিয়া জগতের নিকট আদৃত করিয়াছ। "যুগে যুগে বিধি করিয়া প্রচার, ভক্ত সঙ্গে কত করিলে বিহার।" সাধুদিগের সঙ্গে হে হরি, তুমি কত আমোদ করিয়াছ; কিন্তু আজ হরি, তোমাকে কাঙ্গালের বাড়ীতে যাইতে হইবে, এখন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর নহে, এখন কলিযুগ, এখন পূর্ব্বের ন্যায় সেরূপ সাধু নাই, এখন সকলেই পাপী অসাধু, এ সকল পাপী অসাধুদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, হরি, তোমাকে ইহাদিগের নিকট প্রকাশিত হইতে হইবে। এবার হরি তোমার অনন্ত করুণারূপ মহাসাগরকে উথলিত হইতে বল।" হরি বলিলেন হরিকে "হে হরি, তুমি অন্যান্য যুগে সাধুসখা নাম লইয়াছিলে, এবার কাঙ্গালসখা, দীনসখা, পাপীর বন্ধু নাম লইয়া পৃথিবীতে যাও, সমুদয় সাধুদিগকে একত্র করিয়া নববিধান লইয়া পতিত জগৎকে উদ্ধার কর।

অন্যান্য যুগে পবিত্রাত্মা সাধুগণ বহু তপস্যা এবং সাধনের পর ঈশ্বর-দর্শন লাভ এবং ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতেন, বর্ত্তমান যুগে দীন কাঙ্গাল মলিন আত্মা সকল ঈশ্বর দর্শন এবং প্রত্যাদেশ লাভ করিতেছে। এই নববিধানে তোমার আমার সৌভাগ্য, এবার কেবল ঈশা চৈতন্যের সৌভাগ্য নহে, এবার তোমার আমার মত পাপীর চক্ষু সেই নিরাকার অতীন্দ্রিয়

পূর্ণানন্দ পুরুষকে দেখিবে এবার পাপীর দুঃখীর দেহ মধ্যে কাঙ্গালের ঠাকুর আসিবেন। ঈশা গৌরাঙ্গ হরিপ্রেমে মজেন ইহা বড়, না তোমার আমার মত জগাই মাধাই স্বর্গ লাভ করিল ইহা বড়? তোমার মলিন চক্ষু আর আমার পাপ নয়ন যদি মার মূর্ত্তি দেখে ইহা কি ঈশ্বরের সামান্য দয়া? এই নববিধানে কাঙ্গালেরা মাকে দেখিতে পাইবে এই জন্যই কাঙ্গালদিগের এত আনন্দ। এবার সকলেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। এবার ঈশ্বর পাপী পুণ্যাত্মা সকলকেই দেখা দিবেন। এই নূতন বিধানের প্রভাবে যাহার দেহ মন ভগ্ন সেও পরব্রহ্মের চরণ ধরিয়া প্রণাম করিবে। এই সংবাদ অতি উচ্চ এবং গভীর সংবাদ এবং পাপী জগতের পক্ষে ইহা অতি আনন্দের সমাচার। স্বর্গের সেই প্রত্যাদেশ যাহা ঈশা মুসার কাণে প্রবেশ করিত, সেই প্রত্যাদেশ তোমার আমার মত পাপীর কাণে প্রবেশ করিবে। নারদ গৌরাঙ্গ প্রভৃতি যে হরিপ্রেমামৃত পান করিতেন তোমার আমার বিষয়কলুষিত হৃদয় সেই সুধারস আস্বাদন করিবে।

করুণানিধান ঈশ্বর এবার পাপীদিগকে তাঁহার বিধানভুক্ত করিলেন। তোমার আমার মত দশ জন, এক শত জন, সহস্র জন এই নববিধানভুক্ত হইবে, এই নববিধান কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না। ইহা পরলোকস্থ এবং এই পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে একীভূত করিবে এবং অসাধুদিগের উদ্ধারের উপায় করিবে। এই নববিধান পরলোকগত সমুদয়

সাধুদিগের ভাব সমষ্টি করিয়া প্রত্যেক বিধানবাদীর অন্তরে সন্নিবিষ্ট করিবে। কোন্ ভাবুকের না ইচ্ছা হয় যে আবার প্রাণের ঈশা, প্রাণের গৌরাঙ্গ, নারদ, জনক, শুকদেব প্রভৃতি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগের মধ্যে হরিলীলা প্রকাশ করেন? হে ভাবুক ব্রাহ্ম, আজ এই উৎসবে যদি তুমি সেই প্রাচীন সাধু ভক্তদিগকে দেখিতে পাও, তোমার কত আহ্লাদ হয়! হে সঙ্গীত রসজ্ঞ ব্রাহ্ম, আজ যদি তুমি বীণা ছাড়, আর তোমার প্রাণের ভিতরে নারদ আসিয়া বীণা বাজান, অদ্যকার ব্রহ্মোৎসব কেমন সুখের ব্রহ্মোৎসব হয়। হে যোগী ব্রাহ্ম, আজ যদি তোমার মলিন জিহ্বাতে, তুমি "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই কথা না বল; কিন্তু ঈশা তোমার আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিয়া "হে স্বর্গস্থ প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক," এই কথা বলেন, তাহা হইলে অদ্যকার উৎসব মহাযোগের উৎসব হয়। হে ভক্ত ব্রাহ্ম, আজ যদি তোমার নিজের হৃদয়ের ভক্তিরসে প্রমত্ত হইয়া তুমি হরিসংকীর্ত্তন না কর, এবং মৃদঙ্গ না বাজাও, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে গৌরাঙ্গ আসিয়া হরিগুণ গান করেন এবং মৃদঙ্গ বাজান তাহা হইলে অদ্যকার উৎসব স্বর্গীয় ভক্তি প্রমত্ততার উৎসব হয়। হে ধ্যানার্থী ব্রাহ্মগণ, আজ যদি তোমরা আপনারা নিজের চেষ্টায় ব্রহ্মধ্যান না কর, কিন্তু প্রাচীন যোগী ঋষিগণ তোমাদিগের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগ ধ্যান করেন তাহা হইলে আজ এখানে ইহলোক পরলোক এক হইবে।

সাধুভক্তগণ আজ আমাদিগের এই মন্দিরে আসিলে আমাদিগের মনে কত সুখ শান্তি সঞ্চারিত হইবে। আমাদিগের ঘরে আসিয়া আজ যদি তাঁহারা নাচেন আমাদিগের কত আহ্লাদ হয়। হে ঈশ্বরের ভক্তগণ, যদি তোমরা এই ধরাধামে আসিতে, প্রাণের রক্ত দিয়া তোমাদিগের চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিতাম, এবং তোমাদিগের চরণতলে মস্তক প্রণত করিতাম। হে ভক্তগণ, আর কি তোমরা ধরাধামে ফিরিয়া আসিবে না? ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ, আর কি তুমি এখানে আসিয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে হরিগুণ গান করিবে না? গৌরাঙ্গ, আবার কি তুমি ধরাতলে আসিয়া হরিভক্তির প্রমত্ততা দেখাইবে না? কলিযুগে কি সাধুদিগের পুনরাগমন হইবে না? পাপীদিগের ভাগ্যে ভক্তচন্দ্রোদয় হবে কেন? যে ঈশাকে দুষ্ট পৃথিবী নির্যাতন করিয়া ক্রুশে বধ করিল, সেই ঈশা কি আবার এই পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিবেন? জীবের নানা প্রকার শোক তাপে তাপিত প্রাণকে শান্তি দিবেন বলিয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন আর কি সেই সাধু যোগী মহাপুরুষেরা আসিবেন না? হে সাধু যোগী ঋষিগণ, হে ভক্তগণ, তোমরা কোথায় গেলে? কোথায় রহিলে? হে হরিভক্ত গৌরাঙ্গ, আর কি তুমি এই ধরাতলে আসিয়া কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পাপীকে ক্রোড় দিবে না? আর কি তুমি শত্রু মিত্র সকলকে প্রেম বিলাইবে না? মহর্ষি ঈশা, আর কি তুমি পাহাড়ে দাঁড়াইয়া শিষ্যদিগকে

সঙ্গে লইয়া উপদেশ দিবে না? পৃথিবী, দুর্ভাগা পৃথিবী, একে একে সকল সাধু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সাধুদিগকে তুমি অপমান এবং নির্যাতন করিয়া পরলোকে পাঠাইয়া দিলে! যদি সাধুদিগকেই তুমি তোমার বক্ষের মধ্যে না রাখিতে পারিলে তবে তোমার মধ্যে এখন আর কি দেখিব? কার মুখের পানে তাকাইব?

হে নববিধান, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি দয়া করিয়া এই পতিত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য আবার সমুদয় সাধু সাধ্বীদিগকে সঙ্গে লইয়া এস। তুমি কোন এক জন সাধুকে সঙ্গে লইয়া আসিলে না, কিন্তু তুমি পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিলে। হে নববিধান, অন্যান্য বিধানরূপ তোমার ভগ্নীরা স্বর্গের পরীর ন্যায় বহু অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে, ধরাতলে অবতরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এক এক জন সাধুকে মস্তকে লইয়া আসিয়াছিলেন। তুমি তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তুমি এক জনকেও পরিত্যাগ করিলে না। হে নববিধান, তুমি কেন এক জনের সঙ্গে আসিলে না? তুমি কেন সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিলে? মা বিশ্বজননি, তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে এক এক জন সাধুকে পৃথিবীর আদর্শ করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবার কেন সমুদয় সাধুদিগকে একত্র করিয়া নববিধান পাঠাইলে? হে নববিধান, তোমার অমুক ভগ্নীবিধান

বহুমূল্য লাল রঙ্গের রত্ন লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তোমার আর এক ভগ্নীবিধান অমূল্য নীলমণি মস্তকে করিয়া আসিয়াছিলেন এবং তোমার প্রত্যেক ভগ্নী বিধানই এক একটি বহুমূল্য রত্ন লইয়া আসিয়াছিলেন, তুমি কি লইয়া আসিয়াছ? তুমি সেই সমুদয় রত্নগুলির মালা গাঁথিয়া রত্নহার লইয়া আসিয়াছ। তোমার মা স্বর্গের জননী বলিলেন "আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে আমার এক একটি সাধু পুত্রকে প্রেরণ করিয়া পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছি, সেই এক একটী সাধুকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বেকার লোকেরা ধর্ম্ম সাধন করিত, এবার কাঙ্গালসখা, দীনবন্ধু নাম লইয়া প্রত্যেক কাঙ্গালকে আমি সাক্ষাৎ দেখা দিব, এবার আমি কেবল সাধুহৃদয়ে লীলা বিহার করিব তাহা নহে; কিন্তু এবার আমি আমার জন্য ব্যাকুল ও কাঙ্গাল প্রত্যেক পাপীকেও দেখা দিব। প্রত্যেক কাঙ্গাল এবার কাঙ্গালসখাকে স্বচক্ষে দেখিবে, এবার আমি আমার সমস্ত সাধুদিগকে সঙ্গে লইয়া আমার দীন সন্তানদিগের গৃহে গৃহে অবতরণ করিব। এবার মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন হইবে না, এবার সাধু অসাধু যে কেহ আমার জন্য ব্যাকুল হইবে সে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবে।"

বাস্তবিক দীনজননীর বিশেষ কৃপায় কাঙ্গাল দীন দুঃখী পাপী সকলেরই মনে আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। এখন অতি সহজেই দুঃখী পাপী ভক্তবৎসল পরিত্রাতার দর্শন পায়। আগেকার যোগী বহু যোগ তপস্যা ও সাধনের

পর যোগেশ্বরের দর্শন লাভ করিতেন। আগেকার যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যোগিগণ বহু সাধনের পর ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিতেন; কিন্তু এখন একবার বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ডাকিলেই অনুতপ্ত পাপীও ব্রহ্মদর্শন লাভ করে। পূর্ব্বে ভক্তির অবতার পরমভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তিরসে মত্ত হইয়া যেরূপ নৃত্য করিতেন এখন তোমার আমার মত জগাই মাধাইও সেইরূপ নৃত্য করিবে। গরিব কাঙ্গালেরা এবার প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বর-দর্শন লাভ এবং ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিবে, এই বিষয়ে আগেকার অপরাপর ধর্ম্মবিধান অপেক্ষা বর্ত্তমান বিধানের গৌরব অধিক।

নববিধানের এই গৌরবের কথা শুনিয়া এই উৎসব-মন্দিরে আজ নানা দেশ হইতে দুঃখী পাপী কাণা খোঁড়া সকল আসিয়া জুটিয়াছে; এবারকার বিধানে কাঙ্গালেরা মহা উল্লাস প্রকাশ করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে অনেক কঠোর তপস্যা বলে ইন্দ্রিয়াদি দমন করিয়া শতাদি বৎসর পরে সাধকেরা ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতেন, এখন পাপীদিগের জন্য আনন্দের বাজার বসেছে। আজ হরি দুঃখী কাঙ্গালের বন্ধু হইয়া পৃথিবীতে প্রকাশিত হইতেছেন। সেই প্রাচীন কালের যোগেশ্বর আজ সখ্যভাবের ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন। যদিও তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তথাপি তিনি পাপীর বন্ধু হইয়াছেন। আজ বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর দেখা হইতেছে। হে বন্ধু, এত দিন কোথায় ছিলে? তুমি স্বর্গস্থ ভগবানের বন্ধু

তাহা কি তুমি জান? ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তোমার বন্ধু তুমি এমন কাঙ্গাল হইয়াছ কেন? হরির সন্তান দুঃখী কাঙ্গাল হইবে ইহা কি হরির প্রাণে সহ্য হয়? হরি বলিলেন, "আমি গগনে রাখিলাম সোণার চাঁদ, আর ভূতলে রাখিলাম আমার সন্তান চাঁদ। আমার দুই চাঁদই হাসিতেছে।" জগজ্জননী আপনি হাসিলেন, এবং তাঁহার চাঁদ দুইটীকেও হাসাইলেন। মানুষ সন্তানকে দেখে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী হাসিলেন। পৃথিবীর কাল মাটির উপরে যেন সোণার পুতুল হামাগুড়ি দিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর প্রত্যেক ছেলে ঠিক্ যেন এক একটী চাঁদ। যে মসলাতে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আকাশের চাঁদ সৃজন করিয়াছেন, সেই মসলাতেই তিনি মনুষ্যশিশু সৃজন করিয়াছেন। হরি আকাশের নির্দ্দোষ চন্দ্রকে বলিলেন "চন্দ্র তুমি আমার বন্ধু," তিনি ভূতলের চন্দ্র মনুষ্যশিশুকে বলিলেন, "হে মনুষ্যশিশু, তুমিও আমার বন্ধু, তোমার ভাগবতী তনু আমার প্রেমে, হরিপ্রেমে গঠিত। গৌরাঙ্গ তুমি, পৃথিবীতে গিয়া প্রেম প্রচার কর।"

হরি আপনার স্বভাবের ভিতর থেকে জ্যোতি লইয়া, তেজ লইয়া, সোণা লইয়া জীবাত্মা গঠন করিলেন। ভগবান আপনার স্বরূপ দিয়া মনুষ্যশিশু সৃজন করিলেন। তিনি পুণ্য, প্রেম এবং নিরাকার চিন্ময় পদার্থ দিয়া জীবাত্মা গঠন করিলেন। তোমার আমার ভিতরে ঈশ্বর সখারূপে বাস করিতেছেন। হরি সাধুদিগেরও সখা আমাদিগেরও সখা।

ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী পৃথিবীতে আসিয়া মলিন মানবের সখা হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ভালবাসেন, আমরাও তাঁহাকে ভালবাসিব। ছেলেইত যথার্থ বন্ধু, ছেলের মত অমন বন্ধু আর কোথায় আছে?

কলিকালে সখ্যমূর্ত্তি। কলিকালে মনুষ্যশিশু ভগবানকে সখা বলিবে। কলিকালে যেমন এক দিকে নানা প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার এবং পাপের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে ঈশ্বরের করুণা গভীরতর এবং ঘনতর হইয়া নববিধানরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিযুগে যেমন এক দিকে কোন এক জন অবতার অথবা একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাইলাম না তেমনি নববিধান পাইয়া সকল ক্ষতি পূরণ হইল। বিধাতা এবারও আমাদিগকে কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একখানি শাস্ত্র দিলেন না; কিন্তু তিনি আপনাকে দান করিয়া এবার গরিব কাঙ্গালদিগের সকল অভাব মোচন করিলেন। এবার স্বর্গের জননী—আমাদিগের মাকে পাইয়া আমাদিগের সকল দুঃখ দূর হইল। কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একখানি বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন করিতে না পারিয়া যখন নিরুপায় পৃথিবী কাঁদিয়া বলিল "হে ঈশ্বর, হে ভগবান, এবার আমার কি গতি হইবে?" পৃথিবীর এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভগবান আমি গুরু, আমি বিধি, আমি জীবের সম্বন্ধ, আমি পাপীর সখা, আমি জীবকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখা দিব, আমি জীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে কথা বলিব" এই সকল

কথা বলিয়া এই নববিধান প্রেরণ করিলেন। হে ব্রাহ্মবন্ধু, তোমার আমার এই কলঙ্কিত তনুর মধ্যে ব্রহ্ম সখা হইয়া আছেন। এবার বিশ্বজননী তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের ঘরে লক্ষ্মী হইয়া সমুদয় কার্য্য করিবেন। এবার কোটি কোটি লক্ষ্মীর আবির্ভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। এবার ভুবন-মোহিনী জগজ্জননী তাঁহার আশ্চর্য্য পালনী শক্তি দেখাইয়া আমাদের সকলকে মোহিত করিবেন। এবার ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর সখ্যভাবে আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি পাপীর বন্ধু বিশ্বেশ্বর পাপী বন্ধুকে খাওয়াইতে-ছেন, পরাইতেছেন, আদর করিতেছেন।

বন্ধুগণ, যিনি তোমাদিগের অত্যন্ত নিকটে অন্তরতম সখা হইয়া তোমাদিগের প্রাণের মধ্যে এবং প্রতি ঘরে বাস করি-তেছেন, তাঁহাকে ব্রহ্মমন্দিরে সপ্তাহান্তে, কি বৎসরান্তে এক দিন ভগবান ভগবান বলিয়া ডাকিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হইবে? এবার যে হরি বলিতেছেন, "আমি আমার ভক্তের সঙ্গে এক হব, এবার আমার খাস দরবারে আমি আমার নববিধানভুক্ত ভক্তদিগকে দেখা দিব, এবং যাহারা আমাকে দেখিবে তাহারা আমার মধ্যে আমার বুকের ধন শ্রীচৈতন্য, ঈশা, শাক্য প্রভৃতিকেও দেখিতে পাইবে।"

এই নববিধানে যোগ, ভক্তি, সেবা, জ্ঞান, বৈরাগ্য সমুদয় ভাবের সামঞ্জস্য হইবে। এই বিধানে ঈশ্বর স্বয়ং যোগেশ্বর, ভক্তবৎসল, প্রভু, শাস্ত্রী, গুরু ও পরম বৈরাগী প্রভৃতি

সমুদয় স্বরূপ একত্র করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ঈশ্বর নিজে এবার আমাদিগের শাস্ত্র, মন্ত্র, বেদ, বিধি, বিধাতা, সখা সমস্ত। সখা সকল দুঃখ নাশ করেন। আদ্যাশক্তি ভগবতী এবার সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী লক্ষ্মীরূপে তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের ঘরে অবতীর্ণা হইয়াছেন। স্বর্গের জননী মা লক্ষ্মী তাঁহার ভক্তের গৃহে পরিচারিকা হইয়াছেন। আমি বলি "ক্ষুধার সময় আমাকে ভাত দিবে কে?" মা লক্ষ্মী বলেন "আমি যে অন্নপূর্ণা।" যখন আমি বলি "আমি যে মূর্খ, আমাকে জ্ঞান দিবে কে?" তখন ভগবতী বলেন, "আমি যে জ্ঞান-দায়িনী সরস্বতী।" যখন আমি বলিলাম "আমাকে যোগ শিখাইবে কে? "কেমনে হব যোগী?" মা যোগেশ্বরী বলিলেন, "আমার কাছে বস, আমি তোমাকে যোগ শিখাইব। আমার বুকের ভিতরে যাজ্ঞবল্ক্য, শাক্য প্রভৃতি বাস করি-তেছে।" আমি যখন বলিলাম "শ্রীগৌরাঙ্গের মত ভক্ত হইব কিরূপে?" মা বলিলেন, "আমার কাছে বস, আমার বুকের ভিতরে শ্রীচৈতন্য জীবিত রহিয়াছে, আমি তোমায় প্রাণ ভরিয়া ভক্তিসুধা খাওয়াইব।" মা, কলিযুগে হল কি? প্রথমেই বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্মে গুরু নাই, শাস্ত্র নাই, অভিভাবক নাই, এখন মা, বলিতেছি ঐ সকল কথা বলিয়া অপরাধ করিয়াছি। কেননা মা জগজ্জননী, এখন আমরা দেখিতেছি তুমি আমাদের গুরু, তুমি আমাদের শাস্ত্র, তুমি আমাদের অভিভাবক এবং তুমি আমাদের সমস্ত অভাব

মোচন করিতেছ। তুমি কেবল মা নহ, কিন্তু জীবের বন্ধু হইয়া তাহার সকল দুঃখ মোচন করিতেছ।

এই নববিধানে কোন মানুষ পথপ্রদর্শক নহে, কোন নরোত্তম সাধু নাই, এই বিধানে জগজ্জননী সর্ব্বস্ব। যতক্ষণ না মা হাত তুলে একটী সত্য দেন, ততক্ষণ কেহই একটী সত্য পাইতে পারে না। যখন ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী মার সঙ্গে জীবের এরূপ অব্যবহিত নিকট সম্বন্ধ, তখন এই নববিধান দিগ্বিজয়ী হইবেই হইবে। প্রাচীন কালের এক এক বিধানবাগানে এক এক ফুল ফুটিত, এই নববিধানবাগানে সকল ফুল ফুটিয়াছে। বিচিত্রস্বরূপ ঈশ্বর এই বিচিত্র উদ্যানের ভিতরে বসিয়া হাসিতেছেন। এই নববিধানের লোকেরা প্রাচীন সমুদয় বিধানের উত্তরাধিকারী। এই বিধান শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য, ঈশা, মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি সমুদয় প্রেরিত সাধুদিগের বিধান। যখন মা আমাদের বন্ধু হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা তাঁহার সমুদয় ভক্তসন্তানদিগকেও পাইলাম। এই ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানের ঘোরতর মহাযোগ স্থাপিত হইল। আজ শাক্যের মা, মৈত্রেয়ীর মা, ঈশার মা, মহম্মদের মা, শ্রীগৌরাঙ্গের মাকে আমরা মা বলিয়া ডাকিলাম।

মা বলিলেন, "বৎসগণ তোমরা ধন্য যে তোমরা আজ আমাকে মা বলিয়া ডাকিলে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে একটি বুঝিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে। তোমরা কি জান না তনয় আর মা এক। আমা হইতে বুকের ধন তোমরা বাহির

হইয়াছিলে; আবার কেন তোমরা আমার সঙ্গে এক হইয়া যাও না? আবার কেন অনন্ত চিন্ময়ীর ভিতরে ক্ষুদ্র চিৎ প্রবেশ করুক না? সন্তানগণ, এবার তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা বিসর্জ্জন দিয়া, আমিত্ববিহীন হইয়া, আমার সঙ্গে মহাযোগ সাধন না করিলে, এবারকার নববিধান পূর্ণ হইবে না এবং তোমরাও সুখী হইতে পারিবে না।" বাস্তবিক এবার মার সঙ্গে অভিন্ন না হইলে মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। সখ্যমুক্তি ভিন্ন এবার জীবের গতি ও শান্তি নাই। পূর্ব্বকার যোগী ঋষিগণ বলিতেন, "পরমাত্মা জীবাত্মাতে অভেদ," "আমি এবং আমার পিতা এক।" প্রাচীন সাধুরা এ সকল কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা নববিধানবাদী, আমরা প্রাচীন অদ্বৈতবাদ মানি না; কিন্তু আমাদিগের বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদের মধ্যেও অভেদবাদ রহিয়াছে। ছেলে তাহার মাকে মা বলিয়া ডাকে; কিন্তু তাহাতে মার সমুদয় খেদ মিটে না। মা অস্থির হইয়া বলিতেছেন, "আমার বাছাধন, কাছে এস, আমার প্রাণের ভিতর এস, এস হৃদয়ের রত্ন তোমাকে প্রাণসিন্দুকের ভিতরে রাখি।"

যোগ কি কঠোর তপস্যা? না। মার সঙ্গে তনয়ের যোগ সুধাময় যোগ। মা, আমরা তোমার কোলের উপযুক্ত নহি, কাল ছেলে মার কোলে বসিবে? চিরকাল যুগে যুগে সাধুজননী নাম লইয়া তুমি সাধুদিগকে কোলে করিয়াছ। এবার কলিযুগে পাপে কলঙ্কিত যত কাল ছেলেদের কি তুমি কোলে

করিবে? তোমার কি মা, ঘৃণা নাই? মার স্নেহ বুঝা গিয়াছে। গৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কেহ মার কাছে যাইতে পারে না। ছিছি মা, তুমি যদি কাল ছেলেকে সত্য সত্যই ঘৃণা কর তবে যে দয়াময়ী তোমার মা নাম ডুবিবে। কিন্তু মা, তুমি কাল ছেলেকে ঘৃণা করিতে পার না। তুমি বলিতেছ;—"আমার এক অঙ্গে গৌরাঙ্গ, আর এক অঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ। গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, সাধু অসাধু উভয়ের প্রতি আমার দয়া সমান থাকে।" মার কাছে পূর্ণাঙ্গ যেমন অপূর্ণাঙ্গও তেমন। বড় বড় ঋষির প্রতি যেমন তাঁহার দয়া, জগাই মাধাইয়ের প্রতিও ঠিক তাঁহার সেইরূপ ষোল আনা দয়া। মা ভুবনমোহিনী তাঁহার এক দিকে সাদা ভক্ত ছেলে, আর এক দিকে পাষণ্ড কাল ছেলেকে নিয়ে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার এক দিকে সমুদয় সাধু এবং অন্য দিকে সমস্ত অসাধু।

এবার এই নববিধানে মা বলিলেন, "আমি আমার সন্তানদিগের সঙ্গে এক হইব।" মার ইঙ্গিতে সাধু আস্তে আস্তে মার বুকের ভিতরে পলায়ন করিল। কেন সাধুর তিরোভাব হইল? ভাল ছেলে মার বুকের ভিতরে চলে গেল, ইহা দেখে কাল ছেলে কেঁদে উঠিল। কাল ছেলে বলিল "আমার সুন্দর ভাই কোথায় গেলেন, বুঝি আমার কাল দেখে পলাইয়া গেলেন, তিনি বুঝি রাগ করে পলাইয়া গেলেন।" প্রাচীন বিধানের সুন্দর মহাপুরুষেরা বুঝি নব-

বিধানের কাল পাপীদিগের সঙ্গে থাকিবেন না। মহাজনেরা কি হাড়ী বাগ্দী মুদ্দফরাস প্রভৃতি ছোট লোকের সঙ্গে নাচিবেন? পুরাতনে নববিধানে মিলিবে না। সাধু মহাজনেরা স্বর্গে মার বুকের মধ্যে লুকাইলেন, কৃষ্ণবর্ণ অবাধ্য ছেলেরা বাহিরে পড়িয়া রহিল। দুঃখী পাপীরা বলিল, ঈশ্বরের এক শত আট নাম প্রচার হইল, নানা প্রকার ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তিত হইল; কিন্তু পাপীদিগের দুঃখ ঘুচিল না; পৃথিবীর দুঃখী কাঙ্গালেরা স্বর্গলাভ করিতে পারিল না। আমাদের ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি স্বর্গে চলিয়া গেলেন; কিন্তু আমরা পড়িয়া রহিলাম, আমরা যোগধামে প্রেমধামে যাইতে পারিলাম না। দুঃখী সন্তানের দুঃখ দেখিয়া মা বলিলেন, "বৎস, তুমি তোমার সাধু ভাইকে চেন নাই, তুমি যাহা মনে করিয়াছ তাহা নহে, তোমার ভাই কেন আমার বুকের ভিতরে চলিয়া গেলেন তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। তোমার ভাই তোমাকে পথ দেখাইবার জন্য আগে আমার প্রাণের ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন, প্রচ্ছা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিলে তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে। তোমার ভক্ত ভাই আমার কোলে উঠিলেন তাই তুমি আমার কোলে উঠিতে সাহস করিতেছ। উনি একেবারে আমার প্রেমসাগরে ডুবিলেন, তাই তুমিও ডুবিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ।" মার মুখে এ সকল সুধাময় কথা শুনিয়া দুঃখীর মনে সান্ত্বনা

হইল। সত্যের জননী মা কেবল কি দুঃখীকে প্রবোধ দিবার জন্য এ সকল কথা বলিলেন? আদ্যাশক্তি মা সতী কোন কারণেই মিথ্যা বলিতে পারেন না, প্রবঞ্চনা করিতে পারেন না।

বাস্তবিক জগজ্জননী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সাধু অসাধু সকলেরই সখা। দুঃখী ভাই, তুমি কি মনে কর, অনেক পাপ করিয়াছ বলিয়া মার সঙ্গে যোগী হইতে পারিবে না? কিন্তু তুমি যাহাই কেন হও না তুমি যে মার নাড়ীর সঙ্গে বাঁধা। মার সঙ্গে সন্তানের বিচ্ছেদ হয় না। মার সঙ্গে সাধু অসাধু সকলেরই প্রাণের নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে। মার সঙ্গে কে না যোগী হইতে পারে? মা তাঁহার সাধু অসাধু সকল সন্তানকেই তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে ডাকিতেছেন।

বন্ধুগণ, তোমরা নববিধানে চিহ্নিত হইয়া সর্ব্বত্র এই যোগের কথা বিস্তার কর। ঈশ্বর পাপীর বন্ধু হইয়াছেন, আর জীবের ভয় কি? মার সঙ্গে যোগ করিলে আর পাপ করিবার ইচ্ছা থাকিবে না, পাপের ভয় একেবারে চলিয়া যাইবে। জগজ্জননীর প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার সমুদয় ভেদাভেদ চলিয়া গেল। নববিধানে জীব এবার মার সঙ্গে যোগ করিয়া আমিত্ববিহীন হইল। অভেদ ধর্ম্ম, অভেদ বিধান। ধন্য নববিধান তুমি! তুমি সমস্ত বিধানকে এক বিধান করিলে, সমস্ত বিধিকে এক বিধি করিলে,

এবং সেই এক জীবকে জীবেশ্বরের সঙ্গে এক করিয়া দিলে। নববিধান তোমার প্রসাদে আমরা এক বিচিত্র প্রমোদকাননে বসে আছি, তোমার নিকট অমূল্য রহস্য শিখিয়াছি। এখন দেখিতেছি ঈশ্বর ছাড়া জীব নাই, পৃথিবী নাই। জগদ্বন্ধু জগৎময়। প্রাণের বন্ধু বিশ্বেশ্বর এবার জীবকে সখ্যমুক্তি দিবার জন্য সখ্যবিধি প্রচার করিলেন। এস বঙ্গদেশ, এস ভারত, এস সমস্ত জগৎ, তোমরা সকলে এই সখ্যমুক্তি গ্রহণ কর।

কি সুন্দর বিধান প্রচারিত হইল। ঈশ্বরবিরুদ্ধ সমুদয় বিরোধ ও অসদ্ভাব উড়িয়া গেল। কোন বিরোধ নাই, তুমি আমি নাই, সকলের আমিত্ব ডুবিল জগতে, জগৎ ডুবিল মার ভিতরে। আজ মার বক্ষসমুদ্রে আমরা সকলে মৎস্যের মত ক্রীড়া করিতেছি। মার পুণ্যজলে স্নেহজলে আজ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মগ্ন হইল। মার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক এক হইল। সিন্ধুদেশ, ব্রহ্মদেশ, বঙ্গ, মান্দ্রাজ এক হয়ে গেল। দেশে দেশে দ্বেষ রহিল না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ রহিল না, সকলে এক জলে মগ্ন হইয়া গেল। জগজ্জননী সত্যের জল, জ্ঞানের জল, প্রেমের জল, পুণ্যের জল, শান্তির জল হইয়া সকলকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। জীবের প্রতি মার কত ভালবাসা, কত সখ্য, কত বন্ধুতা। এক মা, এক বিধান, আবার মার সন্তানও এক। নববিধান, প্রিয় নববিধান, কি শোভা দেখাইলেন! সুন্দর ছবি! জগন্মোহিনী মা, সকল

দুঃখ নিরানন্দ চলিয়া গেল, কেবল ভক্তদিগের প্রাণের মধ্যে, তোমার সন্তানদিগের প্রাণের মধ্যে, তোমারই প্রেমানন্দ রহিল।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানের বিজয়নিশান।

[একপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।]

রবিবার রাত্রি, ১১ই মাঘ, ১৮০২ শক;
২৩শে জানুয়ারি ১৮৮১।

নববিধানের অভ্যুদয়ে সকল জগৎ প্রেমে ভাসিল। নববিধানের প্রেমিক জন, সকল প্রেমে প্রেমিক হইল। নববিধানের জ্ঞানী জন, সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হইল। নববিধানের পুণ্যাত্মা, সকল পুণ্যে পুণ্যবান হইল। নববিধানের যোগী, সকল যোগে যোগী হইল। নববিধানের প্রভাবে সকল দেশ এক দেশ হইল, দূর নিকট হইল। পৃথিবীর সকল বিধানের প্রেম ভক্তি অনুরাগ, যোগ, জ্ঞান, সমাধি, উৎসাহ, মত্ততা আমাদিগের এই প্রিয়তম নববিধানের ভিতরে প্রবেশ করিল।

এই নববিধানে ঈশার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের দেখা হইল। ঈশা বলিলেন, "গৌরাঙ্গ ভাই, তুমি তোমার ভক্তিবিধান পূর্ণ করিবার জন্য চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে নবদ্বীপ

নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, আমি আমার মহাপ্রভুর বিধান পূর্ণ করিবার জন্য আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে পেলেষ্টাইন দেশের জেরুজেলাম নগরে জন্মিয়াছিলাম। কিন্তু আজ পৃথিবী হইতে এক নূতন সংবাদ আসিয়াছে। আজ শুনিতেছি, বঙ্গদেশে কলিকাতা নগরে, ভাই গৌরাঙ্গ, তোমার ভক্তির নিশান এবং আমার আনুগত্যের নিশান একত্র সিলাই করিয়া নববিধানবাদীরা আকাশে উড়াইয়া দিয়াছে। আজ নাকি কতকগুলি দুর্ব্বলহৃদয় বাঙ্গালীসন্তান তোমার নাম ও আমার নাম একত্র উচ্চারণ করিতেছে।" আবার গৌরাঙ্গ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ঈশাকে বলিতেছেন, "ভাই ঈশা, তুমি যে পৃথিবীকে বলিয়া আসিয়াছিলে, "প্রভু, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক।" তোমার সেই বিবেকের ধর্ম্ম, আর আমার হরিনামের রোলের প্রমত্ততার ধর্ম্ম একত্র হইয়া নববিধান নাম ধারণ করিয়াছে। ঈশা ভাই, পৃথিবীতে কি হইল। ঈশ্বরের আদেশে দুই ধর্ম্ম এক ধর্ম্ম হইল, দুই রস একত্র হইল।" ঈশা গৌরাঙ্গকে বলিতেছেন, "গৌরাঙ্গ ভাই, নববিধানবাদীদিগের বুকের ভিতরে তুমিও আছ, আমিও আছি। ভাই, তুমি কি টান বুঝিতে পারিতেছ না? নববিধানবাদীরা আমাদের দুই জনকেই টানিতেছে। পৃথিবী এত দিন পরে তোমার আমার মধ্যে যে গূঢ় যোগ আছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, নববিধান তোমার আমার ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছে, আর পৃথিবী স্বতন্ত্র

ভাবে আমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে না। এখন পৃথিবী তোমার আমার উভয় ধর্ম্ম একত্র করিয়া গ্রহণ করিবে। মুসা, মহম্মদ, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমি প্রভৃতি যতগুলি ভাই স্বর্গে বসে আছি, নববিধান আমাদের সমুদয়ের নিশান একত্র করিয়া পৃথিবীতে নিখাত করিবে, পৃথিবীতে মহম্মদ, মুসা, কবীর, নানক, নারদ, বুদ্ধদেব প্রভৃতির দ্বারা যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সে সমুদয় ধর্ম্ম হইতে মধু আহরণ করিয়া নববিধানবাদীরা এক নূতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে সেই নূতন মিশ্রিত সুধা পান করিয়া মহা উল্লাস ও আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ঐ দেখ তাহাদিগের সঙ্গে উৎসবানন্দ ভোগ করিবার জন্য চট্টগ্রাম, সিন্ধু, বম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশ দেশান্তর হইতে লোক সকল আসিয়াছে। ঐ দেখ তাহাদিগের উৎসবমন্দিরে এই নূতন সুধা পান করিয়া সকলে কেমন উন্মত্ত হইয়াছে। ভাইগুলি মন্দিরের এক দিকে এবং ভগ্নীগুলি আর এক দিকে রহিয়াছে। চল ভাই যাই, আমরা তাহাদিগের এই নববিধানের নিশান ধরিগে। তাহারা আমাদের সকলের নিশান একত্র করিয়া এক সংযুক্ত নিশান ধরিয়াছে, চল আমরা সকলে গিয়া সেই নিশান ধরি।"

মনে হইতেছে স্বর্গের সাধুগণ আসিয়া প্রত্যেক নববিধানবাদীকে এইরূপ বলিতেছেন, "প্রাণের বৎস, সাধু, সাধু, তোমার যাহা করিবার তুমি তাহা করিলে, তোমার

কার্য্য হইয়াছে, ধন্য তুমি যে তুমি পৃথিবীর সমুদয় সাধু ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও সমুদয় ধর্ম্ম গ্রন্থকে এক করিয়াছ।" সৃষ্ট আত্মা সর্ব্বব্যাপী নহে, সুতরাং পরলোকগত সাধু আত্মা সকল আমাদিগের নিকট প্রত্যক্ষভাবে আসিতে পারেন না; কিন্তু এক পবিত্র আত্মা আছেন যাঁহার ভিতর দিয়া তাঁহারা আমাদিগের নিকট তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ পাঠাইতে পারেন। স্বর্গের জননীর আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের মস্তকের উপরে তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদও আসিতেছে। তাঁহারা সকলে বিশ্বজননীর বক্ষ মধ্যে বাস করিতেছেন। ঈশা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সাধু ভক্তদিগের প্রাণ ঈশ্বরেতে একীভূত হইয়াছে যখনই আমাদিগের আত্মা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে স্পর্শ করে, তখনই গূঢ়ভাবে তাঁহার বক্ষস্থ সাধুমণ্ডলীর ভাবও আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে।

আজ মনে হইতেছে, তাঁহারা সকলে এই মন্দিরে আসিয়া আমাদিগের এই নববিধানের নিশান ধরিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরকে বলিতেছেন, "হায়! কি সুন্দর নিশান প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার নববিধানবাদীরা আমাদিগকে একত্র বাঁধিল!" শ্রীগৌরাঙ্গ, মহম্মদ, ঈশা, মুসা, শাক্য, নারদ প্রভৃতি পরস্পরকে বলিতেছেন, "দেখ ভাই, পৃথিবীতে তোমার দল আমার দলকে নিন্দা করে, তোমার দলের লোকেরা আমার স্থাপিত ধর্ম্মমন্দিরে যায় না, আমার প্রচারিত ধর্ম্ম-গ্রন্থের আদর করে না; কিন্তু আজ দেখ নববিধানবাদীদিগের

ব্রহ্মমন্দিরে কি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। নববিধানবাদীরা আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমন্দিরে তুমি আমি সকলেই আছি, তাহারা তোমার আমার প্রচারিত সকল ধর্ম্মগ্রন্থেরই সমাদর করে। তাহারা কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে না, কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া উপহাস করে না, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ঘৃণা করে না। দেখ, পৃথিবীতে কি সুন্দর নববিধানই প্রকাশিত হইল।"

ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য প্রভৃতি সকলে এই নব-বিধানের নিশান স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন। যেমন কড়্ কড়্ শব্দ করিয়া এক স্থান হইতে আর এক স্থানে তড়িতের সঞ্চার হয়, সেইরূপ কড়্ কড়্ শব্দ করিয়া ঈশা, মুসা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য প্রভৃতির আত্মা হইতে নববিধানবাদীদিগের আত্মাতে প্রত্যাদেশের জ্বলন্ত অগ্নি আসিতেছে। তড়িতের ন্যায় ঈশা মুসার ধর্ম্ম আসিয়া নববিধানকে উজ্জ্বল করিতেছে। ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি এই স্বর্গীয় তড়িতের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছ না? তোমাদিগের হৃদয়ে এই তড়িতের আঘাত না লাগিলে তোমাদিগের পরিত্রাণ নাই। দেখি এই তাড়িত-যোগে তোমাদের দল আঘাত পায় কি না। জগজ্জননী মা আনন্দময়ী তাঁহার সমুদয় সন্তানদিগকে লইয়া নববিধান বাদীদিগের নিকট আসিয়াছেন। এই নববিধানে মা তাঁহার প্রত্যেক সাধু সন্তানের সম্মান বাড়াইলেন। এই ভারতবর্ষে

শাক্যসিংহের নাম, যোগী ঋষিদিগের নাম, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম প্রায় ডুবিয়াছিল, নববিধান অভ্যুদিত হইয়া দেখ সকলের নাম পুনর্জ্জীবিত করিল। হিন্দুস্থান ঈশা, মুসা, মহম্মদ প্রভৃতি বিদেশী সাধুদিগকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করিত; আজ দেখ নববিধানের প্রসাদে তাঁহারা কেমন শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র হইয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের যোগ ধ্যান সমাধি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নববিধানের অভ্যুদয়ে সে সমস্ত পুনরুদ্দীপিত হইল। নববিধানের কি মাহাত্ম্য! ইহার প্রভাবে আজ হিন্দুসন্তান ঈশা, মুসা, মহম্মদ প্রভৃতি বিজাতীয় সাধুর নামে প্রমত্ত হইতেছে। নববিধানের বলে শিক্ষিত যুবকেরা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে মাতিতেছে, ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে। এ সমস্ত মা জগজ্জননীর প্রেমের চাতুরী। মার ইঙ্গিতে তাঁহার সমুদয় সন্তানেরা একত্র হইয়া নববিধানের প্রশস্ত অঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। নববিধানবাদীর হৃদয়ের ঈশা, মুসা, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য, কবীর, নানক, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন। আজ সাধুজীবনগুলি পদ্মানদীর ন্যায় দ্রুতবেগে এই ব্রহ্মমন্দিরে প্রবাহিত হইতেছে।

আজ মধুমাখা মা নাম কীর্ত্তন করিয়া নববিধানবাদীরা মাতিয়াছেন। আজ কয়টি সৌভাগ্যশালী বাঙ্গালীসন্তান আনন্দময়ী মার কোলে বসিয়া মার প্রেমসুধা পান করিতেছে। বাঙ্গালীদিগের এই সৌভাগ্য দেখিয়া স্বর্গে দেবতাদিগের

মধ্যে আনন্দের রোল্ উঠিয়াছে। স্বর্গের দেবতারা বলিতে-ছেন "আমাদের ইচ্ছা হয় সৌভাগ্যশালী ভক্ত বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে গিয়া মিশি।" কিন্তু পরলোকের নিয়ম নহে যে, সেখান হইতে কেহ সাক্ষাৎ ভাবে ইহলোকবাসীদিগের নিকট প্রকাশিত হন, কেবল তাঁহারা আমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন। আজ এই নববিধানে ঈশা, মুসা, মহম্মদ, শাক্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকলেরই গৌরব বৃদ্ধি হইল। আজ এই ব্রহ্মমন্দিরে শাঁক, কাঁসর, ঘণ্টা, গং এবং অর্গ্যান প্রভৃতি দেশীয়, বিদেশীয়, অনেক প্রকার বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আজ সিন্ধু, চট্টগ্রাম, বম্বে, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি ভারতের নানা দেশ হইতে ব্রহ্মসন্তানেরা আসিয়া এই নববিধানের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। আজ আমাদের সুখ, ভারতের সুখ, পৃথি-বীর সুখ।

মা আজ বিশেষ দয়া করিয়া আমাদিগকে এই কথা বলিলেন "সন্তানগণ, আর তোমাদের ভয় নাই, এখন আমি আমার স্বর্গের ভক্তদল, যোগিদল, সঙ্গে লইয়া তোমাদের বুকের ভিতরে বাস করিব"। বন্ধুগণ, যখন আমরা ব্রহ্মের আরতি করিতেছিলাম, যখন নিশান বরণ করিতেছিলাম, তখন আমরা বিশ্বজননীর সঙ্গে তাঁহার সমুদয় সাধু ভক্ত সন্তানদিগের আগমন অনুভব করিয়াছি। এই নববিধানের নিশানের ভিতর দিয়া সমুদয় ধর্ম্মবিধানের ভাব আসিতেছে। আকাশের বিদ্যুৎ ধরিবার জন্য, সমুদয় সাধুদিগের প্রত্যাদেশ

গ্রহণ করিবার জন্য, এই নববিধানপ্রণালী প্রস্তুত হইল। জগতের ধর্ম্মাকাশে নববিধানের এই প্রকাণ্ড নিশান উড়িতেছে। নববিধানের এই জয়ধ্বজা দেখিয়া পৃথিবীর পাপ দুঃখ দূর হইবে। জগতের প্রতি, ভারতের প্রতি, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রতি, বিশ্বজননীর কি দয়া! আজ যাঁহারা এই নিশান স্পর্শ করিলেন তাঁহাদিগের কি সৌভাগ্য! আজ ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মুখ কত উজ্জ্বল হইল! এই নিশানের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত যোগী ভক্ত সাধু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক আবদ্ধ রহিলেন। উড় নিশান, যাও নিশান, ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি এবং তাঁহার সমুদায় সাধু সাধ্বী সন্তানদিগের জয়-ধ্বনি করিয়া পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সমস্ত দিক জয় কর। জাহাজে উঠিয়া সমুদ্র পার হইয়া দূরে বহুদূরে যাও। শত্রুকুল দেখিয়া ভীত হইও না, নির্ভয়ে দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাও।

হে নববিধানের বিজয়নিশান, তোমার মধ্যে অনেক রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তোমাকে যে স্পর্শ করে তাহার আর ইন্দ্রিয়াশক্তি থাকে না, তাহাকে বৈরাগী হইতেই হইবে, যেখানে তোমার আবির্ভাব সেখানে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা। পাপকে যে পরাজয় করে সেই বিজয়নিশান (নিশান অর্থ জয়), যাহা পাপ সয়তানকে জয় করে তাহাই নববিধানের নিশান। বিবেক সিংহাসনের উপরে রাজরাজেশ্বরী বিশ্বজননী প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সাধু ভক্ত সন্তানগণ প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা

প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পোপহারে তাঁহার পূজা করিতেছেন। যেখানে মার পূজা প্রচার হইতেছে সেখানেই নববিধানের জয়ধ্বজা উড়িতেছে। এই নিশান মার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবে। ইহা পৃথিবীর পাপভার, দুঃখভার দূর করিবে। ইহা জীবের কুবাসনা, দুর্ভাবনা, দূর করিবে। এই নিশান দেখিয়া পাষণ্ড, অবিশ্বাসী, নাস্তিক সকল বিশ্বাসী আস্তিক হইবে। এই নববিধানের নিশান দিগ্বিজয়ী হইবে। ইহা ভগবানের বিরোধীদিগকে, মার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবে। এই নিশান দুর্জ্জয় প্রতাপের সহিত অশ্বারোহণ করিয়া দৌড়িতেছে। নব-বিধানের প্রেরিতগণ, এই নিশান হস্তে ধারণ করিয়া তোমরা দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাও, এই নিশানের বলে তোমরা বড় বড় বীরের কাছেও কুণ্ঠিত হইবে না। এই নিশান ধারণ করিয়া তোমরা দেশ বিদেশে গমন কর। তোমরা যেমন মাকে দেখিয়া মার সঙ্গে কথা কহিয়া সুখী হইয়াছ, এইরূপ তোমাদের ভাই ভগ্নীদিগকেও বিধানের সুধা পান করাইয়া সুখী কর।

ভাগবতী তনু।

রবিবার ২৪শে ফাল্গুন, ১৮০২ শক; ৬ই মার্চ্চ, ১৮৮১।

আত্মার আধার শরীর। শরীরের আধার আত্মা। শরী-রের ভিতরে আত্মা থাকে, আবার আত্মা বিনা শরীর জীবিত

থাকিতে পারে না। আত্মাকে অবলম্বন করিয়া শরীর বাঁচিয়া আছে, আত্মা না থাকিলে মৃত শরীর কোন কার্য্য করিতে পারে না। আবার শরীর বিনা আত্মা পৃথিবীতে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে না, সুতরাং শরীর যেমন আত্মার আধার আত্মাও তেমনই শরীরের অবলম্বন। দুই কথাই সত্য। আমরা মনে করি আত্মা শরীরের মধ্যে থাকে; কিন্তু শরীরের সাহায্যে যে আত্মা ভক্তিরস, যোগরস, জ্ঞানরস, পুণ্যরস ও শান্তিরস লাভ করে তাহা সর্ব্বদা ভাবিয়া দেখি না। জীবাত্মা এই শরীরের ভিতর দিয়া পৃথিবী হইতে ধর্ম্মমধু, জ্ঞানমধু, প্রভৃতি নানা প্রকার সুমিষ্ট রস আহরণ ও সঞ্চয় করে, অতএব শরীর যে আমাদিগের পক্ষে আদরের বস্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদিও আমরা জড়বাদীর ন্যায় এই অসার অস্থায়ী শরীরকে সর্ব্বস্ব মনে করি না, তথাপি প্রত্যেক ব্রাহ্মকে মানিতে হইবে যে, এই অনিত্য শরীর, আত্মার নিত্য ধর্ম্ম, নিত্য জ্ঞান এবং নিত্য সুখ উপার্জ্জনের বিশেষ সহায়। জীবাত্মা ধরাধামে এই অসার শরীরের দ্বারা অনন্তকালের জন্য প্রচুর সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া পরলোকে গমন করে। কিন্তু এক দিকে যেমন আমাদের এই তনু আত্মার জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মোন্নতির প্রধান সহায় আর এক দিকে আবার তেমনি আত্মার অধোগতি ও সর্ব্বনাশের কারণ। এক দিকে যেমন এই দেহ নানা প্রকার ধর্ম্ম ও বিপুল আনন্দের কারণ, অন্য দিকে ইহা আবার

নানাবিধ অধর্ম্ম ও অশেষ যন্ত্রণার হেতু। আমরা এই শরীর দ্বারা যেমন পুণ্য ও শান্তি সঞ্চয় করিতে পারি তেমনি ইহা দ্বারা আবার নানা প্রকার পাপ ও দুঃখ সঞ্চয় করিতে পারি।

মানুষ, তোমার কাম ক্রোধাদি পাপের আধার কোথায়? তোমার শরীরের ভিতরে। যতদিন পর্য্যন্ত না তোমার তনু ভাগবতী তনু হইবে ততদিন ইহা পশু তনু, ততদিন ইহা ষড়রিপুর তনু, দুর্দ্দান্ত দৈত্যদিগের বাসগৃহ। হয় তনু ভগবানের এবং ভক্তদিগের বাসস্থান হইবে, নতুবা ইহা অসুরদিগের আলয় থাকিবে। হে মানুষ, যদি তুমি তোমার শরীরের মধ্যে ভগবান ও তাঁহার সাধুদিগকে প্রতিষ্ঠিত না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অসুরেরা আসিয়া তোমার শরীর অধিকার করিবে। তোমার দুই চক্ষু দুই ভয়ঙ্কর অসুরের বাসস্থান হইবে, তোমার দুই কর্ণ দুই দৈত্যের গর্ত্ত হইবে, তোমার রসনা কাল সর্পের আধার হইয়া চারিদিকে নরনারীর কর্ণে পাপ গরল ঢালিয়া দিবে, তোমার প্রত্যেক হস্তের পাঁচ অঙ্গুলীতে পাঁচ কাল দৈত্য আসিয়া বসিবে। তোমার সমস্ত শরীর পাপের আলয় হইয়া উঠিবে। তোমার শরীরের কোন অংশ, কোন যন্ত্র শুদ্ধ থাকিতে পারিবে না।

শরীরকে যদি আপন বশে না রাখিতে পার তবে কেবল মন শাসন করিয়া কি হইবে? শরীর যদি পাপের উত্তেজক না হয় কেবল মনের মধ্যে কি দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে পারে? পাপের ইচ্ছা চরিতার্থ হয় কিসে? এই অপবিত্র

দেহে। এই শরীর দেখিতে অতি সুন্দর এবং নির্দ্দোষ মনে হয়; কিন্তু ইহার ভিতরে যখন পাপাসুরেরা আসিয়া বাস করে তখন ইহা অত্যন্ত বিকৃত ও ভয়ঙ্কর হয়। যখন সয়-তান আসিয়া চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ এই আটখানি যন্ত্র অধিকার করে তখন এই শরীর নিতান্ত দুর্গন্ধ নরক হইয়া উঠে। যদি তোমার তনু অসুরের তনু হয় তবে বাহিরে একটু সামান্য প্রলোভন দেখিলেই তোমার শরীরের ভিতরে কুবাসনার অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। শরীরের কোন স্থানে পাপ লুকাইয়া থাকে তাহা নহে। আমার চক্ষে অমুক পাপ, আমার মস্তিষ্কে অমুক পাপ, অথবা আমার হস্তে অমুক পাপ, এরূপে কেহ পাপ ধরিতে পারে না। শরীরের অতি সূক্ষ্ম স্নায়ুকেও তুমি ধরিতে পার; কিন্তু অতি স্থূল পাপকেও তুমি ধরিতে পার না। যতদিন না ভাগবতী তনু লাভ করিতে পার ততদিন তোমার তনু পাপে পূর্ণ থাকিবে, কিন্তু সে পাপকে তুমি দেখিতে পাইবে না।

এক আসুরিক তনু, আর এক ভাগবতী তনু। এই দুইয়েতে অনেক প্রভেদ। আসুরিক তনু ষড়রিপুর অধীন, ভাগবতী তনু রিপুর অতীত, কেবল ভগবান ও তাঁহার ভক্ত-দিগের লীলা বিহার ক্ষেত্র। পশু তনুতে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থপরতা এ সমস্ত রিপু উত্তেজিত হয়। বাহিরে কাম্য বস্তু দেখিলেই পশু তনুর ভিতরে কামনার অনল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, বাহিরে রাগের কারণ দেখিলেই

পশু তনু ক্রোধাগ্নিতে দগ্ধ হয়, বাহিরে টাকা প্রভৃতি লোভের সামগ্রী দেখিলেই পশু তনু সেই দিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হয় এবং লোভ চরিতার্থ করিবার জন্য নির্দ্দোষ বালকের মুণ্ড ছেদন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে পশু তনুতে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হয়। এইরূপে অজিতেন্দ্রিয় আসুরিক তনু সর্ব্বদাই নানা প্রকারে নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে।

ভাগবতী তনু ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাগবতী তনু যিনি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মন প্রশান্ত, তিনি সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার শরীর অতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। উহা দেবতাদিগের বাসস্থান। তাঁহার শরীর মন্দিরের মধ্যে কোন পাপাসুর আসিতে সাহস করে না। তাঁহার শরীর পুণ্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ। সয়তান সে দিকে যাইতে পারে না। যে ব্রহ্মচারী যুবা ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছেন, নিত্যো-পাসনা তাঁহার প্রাণের সম্বল, তাঁহার অন্তরে নিরন্তর বৈরাগ্যানল জ্বলিতেছে। কোন প্রকার পাপাসক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রহ্মচারী বৈরাগীর ভাগবতী তনু দর্শন করিয়া ষড়রিপু পরস্পরকে বলে, "ভাই এই ব্যক্তি বজ্রদেহী, ইহাকে স্পর্শ করি আমাদের এমত সাধ্য নাই, ইহার অস্থির ভিতরে জ্যোতিষ্ময় ব্রহ্ম এবং তেজস্বী পুণ্যাত্মা সকল বাস করিতেছেন, এ শরীর আমাদিগের বাসের পক্ষে অনুকূল নহে। ইহার মস্তিষ্কে নিরন্তর সুমতি ও সচ্চিন্তার

উদয় হয়। ইহার হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রেমের প্রবল স্রোত বহি-তেছে। ইহার রক্ত মাংস ও অস্থি মধ্যে সাধু বীরেরা হুঙ্কার করিতেছেন। এমন ভয়ানক স্থানে থাকা হইবে না। চল আমরা ইহাকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকদিগের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করি।"

এইরূপে ভাগবতী তনুর তেজ দেখিয়া কাম ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত আসুরিক ভাব ও পশুভাব পলায়ন করে। যে শরীর এইরূপে কুভাব শূন্য হয়, সেই শরীর ঈশ্বরের আদেশে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে, শীঘ্রই সাধুদিগের বাসস্থান হয়। প্রকৃতির এই নিয়ম যে কোন স্থান শূন্য থাকিবে না। যখনই কোন শরীর হইতে কাম ক্রোধাদি সমস্ত অসুর দল চলিয়া গেল এবং উহা শান্ত ও পাপ শূন্য হইল, তখনই সেই শরীর শূন্য দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ, ঈশা, মুসা, সক্রেটিস্, মহম্মদ, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সাধু মহাত্মাগণ আসিয়া সেই শূন্য শরীর পূর্ণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা পরস্পরকে বলেন "কেমন ভাই, আমরা ইহার শরীরের ভিতরে স্থান পাব তো?"

শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশা ও শাক্য প্রভৃতি দেবাত্মাদিগকে বলিলেন "এই শরীর আমার অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে। ইহার বক্ষ এমন প্রশস্ত যে এমন বক্ষ ছাড়িয়া আমি আর কোথায় গিয়া নৃত্য করিব?" মহর্ষি ঈশা বলিলেন, "ভাই গৌরাঙ্গ, আমিও এই শরীর মন্দিরে বাস করিব, আমি পৃথিবী ছাড়িয়া আসিবার সময় আমার বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলাম, তোমরা

আমার রক্ত মাংস পান আহার করিলে আমি তোমাদিগের শরীরের মধ্যে বাস করিব। এই সাধু যুবা আত্মেচ্ছা বিনাশ করিয়াছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিবার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে, অতএব আমি ইহার শরীরের মধ্যে রক্ত মাংস রূপে বাস করিব। শ্রীগৌরাঙ্গ, কেবল তুমি ইহার শরীরের মধ্যে গিয়া বাস করিবে, আমি কি ইহার শরীরের মধ্যে " যাইব না?"

যখনই শরীরের ভিতর হইতে অভক্তি ও স্বেচ্ছাচাররূপ দুই অসুর পলায়ন করিল, দুই দুষ্প্রবৃত্তি চলিয়া গেল, তখনই দুই স্বর্গীয় প্রবৃত্তি, দুই সাধু সেই শরীরের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। মহর্ষি ঈশা ও শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া সেই সাধু যুবার রক্ত নদীর উপকূলে দুই সুন্দর বাগানযুক্ত বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহাদিগের শুভাগমনে সেই সাধুহৃদয়ের ভিতরে দুই জীবন্ত ফোয়ারা উৎসারিত হইতে লাগিল। সেই সাধু যুবার অন্তরে দুটী মধুময়ী প্রকৃতি প্রতিষ্ঠিত হইল, দুই জন সাধু আসিয়া তাহাকে দুটী স্বর্গীয় প্রবৃত্তি দান করিলেন। এক জনের পিতার প্রতি অনুরাগ, আর এক জনের প্রভুর প্রতি আনুগত্য।

অতএব শরীরকে সর্ব্বদা শুদ্ধ রাখিবে। শরীর যদি প্রতিকূল হয়, পাপাচরণ করিয়া শরীরের রক্ত যদি বিষাক্ত হয়, তবে তোমার শরীরের দুর্গন্ধে ঐ দুই মহাপুরুষ পলায়ন করিবেন। শরীরকে শুদ্ধ না রাখিয়া যদি তুমি ঐ দুই

মহাপুরুষের জন্য বহু ব্যয় করিয়া জয়পুরের শ্বেত প্রস্তরে দুটী মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ কর, তথাপি তাঁহারা পলায়ন করিবেন। আশ্চর্য্য লাবণ্যযুক্ত অট্টালিকার পার্শ্বে যদি তোমার দুর্গন্ধময় শরীর থাকে সে অট্টালিকায় রাজারা তো থাকিবেনই না, তাহাতে কাঙ্গালেরাও থাকিবে না। পাপেতে মৃত্যু হয়, এবং মৃত্যু হইলেই শরীরে দুর্গন্ধ হয়, সেই দুর্গন্ধময় শরীরের নিকটে কেহই থাকিতে পারে না। তোমরা কি জান না এই কলিকাতা মহানগরীতে দুর্গন্ধময় স্থানে যদি অতি সুন্দর অট্টালিকাও থাকে তাহা কেহ লয় না। সেইরূপ পাপ দুর্গন্ধময় শরীর বাহ্যিক শোভায় অত্যন্ত সুন্দর হইলেও তাহা সাধুদিগের মনোনীত হয় না।

যাহার শরীরের ভিতর হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতির ভয়ানক দুর্গন্ধ উঠিতেছে তাহার শরীরের মধ্যে কিরূপে পুণ্যাত্মা সাধুগণ বাস করিবেন? এই জন্য হে জীবসকল, তোমার মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পবিত্রতা সাধন কর। শরীরকে কোন কারণে অপবিত্র হইতে দিও না। শরীরকে লোভী, স্বেচ্ছাচারী, ইন্দ্রিয়াসক্ত ক্রোধান্ধ অর্থাৎ ঈর্ষানলে প্রজ্জ্বলিত হইতে দিও না। শরীরের অস্থির মধ্যে যদি অনবরত জ্বলন্ত বৈরাগ্যানল পোষণ করিতে না পার তবে শরীর বিলাসী হইবে, কেবল ভাল খাইতে চাহিবে, ভাল পরিতে চাহিবে, ভাল শয্যায় শয়ন করিতে চাহিবে। শরীর ঈশ্বরের আদেশ ধর্ম্মের নিয়ম

লঙ্ঘন করিয়া, নানা প্রকার বিলাস সুখ ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবে।

তোমরা যদি বল, "আমাদের শরীর যাহা হউক না কেন আমাদের মন উন্নত।" তোমাদিগের সে কথা আমি বিশ্বাস করিব না। দুর্গন্ধময় স্থানে সোণার বাড়ী যেমন তেমনই বিলাসপরায়ণ দুর্গন্ধময় শরীরের মধ্যে হৃদয় মন। যদি প্রলো-ভনের অতীত ও নিরাপদ হইতে চাও তবে শরীর মন উভয়কে শুদ্ধ রাখিতে যত্ন কর। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তে ঈশা, তোমার বক্ষস্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তোমার মস্তিষ্কে মহাত্মা সক্রেটিস্। দেখাও তোমার দক্ষিণ হস্তের মধ্যে ঈশা অবতরণ করিয়া তাঁহার স্বর্গস্থ মহাপ্রভুর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে-ছেন এবং তোমার বক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ হরিনাম রসে উন্মত্ত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন এবং তোমার মস্তিষ্কের মধ্যে সক্রেটিস্ পারলৌকিক চিন্তা এবং আত্মার অমরত্ব প্রভৃতি বিষয়ক পবিত্র চিন্তা দ্বারা তোমাকে আমোদিত করিতেছেন। দেখাও, যেমন জব্বলপুরের নির্ম্মল প্রস্রবণে লোকে মহা আনন্দ ও মহা আগ্রহের সহিত স্নান করিয়া আপনাদিগকে শুদ্ধ ও সুখী মনে করে সেইরূপ তোমার রক্ত প্রবাহরূপ নর্ম্মদা নদীতে স্বর্গের সাধুগণ আসিয়া স্নান করিতেছেন। দেখাও, তোমার দক্ষিণ হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলির মধ্যে পাঁচটী পুণ্যাত্মা দয়াল সাধু বসিয়া আছেন। দেখাও, তোমার মস্তকের কেশরূপ নিবিড় কাননের মধ্যে সেই

প্রাচীন আর্য্য যোগী ঋষিগণ আসিয়া ধ্যান সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন।

এইরূপে যখন দেখিবে যে তোমার সর্ব্বাঙ্গে নানা দেশের এবং নানা যুগের সাধুভক্তগণ আসিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তোমার রক্তনদীর মধ্যে পৃথিবীর সমুদয় সাধু মহাত্মাদিগের রক্ত মিলিয়া গিয়াছে তখন জানিবে যে তুমি ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছ। নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মগণ, সাধুদিগের রক্ত মাংস পান ভোজনরূপ নবব্রত তোমরা সাধন কর। পশুর ন্যায়, ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের ন্যায় আর তোমরা পান ভোজন করিও না। তোমরা ঈশার পুণ্যরূপ অন্ন আহার কর, শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমরূপ বারি পান কর। পশু জন্তু সকল অসার অন্ন খায়, ভক্তগণ দেবপ্রসাদ দেবীপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সাধুগণ অন্নের মধ্যে ব্রহ্মের প্রেম এবং ব্রহ্মের তেজ আহার করেন। ব্রহ্ম পরিপূরিত অন্ন আহার করিয়া সাধুদিগের মনে যোগবল, ভক্তিবল, পুণ্যবল বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঈশা প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে তোমরা আহার পান করিতে আরম্ভ কর। যে ভাবে অন্ন আহার করিলে সাধুজীবন পোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় সেই ভাবে তোমরা অন্ন গ্রহণ কর। অকৃতজ্ঞ অভক্তভাবে কদাচ তোমরা ঈশ্বরের দান গ্রহণ করিও না। আহারকে কদাচ তোমরা ইন্দ্রিয় সুখের পরিপোষক মনে করিও না। অতি পবিত্র ও গম্ভীর ভাবে আহার করিবে। পবিত্রতার অন্ন আহার কর, ভক্তিবারি

পান কর। অশুদ্ধ মনে অন্ন ভোজন করিও না, অভক্ত ভাবে জল পান করিও না। ভোজন পান করিবার সময় ঈশা চৈতন্যের জীবন ভোজন পান করিবে, সাধুজীবন আহার না করিলে ভাগবতী তনু লাভ করিতে পারিবে না।

তোমার তনু সাধুদিগের সেবায় উৎসর্গ কর। তোমার নিজের জন্য আর তোমার তনু রাখিও না। যিনি তোমার এই তনু সৃজন করিয়াছেন, সেই বিশ্বপতি, সেই দেহপতি সেই প্রাণারাম, সেই মনোভিরামের সেবায় এই তনু নিযুক্ত করিয়া ইহাকে রামতনু ভাগবতী তনু করিয়া লও। যদি তোমার তনু ঈশ্বরের বিরোধী হয় তবে আর সেই পাপতনু রাখিও না। তোমার চক্ষু, কর্ণ, রসনা, হস্ত, পদ, কিম্বা শরীরের কোন যন্ত্র যদি ঈশ্বরের অবাধ্য হয় তবে তাহা কাটিয়া ফেল। তোমার শরীরের সমুদয় অঙ্গ ভাগবতী তনুর অঙ্গ হইবে। তোমার চক্ষু ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দ্রব্য দেখিবে না। তোমার কর্ণ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিবে না। তোমার রসনা তাঁহার নামরস ভিন্ন অন্য রস পান করিবে না। মনের আধার এই শরীরকে ধর্ম্মের অনুকূল করিয়া লইবে।

যখন হস্ত দ্বারা তোমার নিজের অঙ্গ স্পর্শ করিবে তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে তুমি ঈশা নারদ প্রভৃতির অঙ্গ স্পর্শ করিতেছ। তোমার শরীরের রক্ত মাংস তাঁহাদিগের অধিকৃত এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছে। তুমি স্পষ্ট

দেখিতে পাইবে ঈশা গৌরাঙ্গ প্রভৃতি আসিয়া তোমার রক্ত নদীতে খেলা করিতেছেন। তোমার শরীর আর তোমার থাকিবে না। তোমার শরীর স্বর্গীয় দেবতাদিগের লীলাক্ষেত্র হইবে। মানুষ ভ্রমান্ধ হইয়া বলে আমার শরীর, তোমার শরীর, উহার শরীর, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক মানুষের শরীর ঈশ্বর এবং সাধুদিগের লীলার ক্ষেত্র। যাঁহারা সত্যবাদী তাঁহারা বলেন "আমার তনু আমার নহে, ইহা সাধুদিগেরই তনু। এই তনুর উপরে আমার কোন অধিকার নাই।" দয়াময় পিতা কৃপা করুন আমরা যেন সকলে এইরূপ ভাগবতী তনু লাভ করি।

ত্রিনীতিবাদ।

রবিবার ১৫ই চৈত্র, ১৮০২ শক; ২৭শে মার্চ্চ ১৮৮১।

ত্রিতাপের শান্তি ত্রিনীতিবাদ। যখন সত্য ত্রয় বিজ্ঞানের দ্বারা এক হয় তখন ত্রিতাপের শান্তি হয়। তিনকে যিনি এক করেন তিনিই সুখী হন। তাহারা ত্রিতাপে কষ্ট পায় যাহারা তিনকে স্বতন্ত্র মনে করে। এককে যিনি তিনের মধ্যে উপলব্ধি করেন ধন্য সেই সাধু, ধন্য সেই ব্রহ্মজ্ঞানী! নববিধানের আলোক অবলম্বন করিয়া ত্রিনীতি মত বিবৃত করিতেছি, ব্রাহ্মগণ, শ্রবণ কর। ত্রিসত্যের মধ্যে এক সত্য, ত্রিসত্তার মধ্যে এক সত্তা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি উপলব্ধি

করা প্রকৃত বিজ্ঞানের কার্য্য। তিন বাস্তবিক মূলে এক। এই সত্য মানিতে হইবে, এই সত্য সাধন করিতে হইবে, এই সত্য সাধন করিয়া সুখী হইতে হইবে। সমুদয় বিবাদের মীমাংসা, সকল বিরোধের সামঞ্জস্য হওয়া কেবল নববিধানের দ্বারাই সম্ভব। অতএব বল হে নববিধান, তিন কিরূপে এক হইল। ঈশ্বর, আমি এবং জগৎ এই তিন সত্য, এই তিন সত্তা, এই তিন কিরূপে এক হইবে?

এই আমি, এই তোমরা, আর আমার এবং তোমাদের মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর। এক ঈশ্বর আমাদের প্রতি-জনের মধ্যে প্রাণরূপে বর্ত্তমান। সেই এক সত্য, সেই এক সত্তা ঈশ্বর, তোমার আমার মধ্যে না থাকিলে আমরা কেহই বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না। মূল সত্য, মূল সত্তা তিনি। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমরা সকলে অবস্থিতি করিতেছি। কিন্তু এই ঈশ্বর, এই আমি, এই তোমরা, যতক্ষণ এই তিন স্বতন্ত্র দেখিতেছি ততক্ষণ আমরা ভ্রমে ভ্রান্ত, ত্রিতাপে সন্তপ্ত। এই ভেদজ্ঞান হইতে নানা প্রকার অধর্ম্ম, শোক, জ্বালা, যন্ত্রণা উৎপন্ন হয়। যতক্ষণ আমরা এই তিনের মধ্যে এক না দেখিতে পাই ততক্ষণ কিছুতেই প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে পারি না। এই তিনের মধ্যে একত্ব অনুভব করাই প্রকৃত শান্তির অবস্থা। এই তিনকে স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়া যদি ব্রহ্মপূজা করি সেই অপূর্ণ ব্রহ্মপূজাতে পাপের স্রোত বন্ধ হয় না। ব্রহ্মের মধ্যে আমি এবং জগৎ, অথবা

জগৎ, এবং আমার মধ্যে ব্রহ্ম, এই সত্য স্পষ্টতর রূপে উপলব্ধি না করিলে পুণ্যের পথ শান্তির পথ আবিষ্কৃত হয় না।

আমি যদি ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ কিম্বা ব্রহ্ম ছাড়া আমি ভাবিতে পারি, অথবা যদি জগৎ এবং আমি ছাড়া ব্রহ্ম ভাবিতে পারি তবে তিনের ঐক্য হইল না। বাস্তবিক ব্রহ্মের মধ্যে সমস্ত জগৎ অবস্থিতি করিতেছে। জ্ঞানের অবস্থায় আমরা কোন মতেই ব্রহ্মবিহীন জগৎ কল্পনা করিতে পারি না। ব্রহ্মের মধ্যে জগৎ এবং আমি, আবার আমার মধ্যে ব্রহ্ম এবং জগৎ। ব্রহ্মবিহীন জীব হইতে পারে না। অতএব যখনই আমি আমাকে দেখিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার মধ্যে ব্রহ্মকে দেখিব। ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, প্রতি-পালক, পরিত্রাতা ঈশ্বর দূরে নহেন; কিন্তু তিনি প্রত্যেকের প্রাণের মূলে প্রাণরূপে বসতি করিতেছেন। তিনি যেমন প্রতিজনের সঙ্গে বাস করিতেছেন সেইরূপ আবার সমষ্টি-ভাবে সমস্ত মানবমণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং বিশেষরূপে প্রেরিত মহাত্মাদিগের মধ্যে স্থিতি করেন।

যখন আমরা ঈশ্বরকে মহাপুরুষদিগের জীবনে দেখি তখন আমরা ইতিহাসের ঈশ্বরকে মহীয়ান্ করি। প্রথমতঃ বেদান্তের সময় যোগী ঋষিরা নির্গুণ নির্ব্বিকার ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতেন। ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ, তিনি আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ যখন ঈশ্বর তাঁহার পুত্র মহাপুরুষদিগের জীবনে অলৌকিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন

করেন তখন পৃথিবী তাঁহাকে পুরাণ কিম্বা ইতিহাসের ঈশ্বর বলে। তৃতীয়তঃ ঈশ্বর পবিত্রাত্মা হইয়া প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রত্যেক জীবাত্মাকে পবিত্র ও উন্নত করেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মময় এই জগৎ। কি মহাপুরুষ, কি ক্ষুদ্র আত্মা প্রত্যেকেই ঈশ্বরেতে জীবিত ও প্রতিপালিত। ঈশ্বর ভিন্ন কাহারও গতি নাই। তিনি প্রতি জনের জীবন, তিনি প্রতি জনের আশ্রয়। এই আমি, এই তোমরা, এই ঈশ্বর, বল এই তিনের মধ্যে যোগ না বিয়োগ? যদি বল এই তিন এক মূলসূত্রে বদ্ধ এবং পরস্পর গূঢ়রূপে গ্রথিত তবে তোমরা যোগানন্দ রস পানের অধিকারী। যদি বল এই তিন স্বতন্ত্র, অথবা এই তিনের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে গূঢ় যোগ নাই তবে তোমাদের এই ভেদ জ্ঞান তোমাদিগকে অযোগী ও অবৈরাগী করিয়া তোমাদিগকে নানা প্রকার অধর্ম্মের নরক কুণ্ডে নিক্ষেপ করিবে।

বিজ্ঞান চক্ষে, বিশ্বাস নেত্রে দেখিতে পাইবে এই তিনের মধ্যে গূঢ় যোগ রহিয়াছে। ব্রহ্ম, আমি এবং জগৎ এই তিন গূঢ়ভাবে সম্মিলিত। তিন সত্যের মধ্যে এক সত্য, ত্রিসত্তার মধ্যে এক সত্তা, ত্রিনীতির মধ্যে এক নীতি, এই গূঢ় রহস্য বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম কদাচ জীব কিম্বা জগৎ হইতে পারেন না। পিতা কিরূপে পুত্র হইবেন? স্রষ্টা কিরূপে সৃষ্ট হইবেন? অনন্ত কিরূপে ক্ষুদ্র হইবেন? অথচ এই তিন মূলে এক—এই গূঢ় তত্ত্ব

আবিষ্কার করিতে হইবে। নববিধান এই গূঢ় রহস্য জানিয়াছেন।

সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের দেহ নাই। ব্রহ্ম সৎ চিন্ময় নির্ব্বিকার নিরবয়ব। তিনি সত্যস্বরূপ, পূর্ণ সত্য। তাঁহার সত্য কথন সত্য ধর্ম্মের এক খণ্ড। ইহার জন্য দেহ চাই। সত্য বচন বলিবার জন্য রসনা অর্থাৎ মাংসের প্রয়োজন হইল। এই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে সত্য ঈশ্বরেতে ছিল, জগতের পরিত্রাণের জন্য সেই সত্য মাংস রূপ ধারণ করিল। অর্থাৎ যদিও ঈশ্বর স্বয়ং সত্যস্বরূপ তিনি সাকার মনুষ্যের ন্যায় সত্য কথা বলিতে পারেন না। এই জন্য পৃথিবীতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ তাঁহার ইচ্ছাতে রক্তমাংসময় দেহধারী তাঁহার একজন সত্যবাদী পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। সত্য কথা বলিতে হইলেই রসনা চাই, মাংস চাই। আবার সত্য শ্রবণ করিবার জন্য কর্ণ চাই, সুতরাং সত্য শ্রবণের জন্যও মাংসের প্রয়োজন হইল। আবার সত্য অনুষ্ঠানের জন্য হস্ত চাই, এই জন্য মনুষ্যকে রক্ত মাংসময় হস্ত প্রদত্ত হইল।

দুগ্ধ পোষ্য শিশুর জীবন রক্ষা করিবার জন্য ঈশ্বরের নিরাকার স্নেহ মাতৃস্তনের আকার ধারণ করে। সেই এক প্রেমময় ঈশ্বর হইতে জননীর হৃদয়ে স্নেহ এবং স্তনে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়। এইরূপে বিজ্ঞান চক্ষে দেখিলে বুঝিতে পারিবে, কি জড়রাজ্যে কি মানব দেহে সর্ব্বত্র ঈশ্বরের জ্ঞান-

লীলা এবং প্রেমলীলা। জীবশরীর ব্রহ্ম প্রেমের নিদর্শন। ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাঁহার অসীম জ্ঞান এবং অসীম প্রেমের পরিচয় দিতেছে। ক্ষুদ্র শিশুর মুখ যেমন, মাতৃস্তনরূপ দুগ্ধ নিঃসারণ যন্ত্র ঠিক তাহার উপযোগী। জীবের নানা প্রকার অভাব মোচন করিবার জন্য ঈশ্বরের জ্ঞান এবং প্রেম, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা, হস্ত, মাতৃস্তন প্রভৃতি নানারূপ ধারণ করে। এ সমস্ত ঈশ্বরের প্রেমলীলার যন্ত্র।

ব্রহ্মের সত্য জিহ্বার আকার ধারণ করিয়া সত্য কথা এবং প্রেমবাক্য বলিয়া পতিত জগৎকে উদ্ধার করে। ঈশ্বরের স্নেহ মাতৃস্তনের ভিতর হইতে দুগ্ধের আকারে বাহির হইয়া নিরাশ্রয় ক্ষুদ্রশিশুদিগের জীবন পোষণ করে। এইরূপে অল্পাধিক পরিমাণে ঈশ্বরের গুণ সকল মনুষ্যের ভিতরে আকৃতি ধারণ করে। ঈশ্বর স্বয়ং নির্লিপ্ত ও আকৃতি বিহীন; কিন্তু তাঁহার দয়া স্নেহ প্রভৃতি ভাব মনুষ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনুষ্যের আকার ধারণ করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বর বর্ত্তমান রহিয়াছেন। সাধু অসাধু উচ্চ নীচ সকলেই ঈশ্বর তনয়; কিন্তু যাহার রসনা খুব অধিক পরিমাণে হরিনাম করে সেই নরোত্তমের জীবনে উজ্জ্বলতর রূপে ঈশ্বরের প্রকাশ হয়।

যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু পবিত্র, সকলই ঈশ্বরের। ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন রসনা একটী সত্য উচ্চারণ করিতে পারে না, কর্ণ একটী সত্য শ্রবণ করিতে পারে না,

মন একটী সত্য চিন্তা করিতে পারে না। মানুষের প্রত্যেক সত্য কথনের মধ্যে সত্যস্বরূপের প্রকাশ হয়। ঈশ্বরের সত্য মনুষ্যের রসনা দ্বারা উচ্চারিত ও প্রকাশিত হয়। ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের আধার; কিন্তু পৃথিবীতে একটী ক্ষুদ্র স্নেহের প্রতিমা মা না থাকিলে আমরা তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিতে শিখিতাম না। অর্থাৎ আমরা তাঁহার অনন্ত সন্তানবাৎসল্যের কিছুই বুঝিতে পারিতাম না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রেম সেই সন্তানের মার মনে স্নেহ এবং স্তনে দুগ্ধরূপে পরিণত হয়। ঈশ্বর বলেন আমি সতীর হৃদয়ে সতীত্বরূপে এবং জননীহৃদয়ে অপত্য স্নেহরূপে প্রকাশিত থাকিব। সৃষ্টিতে নিয়ত ব্রহ্মের এই বাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে।

ঈশ্বরের দয়া মাংস হইয়া প্রেমিক মানবদেহে আকার ধরিতেছে। সেইরূপ নির্ব্বিকার, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী ঈশ্বরের বৈরাগ্য বৈরাগীশরীরে মাংসের আকার ধরিতেছে। পৃথিবীর মহাপুরুষদিগের কঠোর বৈরাগ্য ব্রহ্মের অনন্ত বৈরাগ্যের আভাস মাত্র। সেই পরম বৈরাগী ঈশ্বর জীবের শরীরের ভিতরে বসিয়া অনাসক্তি ও আত্মনিগ্রহরূপে খেলা করিতেছেন। আমার হাত যখন কোন দুঃখী গরিবকে পয়সা দেয় তখন আমার হাতের ভিতরে ঈশ্বরের দয়ার হস্ত কার্য্য করে। এই কথা শুনিয়া হে ভ্রান্ত মনুষ্য, কখন বলিও না যে ঈশ্বর মানুষ হইলেন! এইরূপ অসত্য কথা বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে

কলঙ্কিত করিও না। কিন্তু বল যে ঈশ্বরের অনন্তপ্রেম বিন্দুরূপে মানুষের মধ্যদিয়া প্রকাশিত হইয়া দুঃখীর দুঃখ মোচন করিল। জীবের ভিতর দিয়া ব্রহ্মের প্রেম বিনিঃসৃত হইল।

ঈশ্বর সকল গৌরবের অধিকারী; সকল সৎকর্ম্মের গৌরব তাঁহারই। সৎকর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া ঈশ্বরের নিকটে কাহারও দর্প করিবার অধিকার নাই। তাঁহার নিকটে সকল দর্প চূর্ণ হইয়া যায়। অত্যন্ত জঘন্য লোক যদি সৎকর্ম্ম করে তাহাও ঈশ্বরের প্রেমের উত্তেজনায় সম্পাদিত হয়। সকল মানুষের ভিতরেই ঈশ্বরের অবতরণ কিন্তু তাঁহার বিশেষ অবতরণ মহাপুরুষদিগের জীবনে। চকমকির পাথর আঘাত করিলে কিম্বা দীপ শলাকা জ্বালিলে যেমন অন্ধকার মধ্যে চড়াৎ করিয়া আগুন বাহির হয় সেইরূপ এই পাপ অন্ধকারময় মলিন হৃদয়ের মধ্যে স্বয়ং ঈশ্বর প্রত্যাদেশ বাহির করেন। যখনই এইরূপে আমি প্রত্যাদিষ্ট হই তখনই ইন্দ্রিয় দমন হয় এবং মন ঈশ্বরের পুণ্য শান্তির অধিকারী হয়। ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ মৃতসঞ্জীবনী শক্তি লইয়া জীবাত্মার মধ্যে অবতীর্ণ হয়।

ঈশ্বর স্বয়ং আমাদিগের ভিতরে আমাদিগের শক্তি হইয়া আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের প্রাণ হইতে নূতন নূতন প্রেম সঞ্চার হইতেছে। প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তি জানেন তিনি আর কোন গুরুর হস্তে

নাই, ব্রহ্ম তাঁহাকে পাইয়াছেন এবং তিনি ব্রহ্মকে পাইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের এবং ব্রহ্ম তাঁহার। তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত। ব্রহ্মের সৎ স্বভাব তাঁহার স্বভাব। আপনার বক্ষে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিয়া প্রত্যাদিষ্ট আত্মা কি ইতিহাসের মধ্যে কি প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দেখিতে পান।

ঈশ্বর ইতিহাসের মহাপুরুষদিগের মধ্যে, ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যে, ঈশ্বর প্রত্যাদিষ্ট আত্মার ভিতরে, এই তিনেতেই ঈশ্বর। যথার্থ পূর্ণ ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইলেই ইতিহাস ও প্রকৃতির মধ্যে যে তাঁহার আবির্ভাব ও বিচিত্র লীলা তাহাও গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বর তাঁহার সাধুভক্ত সন্তানদিগকে ছাড়িয়া তোমার বাড়ীতে যাইতে পারেন না। যদি তুমি তাঁহাকে চাও, তাঁহার প্রেরিত মহাপুরুষদিগকেও সমাদর করিতে হইবে। জগতের ইতিহাসে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি যত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের নাম লেখা আছে সে সমুদয়কে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্ম তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাসীর বাটীতে আবির্ভূত হন।

হে ভক্ত, তুমি ইতিহাসের একটী পাতাও কাটিতে পার না। প্রাচীন যোগী ঋষিদিগের মধ্যে ভগবান যোগেশ্বররূপে প্রকাশিত; বুদ্ধদেবের ভিতরে সর্ব্বত্যাগী পরম বৈরাগীরূপে; মুসার ভিতরে বিবেকসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রাজারূপে; ঈশার প্রাণের মধ্যে পিতা ও প্রভুরূপে; শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে

প্রেমোন্মত্ত সখারূপে। ঈশ্বর দেশে দেশে যুগে যুগে যত লীলা করিয়াছেন এবং তাঁহার যত বিচিত্র স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন সে সমস্ত গ্রহণ করিতে হইবে। নববিধান ইতিহাসের কোন অংশ হইতে ঈশ্বরকে বিযুক্ত করিতে পারেন না। হে ব্রাহ্ম, তুমি বলিতেছ তোমার হৃদয় ছোট; কিন্তু ঈশ্বর তোমার হৃদয়কে তাঁহার সমুদয় বিধান গ্রহণ করিবার উপযুক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছেন। যোগী, ভক্ত, প্রেমিক, জ্ঞানী, কর্ম্মী সকলেই তোমার বক্ষের ভিতরে স্থান পাইতে পারেন।

এক ঈশ্বর নানারূপে নানা প্রকার সাধকের নিকট প্রকাশিত হইয়াছেন। যিনি হিমালয় শিখরে করতলন্যস্ত আমলকবৎ যোগীদিগের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তিনিই ঈশা মুসা ও শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দিয়াছিলেন। সেই তিনিই আজ তোমার আমার প্রাণের মধ্যে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করিতেছেন। সেই পুরাতন ইতিহাস ও বর্ত্তমান প্রকৃতির ঈশ্বর ঘনীভূত হইয়া আমার প্রাণের ভিতরে প্রত্যাদেশের অগ্নি জ্বালিয়া দিতেছেন। ইতিহাস, প্রকৃতি এবং আমার আত্মার মধ্যে সেই এক ঈশ্বরকেই দেখিতেছি। ঐ এক ঈশ্বর পৃথিবীর ভিতর দিয়া, জনসমাজের ইতিহাসের ভিতর দিয়া আমার ভিতরে আসিলেন। আমার মধ্যে তিন এক হইল। যিনি ইতিহাসের ঈশ্বর তিনিই প্রকৃতির ঈশ্বর, এবং যিনি ইতিহাস ও প্রকৃতির

ঈশ্বর তিনিই আমার ঈশ্বর। অতএব তিন ঈশ্বর হইল না, এক ঈশ্বর। একেতে তিন মিশিয়া গেল। এক ব্রহ্মসত্তার ভিতরে সমুদয় সত্তা ডুবিয়া গিয়াছে। এক সত্য স্বরূপ ব্রহ্মকে সমুদয় সৃষ্ট সত্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। সেই এক ব্রহ্ম অনন্ত আকাশে বিস্তৃত, ইতিহাসের মহাপুরুষদিগের জীবনে প্রকাশিত, আবার প্রত্যেকের আত্মার ভিতরে অভ্যুদিত।

পাপীর জন্য সাধুর প্রায়শ্চিত্ত।

রবিবার ২২শে চৈত্র, ১৮০২ শক; ৩রা অপ্রেল ১৮৮১।

ঈশ্বরের একটী কার্য্য আপাততঃ অন্যায় বলিয়া বোধ হয়। এই কার্য্যটীর গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া কত লোক কুতর্ক করে, এবং কুতর্ক করিয়া ভ্রমে পড়ে। সে অন্যায় কার্য্যটী কি? জগতের দোষের জন্য নির্দ্দোষ সাধুদিগকে কষ্ট দেওয়া। বাস্তবিক অনেকে এই প্রশ্ন করে যদি ঈশ্বর যথার্থই ন্যায়বান্ হন তবে তিনি জগতের পাপ রাশির জন্য তাঁহার ভক্তদিগকে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলেন? এ কি সুবিচার? এ কি ন্যায় নিষ্পত্তি? কোন্ ন্যায় অনুসারে অপরাধী জগতের জন্য সাধুদিগকে দণ্ড পাইতে হইল?

দুষ্ট ব্যভিচারীদিগের জন্য পৃথিবীর মহাপুরুষেরা আপনা-দিগের জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। তাঁহারা আপন আপন

বহুমূল্য রক্ত দিয়া পাপী পৃথিবীর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। দুষ্ট পৃথিবী মহাপুরুষদিগের মস্তক ছেদন করিয়া ভয়ানক নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিল। ইতিহাস এ সকল নিদারুণ ঘটনা লিখিবার সময় কাঁদিতে লাগিল। ন্যায়বান্ ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর অভক্তদিগের পরিত্রাণের জন্য সাধুজীবন বলিদানরূপে গ্রহণ করেন। অসাধুদিগের কল্যাণের জন্য সাধুরা অকাতরে আপনাদিগের প্রাণ দান করেন। পাপী উদ্ধারের জন্য স্বর্গস্থ প্রভু সাধুদিগের মস্তক চাহিলেন; প্রভুর দাস সাধুগণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগের মস্তক দিলেন।

শত শত ভীষণাকার নিষ্ঠুরচিত্ত দানবপ্রকৃতি মনুষ্য পৃথিবীর এক একজন সাধুর মস্তক ছিন্ন করিল। শত্রুদিগের অস্ত্রাঘাতে সাধুর শরীর হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। সেই রক্তপাতে সাধুর মৃত্যু হইল। কিন্তু সেই এক এক বিন্দু রক্ত হইতে সিন্ধুতুল্য পুণ্য উঠিয়া পৃথিবীর রাশি রাশি পাপ কলঙ্ক ধৌত করিল। নরবলি যদি দিতে হয় তবে ব্রহ্ম-সিংহাসনের সমক্ষে সাধু সজ্জনের জীবন বলি দেওয়াই কর্ত্তব্য। সাধু ভিন্ন আর কে নরবলির উপযুক্ত? যেমন তেমন জীবন ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। সাধু সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হও তবে ঈশ্বর তোমাকে বলিস্বরূপ গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা জগতের পরিত্রাণের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দীন বৈরাগী হইয়াছিলেন অসাধু পৃথিবী তাঁহাদিগকেই নিষ্ঠুররূপে সংহার করিয়াছে। কোন সাধুকে ক্রুশে হত করিয়াছে,

কাহাকেও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে, কাহাকে হিংস্র জন্তুর নিকটে নিক্ষেপ করিয়া মারিয়াছে, কাহাকেও নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়া বধ করিয়াছে।

সাধুদিগের প্রতি অবিশ্বাসী পাপাসক্ত পৃথিবীর ভয়ানক নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন স্মরণ করিলে হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়। এ সকল দুর্বিষহ ঘটনা দেখিয়াই অনেকে জিজ্ঞাসা করে সাধুদিগের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ হইতে দেওয়া কি ঈশ্বরের অবিচার নহে? পরের পাপের জন্য সাধু কেন মরিবেন? কিন্তু সাধু ভিন্ন আর কে পরের দুঃখ ভার সহ্য করিবেন? দুঃখী পাপী পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য আর কে এত ব্যাকুল হইবেন? আর কাহারও স্কন্ধ পাপভার বহন করিতে পারে না। এই জন্য পতিতপাবন ভগবান দশ বংশের পাপ, দশ জাতির পাপ, সমস্ত পৃথিবীর পাপভার সাধুর স্কন্ধে স্থাপন করেন।

সাধু পরদুঃখে সর্ব্বদা দুঃখী হন। তাঁহার সমস্ত শরীরে পরের দুঃখানলের জ্বালা যন্ত্রণা। হে সর্ব্বত্যাগী সাধু, কৈ তুমি তোমার আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার ও ধন সম্পত্তির জন্য তো এত ভাব না, তুমি পরের জন্য কেন ব্যস্ত? পর-দুঃখে কেন তুমি দুঃখী হইলে? পরের দুঃখানলে কেন তুমি জ্বলিতেছ? আহা, অমুক ব্যক্তির অন্ন বস্ত্র নাই, অমুক ব্যক্তি রোগে মরিতেছে, অমুক ব্যক্তি কেন সুরাপান করিল, অমুক গ্রামে আজ পর্য্যন্ত কেন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল না, কেন

এখন পর্য্যন্ত নর নারীর ব্যবহার পবিত্র হইল না, এ সকল চিন্তায় কেন তুমি আপনাকে আকুল করিতেছ? পরের দুঃখের জ্বালায় রাত্রিতে তোমার নিদ্রা হয় না। তুমি দিবা-নিশি কেবল পৃথিবীর নরনারী সকল কিরূপে শুদ্ধ ও সুখী হইবে এই ভাবিতেছ। হে সাধু, তুমি আত্ম-বিস্মৃত হইয়া জগতের সুখে সুখী, জগতের দুঃখে দুঃখী হইয়াছ। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তুমি একীভূত হইয়া গিয়াছ। কি চীন রাজ্যে কি আমেরিকা ভূখণ্ডে যে কেহ কোন প্রকার দুঃখ সহ্য করে তাহা তোমার দুঃখ। অন্য লোক কাঁদিলে তুমি কাঁদ, অন্য লোক হাসিলে তুমি হাস। চীন হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত যত দেশ, যত গ্রাম, যত নগর আছে, এ সকল স্থানে যত লোক বসতি করিতেছে তাহাদের সকলের বিপদে তুমি বিপন্ন, তাহাদিগের প্রতিজনের দুঃখে তুমি দুঃখী। তোমার দুঃখ ভারের পরিমাণ নাই। অন্য লোককে ব্যাঘ্রে কামড়াইল, তুমি মনে করিলে তোমাকে বাঘে কামড়াইয়াছে। অপরের রোগ হইয়াছে তুমি মনে করিলে তোমার রোগ হইয়াছে; অপরে পাপের জন্য আত্মগ্লানিতে পুড়িতেছে, তুমি মনে করিলে যেন তুমি পুড়িতেছ।

বাস্তবিক সাধু হওয়া বিষম দায়। সাধুর মস্তকের উপরে সমস্ত মানব মণ্ডলীর গুরুতর দুঃখভার আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। সাধারণ লোক সাধুর বুকের দুঃখাগ্নির গভীরতা ও তেজস্বিতা বুঝিতে পারে না। সকল পৃথিবী যদি একজন

হয় তবে সেই একজন সাধু সজ্জন। স্বার্থপর সংসারের কীট পরদুঃখে কাতর হইতে পারে না। পরদুঃখে কাতর হওয়া, পরদুঃখ মোচন করিবার জন্য দয়ার্দ্র হওয়া যথার্থ নিঃস্বার্থ সাধুর লক্ষণ। সাধুর আপনার দুঃখ নাই; কিন্তু পরদুঃখে তিনি সর্ব্বদা দুঃখী। সকলে ঠাণ্ডা জল খাইল, সাধু আগুনের জল খাইলেন। দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণায় সহস্র সহস্র লোক মরিতে লাগিল সাধারণ লোকেরা এ সকল দুর্ঘটনা দেখিয়া সুখে নিদ্রা গেল; কিন্তু সাধু কাঁদিতে লাগিলেন।

সাধু হইবামাত্র আপনার জীবনকে বলির জন্য প্রস্তুত রাখিতে হইবে। যে পরিমাণে সাধু সেই পরিমাণে পরের দুঃখ ভার বহন করিতে হয়। জগতের পাপ দুঃখ ভার লঘু করিবার জন্যই ঈশ্বর তাঁহার স্বর্গ হইতে সাধু সন্ন্যাসী, বৈরাগী, যোগী, ভক্ত সকলকে প্রেরণ করেন। যিনি যে পরিমাণে সাধু তাঁহাকে সেই পরিমাণে পরের দোষের জন্য দণ্ড সহ্য করিতে হয়। পরের দোষের জন্য সাধুকে দণ্ড সহ্য করিতে হয়, এই কথা বলা হইলেই অনেকে মনে করে তবে ঈশ্বর অন্যায় আচরণে অপরাধী; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেন না সাধুগণ যে পরের দুঃখে দুঃখী হন তাহা তাঁহাদিগের পক্ষে দণ্ড নহে; কিন্তু সাধুতার পুরস্কার এবং তাহা জগতের মঙ্গল সাধনের বিশেষ উপায়। যদি কয়জন মহাপুরুষ জীবন না দেন তবে পাপী জগৎ কিরূপে উদ্ধার হইবে? যখন পাপী বিশ্বাসের সহিত, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই

কথা বলিতে পারিবে "অমুক সাধু আমার জন্য মরিয়াছেন" তখন সাধুর জীবনধারণ সার্থক হইবে। জগতের এই স্বাভাবিক উক্তি, "সাধুরা রক্ত না দিলে উপাসনা বিহীন লোক সকল উপাসনাশীল হইত না, পাপাসক্ত লোক সকল বৈরাগী হইত না।"

সাধুর জীবদ্দশায় পতিত জগৎ তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে পারে না। তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন পাপীরা সাধুর নিঃস্বার্থ উদার ভাব বুঝিতে পারে তখন তাহারা সাধুর দুঃখ ও মনোবেদনা স্মরণ করিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। প্রত্যেক সাধু মহাপুরুষ পাপী জগতের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেন। প্রায়শ্চিত্তের অর্থ ইহা নহে যে ঈশ্বর সাধুর রক্তে তুষ্ট হন। ভগবান কি প্রিয় পুত্রের রক্ত গ্রহণ করিতে ভালবাসেন? তিনি কি ভক্তরক্ত লোলুপ, না ভক্তবৎসল? প্রায়শ্চিত্তের অর্থ এই যে, যে কেহ পরের দুঃখ স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে, কিম্বা পরদুঃখ মোচনের জন্য আপনার রক্ত পাত করে, ঈশ্বর বিশেষ আশীর্ব্বাদের সহিত সেই অশ্রু ও সেই রক্ত গ্রহণ করেন এবং উহা দ্বারা জগতের মুক্তি সাধন করেন।

হে ব্রাহ্ম, তুমি আপনার স্ত্রী পুত্রের জন্যই বা কত কষ্ট বহন কর এবং কত রাত্রিই বা জাগরণ কর? তোমার ভাবনার বিষয় তিন চারিটী লোক; কিন্তু যে সাধুর কোটি কোটি সন্তান তাঁহার কত দুঃখ একবার ভাবিয়া দেখ দেখি।

যাহার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা আছে তাহার দুঃখ দেখিলে তোমার কত দুঃখ হয়। আর যে সাধুর প্রেম সমস্ত জগতের প্রতি বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে সমস্ত জগতের দুঃখে তাঁহার কত দুঃখ। হে গৃহস্থ ব্রাহ্ম, তুমি একটী ক্ষুদ্র পরিবারের দুঃখ ভার বহন করিতে পার না, আর যিনি শত শত গ্রাম, শত শত নগর এবং বড় বড় ভূখণ্ডের দুঃখ ভার বহন করেন তাঁহার দুঃখের গুরুত্ব কেমন অসহনীয়!

সাধুর মনে যত দয়া বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ পরদুঃখ মোচন করিবার জন্য যত আকুলতা বাড়ে তত তাঁহার দুঃখ বৃদ্ধি হয়। পরদুঃখহারী ঈশ্বর সাধুদিগকে এই নিয়মের অধীন করিয়া দিয়াছেন। সাধু হইলেই শত শত দেশের দুঃখভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিতে হয়। সাধুরা যতই পৃথিবীর বিলাস লালসা পাপাসক্তির আগুন এবং রাশি রাশি দুঃখ যন্ত্রণা দেখিতে পান ততই তাঁহারা সহানুভূতি জন্য পরদুঃখের জ্বালায় অস্থির হন। এই দুঃখ অথবা দয়ার জ্বালাতেই তাঁহারা মরিয়া যান। সাধুদিগকে বধ করিবার জন্য ক্রুশ, অগ্নি, অথবা শেলকে নিমন্ত্রণ করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহারা আপনাদিগের দয়ার জ্বালাতেই আপনারা দগ্ধ হন। দয়াশীল পুরুষেরা জানেন দয়ার আগুন কেমন অসহ্য আগুন। প্রেমিক ব্যক্তি জানেন প্রেমের আগুন কেমন অসহনীয়। যেমন বাতি অপরকে আলোক দান করিয়া আপনার আগুনে আপনি ক্ষয় হইতে থাকে এবং ক্রমে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ

মহাপুরুষেরাও পৃথিবীর দুঃখী পাপীদিগকে সুখী করিবার জন্য প্রেমালোক দিতে দিতে আপনাদিগের প্রেমানলে আপনারা দগ্ধ হন। "হে প্রেমিকদল, তোমরা পরের জন্য প্রাণ দেও" সাধুদিগকে এরূপ উপদেশ দিতে হয় না। তাঁহারা আপনাদিগের প্রেমের উত্তেজনাতেই আপনারা মরিয়া যান।

হে ভারতবর্ষের নববিধানাশ্রিত ব্রাহ্মগণ, পৃথিবীর সাধুদিগের জীবন অথবা মরণ দেখিয়া তোমাদিগের মনে কি কোন মহৎ ভাবের উদয় হয় না? পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য তোমরা কয়জন যদি ঈশ্বরের চরণে জীবন উৎসর্গ না কর তবে হিন্দুস্থানের অধর্ম্ম-পাপের জন্য আর কে প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এত শতাব্দীর রাশীকৃত পাপ জঞ্জাল দূর করিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড জন-হিতৈষী সর্ব্বত্যাগী সাধুদল চাই। অসাধারণ দয়া, অসাধারণ হিতৈষণা চাই। দুই একজন সামান্য লোক হাজার বৎসরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে না। নববিধানের বন্ধুগণ, তোমরা সকলে এক হৃদয় হইয়া জাগিয়া উঠ। তোমাদিগের জীবনে যাহা কিছু ঈশ্বরের ভাব, স্বর্গীয় ভাব আছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া পতিত জন্মভূমিকে উন্নত ও উদ্ধার কর।

অসাধারণ সহিষ্ণুতা, অসাধারণ দয়া, অসাধারণ বিশ্বাস, অসাধারণ বৈরাগ্য, অসাধারণ আত্মজয়, অসাধারণ পরসেবা প্রভৃতি সদ্‌গুণ না দেখিলে বিপথগামী জগৎ ফিরিবে না।

যেমন রোগ কঠিন ও বহু দেশব্যাপী তেমনি ঔষধও খুব শক্ত এবং প্রবল হওয়া আবশ্যক। যেমন পাপ, উহাকে জয় করিতে তেমনি বৈরাগ্য চাই। বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত, আত্ম-জয়ের দৃষ্টান্ত, কিম্বা বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত কি কেবল একজন লোকে বদ্ধ থাকিতে পারে? প্রেরিত মহাপুরুষেরা জগতের পরিত্রাণের জন্য অকাতরে আপনাদিগকে বলিদান করিলেন। প্রেরিত প্রচারকেরাও সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া উচ্চ ধর্ম্ম-জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। হে গৃহস্থ ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি এ সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়াও জগতের পরিত্রাণের জন্য কিছুই করিবে না? বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত কি কেবল মহাপুরুষ ও প্রচারকদিগের মধ্যেই বদ্ধ থাকিবে? ভগবানের কি ইচ্ছা নয় যে গৃহাশ্রমেও বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত হউক? "কল্য-কার জন্য ভাবিও না" এই উপদেশ কি কেবল অল্প কয়জন লোকের জন্য? না। ভগবানের ইচ্ছা, কি সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, কি গৃহস্থ বৈরাগী সকলেই এই নিয়ম পালন করেন।

হে ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগের ভ্রাতারা দেশের পরিত্রাণের জন্য বৈরাগী হইয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া গেলেন, তোমরা কোন প্রাণে ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিষয় বাসনার দাস ও সংসারের কীট হইয়া থাকিবে? পরদুঃখে কি কখনও তোমাদের দুঃখ হয় না? দেশের যুবারা কেন উপাসনাশীল হইল না? স্ত্রীরা কেন ব্রহ্মপরায়ণা হইল না? বালক বালিকারা কেন সুনীতি পরায়ণ হইল না, এ সকল সচ্চিন্তা ও জগতের

কল্যাণ কামনা কি তোমাদিগের স্বার্থপর মনে কদাপি স্থান পায় না? তোমরা কোন্ প্রভুর সেবা কর? তোমরা কাহার জন্য সমস্ত দিন কার্য্যালয়ে পরিশ্রম কর? আর তোমরা স্বার্থপর বৈরাগ্যবিহীন বিষয়ী হইয়া সংসারের সেবা করিও না। তোমরা দৈনিক পরিশ্রম দ্বারা যত অর্থ অর্জ্জন করিবে তৎসমুদয় সেই সর্ব্বত্যাগী ভগবানের হস্তে অর্পণ করিও। তোমরা আর কদাচ আপনাদিগের ও আপনাদিগের পরিবারের ভরণ পোষণের বিষয় চিন্তা করিয়া মনকে কলঙ্কিত করিও না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী হইয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানের উপর নির্ভর কর। ভগবান নিত্য এই কথা বলিতেছেন, "কেবল প্রেরিতেরা কল্যকার জন্য ভাবিবে না তাহা নহে, কিন্তু কাহারও কল্যকার জন্য ভাবা উচিত নহে, কেন না আমি প্রতিজনের পিতা এবং প্রতিপালক।" নববিধান ভগবানের এই বাক্য সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিতেছেন। ঈশ্বরের আদেশে নববিধানাশ্রিত সকলেই ঈশা, মুসা, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনদিগের প্রদর্শিত বৈরাগ্য পথে চলিবে। প্রেরিত প্রচারকেরা সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী হইয়া পূর্ণ বৈরাগ্য পথে চলিতেছেন। অল্পত্যাগী গৃহস্থ ব্রাহ্মেরাও আপনাদিগের উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া বৈরাগ্য পথে চলিবেন। প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল গৃহস্থ ব্রাহ্ম ভগবানের হস্তে উপার্জ্জিত সমস্ত ধন সমর্পণ করিয়া সংসারাশ্রমে যোগ বৈরাগ্য স্থাপন করিবেন। যেমন সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের পাত্র, সেইরূপ প্রত্যেক ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ বৈরাগীও তাঁহার আশীর্ব্বাদের পাত্র।

বিষয় এবং বৈরাগ্য।

রবিবার ২৯শে চৈত্র, ১৮০২ শক; ১০ই এপ্রেল ১৮৮১।

বিষয় এবং বৈরাগ্য দুই দিকে, মধ্যস্থলে গোলাকার পৃথিবী। একবার বিষয় টানিতেছে পৃথিবীকে, আর একবার বৈরাগ্য টানিতেছে পৃথিবীকে। নিয়ত এই দুয়ের মধ্যে সংগ্রাম চলিতেছে। অনেক দিন যদি পৃথিবী বিষয়ী থাকে আবার বৈরাগ্য প্রবল হইয়া পৃথিবীর উপর আপনার আধিপত্য স্থাপন করে। পৃথিবীতে যতবার বিষয়ীদল প্রবল হইয়াছে ততবার মহাবৈরাগী সকল আসিয়া প্রকাণ্ড বৈরাগ্যের অনল প্রজ্জ্বলিত করিয়া গিয়াছেন। বিষয়াসক্তির মহৌষধ বৈরাগ্য। ঈশা, মুসা, শাক্য, চৈতন্য প্রভৃতি প্রধান বৈরাগীগণ বিষয়াসক্ত রুগ্ন পৃথিবীর সুচিকিৎসক। প্রবল বিষয়রোগ দূর করিবার জন্য সর্ব্বত্যাগী পরম বৈরাগী ঈশ্বরের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া প্রকৃত বৈরাগীগণ স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন। প্রধান প্রধান সাধুগণ ইতিপূর্ব্বে ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করিয়া গিয়াছেন যে যখনই পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়াসক্তি, পাপ ব্যভিচার প্রবল হইবে তখনই স্বর্গ হইতে মহাবীর বৈরাগীর দল আসিয়া মায়া পাশ ছেদন করিয়া পৃথিবীকে পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন।

বিষয়ের মহৌষধ বৈরাগ্য। বৈরাগ্য-ঔষধ সেবন ভিন্ন বিষয়-রোগাক্রান্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। ঈশ্বরের পরিত্রাণদায়িনী কৃপার এমনই আয়োজন যে যখনই পৃথিবীতে বিষয়ের প্রাবল্য হয় তখনই বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হয়। যখনই বিষয়-রোগাক্রান্ত পৃথিবী মৃতপ্রায় হয় তখনই স্বর্গ হইতে বৈরাগীদল আসিয়া রুগ্ন পৃথিবীর চিকিৎসা ও রোগ প্রতীকার আরম্ভ করেন। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দুর্দ্দশা জানিয়াই রক্ষাকালী, অনন্তকালী, সর্ব্বশক্তিময়ী মহাকালী এই ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীতে মহাপুরুষদিগের শুভাগমন কেন হয়? এই ঘোর বিষয়াসক্ত পৃথিবীতে সময়ে সময়ে বৈরাগীদল কেন আসেন? পৃথিবীর এত লোক কেন সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া বৈরাগী হন? ব্রহ্মচারী বৈরাগীগণ গৈরিক বস্ত্র ধারণ করেন কেন? ধর্ম্মের জন্য এত কষ্ট সহ্য করেন কেন? সংসারের সুখ সম্পদের নিকট বিদায় লইয়া কষ্ট-কুটীরে বাস কেন? এ সমুদয় তীব্র কঠোর বৈরাগ্য সাধনের কারণ কি? কারণ কেবল পৃথিবীর বিষয়াসক্তি।

পৃথিবীতে যখন বিষয়াসক্তি ষোল আনা হয় তখন তাহা নির্ব্বাণ করিবার জন্য বৈরাগ্যও ষোল আনা চাই। যেমন রোগ তেমনি ঔষধ। বৈরাগ্য কি? হোমের অগ্নি। প্রাচীন যোগী ঋষি ও অগ্নিহোত্রীগণ যেমন অগ্নি জ্বালিয়া নিত্য হোম করিতেন এবং বায়ু শুদ্ধ করিতেন সেইরূপ বৈরাগীগণ আত্ম-নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়দমন, মনসংযম প্রভৃতি বৈরাগ্যের আগুন

জ্বালিয়া পাপাসক্তি ও বিষয় কামনা ভস্মীভূত করেন। প্রেরিত বৈরাগীগণ দেখিতে পান পৃথিবীতে অনেক শতাব্দী হইতে বিষয়াসক্তি উৎকট রোগের আকার ধারণ করিয়াছে, সামান্য বৈরাগ্যে এই রোগের উপশম হইবে না, এই জন্য তাঁহারা একেবারে পূর্ণ বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করেন। বিধাতা পুরুষ যখনই দেখিতে পান যে তাঁহার প্রজা সকল উৎকট বিষয় রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে তাহাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক দল সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী প্রস্তুত করিতে থাকেন।

যেখানে বার লক্ষ লোক বিষয় বিষ পান করিয়া মরিতেছে সেখানে অন্ততঃ বার জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যেখানে পঞ্চাশ লক্ষ লোক বিষয়ী হইয়া মরিতেছে সেখানে অন্যূন পঞ্চাশ জন বৈরাগীর প্রয়োজন। যে পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক বিষয়-গরল পান করিয়া মরিতেছে সেখানে রোগ দমন করা দুই একজন সামান্য কবিরাজের কর্ম্ম নহে। যেখানে বিষয়-রোগ অতি সামান্য সেখানে যৎসামান্য অল্প পরিমাণ বৈরাগ্য সাধন দ্বারা সেই রোগ দূর হইতে পারে; কিন্তু যেখানে বিষয়াসক্তি অত্যন্ত বিস্তীর্ণ ও সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে সেখানে সামান্য ঔষধে প্রতীকার সম্ভব নহে। যেমন কঠোর রোগ সেইরূপ উপযুক্ত ঔষধ আবশ্যক। এই জন্য পৃথিবীর উৎকট বিষয় রোগ দূর করিবার নিমিত্ত প্রধান প্রধান বৈরাগীগণ কেবল সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা

নহে; কিন্তু তাঁহারা আপনাদিগের প্রাণ পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়াছেন। যখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে পৃথিবীর যেরূপ কঠোর সাংঘাতিক রোগ তাহাতে কয়েকজন লোক প্রাণ না দিলে মানুষ এই বিষম রোগ হইতে একেবারে রক্ষা পাইবে না তৎক্ষণাৎ তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট আত্ম-বলিদান করিলেন।

যখন বড় বড় বৈরাগীগণ বিষয়াসক্ত কঠোর মনুষ্য মণ্ডলীকে বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত সকল দেখাইতে লাগিলেন তখন পৃথিবী পরাস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "হে বৈরাগী ভ্রাতৃগণ, আমাদিগের জন্য তোমরা অনায়াসে এত কষ্ট সহিলে, তোমাদিগের দুর্লভ প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হইয়াছ। তোমাদের ব্যবহারে আমরা পরাস্ত হইলাম। ভাইগণ, আর আমরা নাস্তিক হইব না, আর অপবিত্র আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিব না, আর টাকার জন্য উন্মাদ হইব না, আর অসাধু দৃষ্টান্ত দেখাইয়া চারিদিকে ব্যভিচার অধর্ম্ম বৃদ্ধি করিব না, আর তোমাদিগের দয়ার্দ্র কোমল হৃদয়ে ব্যথা দিব না।"

ইহা অপেক্ষা কঠোরতর রোগের সময় নিদারুণ পৃথিবী কখন খড়্গ দ্বারা কখন অগ্নি দ্বারা, কখন ক্রুশ দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে জগতের হিতৈষী বৈরাগীদিগকে প্রাণে বধ করিয়াছে। দুর্দ্দান্ত পৃথিবী বলিয়াছে "হে বৈরাগীগণ, আমরা তোমাদের ঈশ্বরকে মানি না, আমরা নাস্তিক স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা খুসী তাহা করিয়াছি এবং ঘোর মোহ নিদ্রায়

অচেতন ছিলাম, এমন সময় কোথা হইতে তোমরা আসিয়া নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা এবং ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছ। আমরা আমোদ প্রমোদ ও মদ্য পান করিতে গিয়াছিলাম, তোমাদের দল আমাদিগকে সে সকল আমোদ প্রমোদ করিতে দিল না, তোমরা আমাদের ভয়ানক শত্রু, অতএব তোমাদিগকে এই সংহার করিতেছি।"

এই বলিয়া আগুন জ্বালিল, ক্রুশ তুলিল, বাণ ছুড়িল এবং সাধুদিগকে মারিল। এইরূপে দেশে দেশে, যুগে যুগে, নিষ্ঠুর ভীষণাকার জন্তু-প্রকৃতি, দানব সমান বিষয়ীদল নানা প্রকারে সাধু বৈরাগীদিগকে বধ করিয়াছে। বিষয়াসক্ত মূঢ় মানব অনেক সময় বৈরাগীদিগকে বিনাশ করিয়া পরিশেষে তীব্র অনুতাপ অস্ত্রে আপনার মস্তক আপনি ছেদন করিয়াছে। বৈরাগী না মরিলে পৃথিবীর উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। অতএব হে প্রেরিত বৈরাগীগণ, পৃথিবীর পরিত্রাণের জন্য তোমরা ঈশ্বরের চরণে আত্ম-বলিদান কর। হে নববিধানের বৈরাগীদল, হে নববিধানের সাধকদল, সামান্য বৈরাগ্যে হইবে না, এই সাগর সমান বিষয়াসক্তি সামান্য বৈরাগ্যে কিরূপে তোমরা দূর করিবে? তোমরা এখন বৈরাগী হও যাহাতে সমস্ত হিন্দুস্থানবাসীরা তোমাদিগের বৈরাগ্য দেখিয়া কাঁদিবে এবং বিষয়-রোগমুক্ত হইয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। হে বন্ধুগণ, যদি তোমরা একেবারে বিষয় সুখের লালসা ছাড়িলে মাতৃ-ভূমির পরিত্রাণ হয় তবে আর তোমরা বিলম্ব করিও না।

যদি তোমাদের একটী আঙ্গুল কাটিলে এক লক্ষ লোক বাঁচে তবে কোটি কোটি লোককে বাঁচাইবার জন্য তোমাদিগকে কত রক্ত দিতে হইবে একবার ভাবিয়া দেখ।

যে পরিমাণে বিষয়-রোগ উৎকট সেই পরিমাণে বৈরাগ্য ও ত্যাগস্বীকার চাই। ইহা অভ্রান্ত গণিত শাস্ত্রের কথা। ইহা ধর্ম্ম সাধনের চমৎকার অঙ্কশাস্ত্র। প্রভু পরমেশ্বর রোগের পরিমাণ বুঝিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বৈরাগ্য প্রেরণ করেন। পৃথিবীতে এখন বিষয়-রোগ ভয়ানক প্রবল হইয়াছে, এই সময় পূর্ণ ষোল আনা বৈরাগ্য ভিন্ন জীব উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। এই জন্য ভগবান তাঁহার সমুদয় বৈরাগী-দিগকে সম্মিলিত করিয়া নববিধানের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। ঈশ্বর প্রাচীন যোগী ঋষিগণ শাক্য, ঈশা এবং শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বড় বড় বৈরাগীদিগকে একত্র লইয়া এই নববিধানের জগতে অবতরণ করিলেন। যখন প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীরগণ, সর্ব্বো-ত্তম বৈরাগীগণ সংসারাসক্তির বিরুদ্ধে একত্র হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন তখন রণক্ষেত্রে ভয়ানক কামানের শব্দ হইল। ক্ষীণ হীন বিষয়ীদল এ সকল মহাযোদ্ধাদিগের সম্মুখে আর দাঁড়াইতে পারিল না।

হে নববিধানবাদীগণ, তোমাদিগের আর ভয় কি? দিগ্বি-জয়ী বড় বড় বৈরাগী মহাজনগণ তোমাদিগের সহায়, তাঁহা-দিগের বলে বলী হইয়া মেদিনী কাঁপাইয়া হুঙ্কার করিতে করিতে সংসার জয় কর, বিষয়াসক্তি রাক্ষসীকে একেবারে

চিরকালের জন্য সংহার কর। তোমরা নববিধানের লোক। তোমাদিগের বৈরাগ্য এত অধিক প্রবল হইবে যে তাহা দেখিয়া বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ এবং সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়াপন্ন হইবে। ভ্রাতৃগণ, এ দেশে ভয়ানক বিষয়-রোগে সহস্র সহস্র লোক মরিতেছে, এই সময় তোমরা পূর্ণ বৈরাগ্য সাধন করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিষয়কে পরাজয় কর। বিষয়রাজ্য একেবারে ছাড়িয়া তোমরা বিষয়াতীত ব্রহ্মরাজ্যের প্রজা হও। দেখ, তোমাদিগের সমক্ষে বিষয়-বাসনারূপ জ্বর আসিয়া কত শত লোকের প্রাণবধ করিতেছে। ভাই ভগিনীদিগের মৃত্যু কিম্বা উৎকট রোগ দেখিয়া কিরূপে তোমরা উদাসীন থাকিবে? বার বার যুগে যুগে বিষয়ী দল পরাস্ত হইয়াছে। কিন্তু আবার ঐ দেখ চারিদিকে বিষয়ীরা প্রবল হইয়াছে। আবার তোমরা স্বর্গের বৈরাগীদিগকে ডাকিয়া বিষয়ী দলের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ কর। প্রাচীন যোগী ঋষিগণ, শাক্য, ঈশা ও চৈতন্য প্রভৃতি প্রমত্ত বৈরাগীদিগকে ডাকিয়া বিষয়াসক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। নির্ব্বাণ, বৈরাগ্য, ক্ষমা, শান্তি, প্রভৃতি দুর্জ্জয় অস্ত্রাদি দ্বারা বিষয়ীদিগকে পরাস্ত করিয়া ঈশ্বরের দিকে টানিয়া আন।

এই শতাব্দীতে আবার বিষয়ীরা হুঙ্কার করিতেছে ইহা দেখিয়া নববিধান বলিলেন "আমি সংসার অসুরকে জয় করিবার জন্য পৃথিবীতে চলিলাম।" নববিধান আসিয়া সংসারাসক্তিকে কাঁপাইয়া বজ্রধ্বনিতে বলিলেন "রে দানব,

রে রাক্ষস বিষয়, তোর মস্তক আমি ছেদন করিব।" এই বলিয়া নববিধান একেবারে প্রথমেই উপদেশ দিলেন "স্বার্থ নাশ কর, বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ কর, অন্ন বস্ত্র চিন্তা করিও না। নিজের জন্ত ধন স্পর্শ করা কলঙ্ক মনে করিবে, মরিয়াও যদি যাও কল্যকার জন্য ভাবিবে না।" এই উপদেশ গোলাতে ঈশা সংসারকে মারিয়াছিলেন, নববিধানও এই গোলা ছুড়িতেছেন।

হে ব্রাহ্মগণ, তোমরা যদি অল্প অল্প বৈরাগ্য সাধন দ্বারা ধর্ম্ম এবং বিষয়ের সেবা কর তাহা হইলে তোমরা আপনারাও পরিত্রাণ পাইবে না এবং জগতেরও হিতসাধন করিতে পারিবে না। পূর্ণ বৈরাগ্য সাধন করিতে করিতে অন্ততঃ পাঁচ জন তোমরা মরিয়া যাও, তোমাদের মৃত্যুতে ভারত বাঁচিবে। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন যদি দেশ শুদ্ধ লোক বৈরাগী হয় তবে সংসার রক্ষা কে করিবে? হে ব্রহ্ম ভক্ত বৈরাগী, তোমার এ ভাবনা নহে। ভগবানের চিন্তা ভার তুমি মস্তকে লইও না। তুমি কেবল এই ভাবিবে কৈ পাঁচ জনও ত বৈরাগী হইল না। ভয়ানক বিষয়গরল পান করিয়া লোকগুলি মরিতেছে। তাহাদিগকে বাঁচাইবার জন্য তোমরা বৈরাগ্যানলে দগ্ধ হও, বুক কাট, রক্ত দাও।

যখন তোমরা পরের কল্যাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া মরিতে যাইবে তখন দেশের লোকে বলিবে, "এরা আমাদের জন্য

মরিতেছে, এস ভাই, আমরা কুপথ পরিত্যাগ করিয়া ইহা-দিগের ব্রহ্ম মন্দিরে যাই, ইহাদিগের ধর্ম্ম সাধন করি। আমরা যদি পাপ নাস্তিকতা ছাড়িলে এরা বাঁচে তবে আর কেন আমরা বিষয়ের বিষ খাইব? আমরা বিষয়ের নরকে মরিব, আর এরা বৈরাগ্যের অনলে মরিয়া গৌরবের মুকুট মস্তকে পরিয়া স্বর্গে যাইবে।" এই সকল কথা বলিয়া ঘোর বিষয়ীরাও বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে।

অতএব ভ্রাতৃগণ, তোমরা সমুদয় স্বর্গীয় বৈরাগীদিগের ভাব গ্রহণ কর, বৈরাগ্যের কোন লক্ষণ অবজ্ঞা করিও না। তাঁহারা এত বড় মহাত্মা ছিলেন, তাঁহারা যে অকারণে গৈরিক, দণ্ড, কমণ্ডলু, ঝুলি, একতারা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহা কখনই সম্ভব নহে। যে মাটীতে কোন বৈরাগী বৈরাগ্য সাধন করিয়াছেন সেই মাটীকে নমস্কার কর, যে নদীর জলে কোন পুণ্যাত্মা আপনার তনুকে ধৌত করিয়াছেন সেই নদীকে নমস্কার কর। ঐ সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলেই যে বৈরাগী হইবে তাহা নহে। ব্যাঘ্র চর্ম্মে বৈরাগ্য নাই, গৈরিক বর্ণ পুণ্যের রং নহে। তথাপি এ সকল লক্ষণকে অবজ্ঞা করা ভক্তের লক্ষণ নহে। মহাপুরুষ ব্যবহৃত সন্ন্যাস-চিহ্ন সকল তোমাদের শ্রদ্ধেয়। তোমরা ভক্তির সহিত ঐ সমু-দয়কে বরণ করিবে এবং উহার অসার ভাগ ছাড়িয়া দিয়া বৈরাগ্যের প্রত্যেক চিহ্নের ভিতর হইতে সার রত্ন আদায় করিয়া লইবে।

নববিধানের বেদী হইতে এ কথা বলিতে পারি না, এ কথা বলিতেছি না যে তোমরা শস্য অপেক্ষা খোসাকে অধিক আদর কর; কিন্তু এই কথা বলিতেছি, পৃথিবীর সমুদয় ক্ষুদ্র বড় বৈরাগীর পদধূলি অন্তরের অন্তরে গ্রহণ কর। হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি সেই সাধু বৈরাগীদিগের প্রদর্শিত পথে না চলিলে স্বর্গে যাইতে পারিবে না। বৈরাগীদিগকে নমস্কার কর। বৈরাগ্যকে ভক্তির সহিত গ্রহণ কর এবং সেই বৈরাগীদিগের রাজা, বৈরাগীদিগের গুরু, পরম বৈরাগী সর্ব্বত্যাগী ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া সংসারাসক্তি জয় করিয়া সংসারের মধ্যে যোগ বৈরাগ্য স্থাপন করিয়া সপরিবারে, সবান্ধবে বৈরাগীদল হইয়া জগৎকে উদ্ধার কর।

ভবিষ্যতের সন্তান।

রবিবার ৬ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক; ১৭ই এপ্রেল ১৮৮১।

হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি ভূতকালের, না বর্তমানের, না ভবিষ্যতের? তোমার সম্মুখে কালের চাতুরী, কালের বিচিত্র লীলা। এই রাত্রি, এই দিন, এই পুরাতন বৎসর, এই নব বৎসর, এই এক শতাব্দী অতীত হইল, এই আর এক শতাব্দী আরম্ভ হইল। বৎসর আসিতে যেমন তাড়াতাড়ি, যাইবার সময়ও তেমনি তাড়াতাড়ি। কাল দৌড়িয়া আসে, দৌড়িয়া যায়। আমরা কোন্ কালের লোক? আমরা কি

বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিব? যে কাল অতীত হইল আমরা তাহার নহি, যে কাল বর্ত্তমান আমরা তাহারও নহি, যে কাল আসিবে আমরা তাহার। কাল দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে, তবে আমরা কাহার উপরে আমাদিগের ভার সমর্পণ করিব? দ্রুতগামী তরল কালের উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। অস্থির বাতাসের উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভব? এত যেখানে পরিবর্ত্তন, সময়ের যেখানে কিছুমাত্র স্থিরতা নাই আমরা সেখানে কিরূপে দাঁড়াইব? যাহা ছিল তাহা গেল, যে বৎসর আসিল ইহা নূতন বৎসর। যে পুরাতন বৎসর চলিয়া গেল তাহার উপর তো বিশ্বাস হইতেই পারে না। আর যে নববর্ষ আসিল ইহার উপরেই বা বিশ্বাস কি? বড় ভাই পুরাতন বৎসরকে বিশ্বাস করিতে পারি না, কনিষ্ঠ ভাই নূতন বৎসরকেও বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রাচীনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। সদ্যজাত শিশুর উপরেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

জ্ঞানী ব্রাহ্ম, বাস্তবিক তুমি ভূতের পুত্র নহ, তুমি বর্ত্তমানেরও সন্তান নহ, তুমি ভবিষ্যতের সন্তান। ভূতকাল তোমার জন্মস্থান নহে, ভূতকাল তোমার বাসস্থান নহে, বর্ত্তমান কালও তোমার জন্মস্থান কিম্বা বাসস্থান নহে। তোমার বাড়ী ভবিষ্যতে। তোমার নববিধান তোমার স্বর্গরাজ্য, তোমার দেবালয়, তোমার সুখী পরিবার, এ সমুদয় ভবিষ্যতে। হে ভবিষ্যতের সন্তান, তোমার সময় এখনও জন্মগ্রহণ করে

নাই। তোমার স্বদেশ কলিকাতা কিম্বা পৃথিবীর কোন স্থান নহে। তোমার জীবন এই শতাব্দীর জীবন নহে। বহু শতাব্দী পরে তোমার শতাব্দী আসিবে। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা কয়জন ভবিষ্যতের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছ।

তোমাদিগের মত ভবিষ্যতদর্শী বিচক্ষণ সুবিজ্ঞ ব্যক্তি কালের স্রোতের উপর, ঋতু পরিবর্ত্তনের উপর আশা ভরসা রাখিবে না। তোমরা যে দেশবাসী সেখানে কালের খেলা নাই, ঋতু পরিবর্ত্তন নাই, বৎসর শতাব্দীর আরম্ভ শেষ নাই। সেখানে স্রোতস্বতী নদী নাই, সেখানে কেহ জীবন মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয় না। সেই দেশ হইতে কয়েকটী যাত্রী ক্রমাগত হাটিতে হাটিতে কলিকাতা আসিল। তাহাদিগের মুখ ভবিষ্যতের দিকে, স্বর্গের দিকে; তাহারা পশ্চাতে হাটিতেছে। পৃথিবীর লোক তাহাদিগের নাম ধাম জানে না। পৃথিবীর লোক তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে না। তাহাদিগের ভাষা সংস্কৃত নয়, হিব্রু নয়, গ্রীক নয়, ইংরাজী কি বাঙ্গলাও নহে। তাহাদিগের ভাষা ভবিষ্যতের ভাষা যাহা পৃথিবী এখনও শিখে নাই।

হে ভবিষ্যতের সন্তান ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের ভাষার বর্ণমালার ক খও এখন পর্য্যন্ত কেহ শেখে নাই। জগৎ-বাসী সকলে বলিতেছে; "হে বিধান ভাই, তুমি বাঙ্গলা বলিলে না, ইংরাজী বলিলে না, কিরূপে আমরা তোমার ভাষা বুঝিব, আমরা বর্ত্তমানের লোক, তুমি কি ভবিষ্যতের অমৃতসম

স্বর্গ রাজ্যের কথা বলিতেছ আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি কত কথা বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলে, কিন্তু কিছুতেই আমাদিগের বোধগম্য হইল না।” বাস্তবিক নববিধানবাদীদিগের দুর্ব্বোধ কথা শুনিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিতেছে, “ইহারা কি প্রকার মনুষ্য!”

হে ভাবী ব্রহ্মরাজ্যের অধিবাসীগণ, তোমরা বিধির খেলা খেলিবার জন্য এই ভবধামে অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে আসিয়া পড়িয়াছ। তোমাদিগের জন্ম এক অদ্ভুত রহস্য। কল্যকার জীব অদ্য জন্মে। দশ সহস্র বৎসর পরে যাহারা জন্মিবে তাহারা এখন জন্মিয়াছে। তোমরা যে ক্ষেত্রে কার্য্য করিবে, সেই ক্ষেত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বোধ হয় যেন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পথ ভুলিয়া তোমরা এ দেশে আসিয়াছ। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা ঈশা, মুসা, শাক্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের নিকটে বসিতে, তোমরা এখানে আসিলে কেন? তোমরা দেশ কালের ব্যবধান বিনাশ করিলে। তোমরা যে দেশের লোক সেই দেশ আর এই দেশের মধ্যে অনেক ব্যবধান, তোমরা যে দেশে থাক সে দেশের সকলই অদ্ভুত। সেখানে কত যোগী-ভক্ত, কত প্রেমিক-বৈরাগী, কত ঋষি-কর্ম্মী, কত প্রেমোন্মত্ত জ্ঞানী বাস করিতেছেন, আর এখানে যে বৈরাগী সে প্রেমিক নহে। যে যোগী সে ভক্ত নহে। যে কর্ম্মী সে জ্ঞানী নহে। এখানে যে গৃহস্থ সে কেবল তাহার আপনার স্ত্রী পুত্রাদি লইয়াই ব্যস্ত, তাহার জীবনে বৈরাগ্যের

কোন লক্ষণ দেখা যায় না, এই হতশ্রীদেশে গৃহস্থবৈরাগী নাই। এখানে যে যোগী সে কেবল যোগ ধ্যানেতেই মগ্ন, তাহার জীবনে ভক্তির চিহ্ন দেখা যায় না, অথবা যে ভক্ত সে কেবল ভক্তির ব্যাপার ও নাম কীর্ত্তন লইয়াই ব্যস্ত, তাহাকে কখন যোগ সমাধিতে নিমগ্ন দেখা যায় না; এখানে ভক্ত যোগী নাই।

এখানে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঐক্য নাই। এখানে যদি তোমরা কাহাকেও ও ভাই হিন্দু-বৌদ্ধ, ও ভাই বৌদ্ধ-খৃষ্টান, ও ভাই খৃষ্টান-মুসলমান, ও ভাই চীন-ইংরেজ, ও ভাই গৃহস্থ-বৈরাগী, ও ভাই যোগী-ভক্ত কিম্বা ও ভাই কর্ম্মী-জ্ঞানী বলিয়া ডাক কেহই উত্তর দিবে না। এখানে প্রতি জনেই সাম্প্রদায়িক, এখানে প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন ক্ষুদ্র ভাবেই সন্তুষ্ট। তুমি যদি বল ওহে মিষ্ট-লবণ সমুদ্র, একটু মিষ্ট জল দেও, সে বলিবে আমি লবণ সমুদ্র, আমি লবণ ভিন্ন আর কিছু দিতে পারি না, যদি মিষ্ট জল চাও তবে মিষ্টরস সরোবরের নিকট যাও। এখানে এক আধারে সকল রস পাওয়া যায় না। এখানে একে অন্যের সংবাদ লয় না। এখানে যোগী ভক্তের সংবাদ লয় না, কর্ম্মী জ্ঞানীর সংবাদ লয় না, গৃহস্থ বৈরাগীর সংবাদ লয় না, বৈরাগী গৃহস্থের সংবাদ লয় না। এখানে যদি তুমি কাহাকে ওহে বৈরাগী গৃহস্থ বলিয়া সম্বোধন কর তোমাকে সকলে উপহাস করিবে এবং তুমি কি বলিতেছ তোমার কথা

কেহই বুঝিতে পারিবে না। যখন তুমি বল কর্ম্মী যোগী, জ্ঞানী ভক্ত, বালক বৃদ্ধ, হিন্দু য়িহুদী অথবা ঈশাবাদী বৌদ্ধ তোমার এ সকল কথা পৃথিবী কিছুই বুঝিতে পারে না।

পৃথিবী বলে নববিধানের লোকেরা কি অসম্ভব অসঙ্গত কথা বলে কিছুই বুঝিতে পারি না। তাহারা বলে মনবনে বসিয়া গৃহধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে; প্রমত্ত বৈরাগী হইয়া সংসারে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম পরিবার গঠন করিতে হইবে; যোগ ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া ভক্তিভাবে নৃত্য করিতে হইবে। সংসারের ভূমিকে হিমালয়ের উচ্চ শিখর মনে করিতে হইবে। এইরূপ কত অদ্ভুত কথা বলিয়া ইহারা বক্তৃতা করে ও সম্বাদ পত্রাদি লেখে কিছুই বুঝিতে পারি না। ইহাদের পরিধেয় বস্ত্র খানিক গৈরিক, খানিক শাদা ধুতি। ইহাদের এক চক্ষু ভূতকালে, আর এক চক্ষু ভবিষ্যতের দিকে। ইহারা কি খায়? খাইবার সময় পরলোকগত সাধু বৈরাগীদিগকে থালার উপরে খাদ্যের সঙ্গে মিশ্রিত করে। অন্নের মধ্যে ইহারা সাধুদিগের মাংস এবং জলপাত্রে ইহারা সাধুদিগের রক্ত রাখে।

ইহাদের চক্ষু হইতে সর্ব্বদাই প্রেম ধারা পড়ে। ইহারা কোন দেশী লোক? ইহারা প্রেরিত মহাত্মা ঈশা, মুসা, সক্রেটিস, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করে। ইহারা কে? কাহার দল? ইহাদিগের বন্ধু কে? ইহাদিগের সহায় কে? ইহারা অন্ধকারে চাঁদ গেলে চৌদ্দভুবন

ধ্বংশ হইলেও ইহারা আশমানেতে বানায় ঘর। আমরা চক্ষু খুলিয়া যেখানে কিছুই দেখিতে পাই না, ইহারা সেখানে যত সাধুদিগের চাঁদের হাট বসিয়াছে দেখিতে পায়। ভূত-কালে ইহাদের ন্যায় লোক দেখিতে পাই না। বর্ত্তমানকালেও ইহাদিগের মত লোক দেখিতে পাই না। ইহারা আকা-শের পানে তাকায় আর হাসে। ইহারা এমন ভাবে আপনা-দিগের স্কন্ধের উপর হাত রাখে, অথবা বুকের উপর হাত বুলায় যেন কোন সাধুর চরণ ইহাদিগের স্কন্ধে ও বক্ষে স্থাপিত। ইহারা আকাশের প্রতি এরূপ ভাবে তাকায় যেন আকাশে ইহাদিগের স্বদেশী কোন আত্মীয় বন্ধু আছে। ইহাদিগের কাণও অদ্ভুত, যখন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিস্তব্ধ, যখন আমরা একটী শব্দও শুনিতে পাই না, ইহারা হাসিয়া বলে, আহা, স্বর্গের ভ্রাতৃমণ্ডলী কি সুমধুর সঙ্গীত শুনাইতেছেন। ইহারা কাণ পাতিয়া কি শুনিতেছে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শুনিতে শুনিতে ইহারা ভাবে মত্ত হইয়া দৌড়িতেছে। এরা এক অদ্ভুত শ্রেণীর লোক। ভূতকালের লোক বলে, এরা আমাদের লোক নহে; বর্ত্তমান শতাব্দীর লোক বলে, এরা আমাদের লোক নহে। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বকালের আর্য্য যোগী ঋষিদিগের সঙ্গে মিলাইয়া দেখি, ইহাদিগের সঙ্গে তেমন মিল দেখিতে পাই না। বাইবেল, কোরাণ, ললিলবিস্তার প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া দেখি, ইহারা কোন্ সম্প্রদায় ভুক্ত, দেখি ইহারা কোন সম্প্রদায় ভুক্ত

নহে। ইহারা পুরাতনও নহে নূতনও নহে, ইহারা কোন বিশেষ জাতিভুক্ত নহে। এরা এ দেশের নয়, এ কালের নয়। ইহাদের বাড়ী বিদেশে, ইহারা অন্ততঃ পাঁচ সহস্র বৎসরের পরের লোক। ইহারা কয়জন অগ্রগামী হইয়া এদেশে আসিয়াছে, এরা উজন স্রোতে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। এরা কি প্রকার বিপরীত গতিতে এখানে আসিয়াছে। নববিধানের লোক সম্পর্কে পৃথিবী বিস্ময়াপন্ন হইয়া এরূপ কত কথা বলিতেছে।

হে ভবিষ্যতের পুত্রগণ, তোমাদিগকে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম বলি, কেন না তোমরা যথার্থ নূতন রাজ্য হইতে আসিয়াছ। তোমরা প্রাচীন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের চারি দলের মধ্যে কোন দলভুক্ত নহ। তোমাদের ভাষার বর্ণমালাও এখানে কেহ জানে না। তোমাদের স্বর্গীয় ভাষা, দেবভাষা, সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দিবার লোক এখানে কেহ নাই। তোমাদের নূতন ভাব এখানে কেহ বুঝিতে পারে না। ইংরাজী, বাঙ্গালা, গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু প্রভৃতি ভাষা ভিন্ন যে ভাষা আছে তাহা কেহ জানে না। পৃথিবীর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালের শাস্ত্র বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দেন, ভবিষ্যতের শাস্ত্র বিজ্ঞান ইনি জানেন না।

হে নববিধান, যখন তুমি আকাশের চন্দ্র, আকাশের পাখী এবং বাগানের গোলাপ ফুলের সঙ্গে কথোপকথন কর তখন পৃথিবী কিরূপে তোমার ভাষা বুঝিবে এবং তোমাকে পাগল না

বলিয়া আর কি বলিবে? পৃথিবীর লোক হাসিয়া বলে, ঐ যে বিধানবাদী ভক্ত, সে ভাতের সঙ্গে কথা কয় এবং বলে কি না ঈশা তাহার ভাতের ভিতরে আছেন। বাস্তবিক পাগল বিধানবাদীকে কে বুঝিবে? হে প্রাণাধিক হৃদয়ের ভাই নববিধান, তুমি কেন আপনাকে বৃথা বুঝাইতে চেষ্টা কর, তোমাকে কেহই এখন বুঝিবে না। তুমি হাতে হাতে ঈশ্বরকে, যদি দেখাইয়া দেও তথাপি কেহ দেখিবে না। যাহার মনের ভিতরে প্রাণেশ্বরের অভ্যুদয় হয় নাই সে কিরূপে তোমার কথা বুঝিবে? যখন তুমি বল যে ডাকযোগে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে, পরলোক হইতে পত্র পাইয়াছি, তখন পৃথিবীর লোকে বলে এ ব্যক্তি পাগল! ডাক ঘরে বৈকুণ্ঠের চিঠি!

হে নববিধান, বহু শতাব্দী পরে পৃথিবীতে তোমার বাড়ী একটু একটু দেখা দিবে। তোমার ঘর বাড়ী দেবলোকে। তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই বৈরাগী। এ দেশস্থ নর নারীগণ তোমার ভাই ভগিনী নহে। যখন তোমার কথা তাহারা বুঝে না তখন কিরূপে বলিবে যে তাহারা তোমার জ্ঞাতি কুটুম্ব। কিন্তু হে নববিধানের লোক সকল, তোমরা স্বর্গস্থ মহাজনের মাল লইয়া আসিয়াছ, তোমাদিগকে এখানে তাহা বিক্রীর চেষ্টা করিতে হইবে ক্রমে তোমাদের দেশের লোক যাতায়াত করিলে পথ পরিষ্কার হইবে। তোমাদের কাজ তোমরা করিয়া যাও। তোমরা পৃথিবীর নীচ ব্যবহার শিখিও না। এখানকার লোকে যাহাকে ধর্ম্ম বলে, নীতি

বলে তাহার সঙ্গে তোমাদের নববিধানকে মিশ্রিত করিও না। তোমাদের আহার, বস্ত্র, ব্যবহার, সমস্ত নববিধানের নূতন ভাব ধারণ করুক। নূতন বৎসর তোমাদের পক্ষে নূতন বৎসর হউক। খুব বৈরাগীর খেলা খেল। এস সকলে মিলিয়া বৈরাগ্যের খেলা খেলি।

সেই ত পৃথিবীতে বহু শতাব্দী পরে হাজার হাজার লোক নববিধানবাদী হইবে। এই সময় হইতে সূত্রপাত করি। আগে আমাদিগকে স্বর্গরাজ এই বলিয়া পাঠাইলেন, "যাও তোমরা দ্রুতবেগে গিয়া এসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও সাগরের দ্বীপ সমূহকে এই পাঁচখানি পত্র দাও এবং আমার শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া সকলকে জাগ্রত হইতে বল। তোমরা পৃথিবীকে বল যে আমরা ভবিষ্যতের নব প্রদেশ হইতে আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞাতি বৈরাগী ভক্তগণ সকলে সেখানে। এ সকল কথা বল, তাহারা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নববিধানের অদ্ভুত তত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিবে।" ভ্রাতৃগণ, তোমরা এখানকার লোকদের মধ্যে দল বাড়াইতে চেষ্টা কর। এই পৃথিবীর ভূমি তোমাদের নয়, এখানকার ভূমি, এখানকার বৎসর তোমাদের নহে। অতএব এখানকার কিছুতেই আসক্ত হইও না, এখানকার মায়াতে মুগ্ধ হইও না। আপনার দেশের লোককে এখানে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের সঙ্গে আমোদ কর। লোকে তোমাদিগকে আদর করিল না বলিয়া নিরাশ হইও না, পৃথিবী পরে অনুতাপ করিয়া তোমাদিগের

বিধান গ্রহণ করিবে এবং এই নববিধান সমুদয় পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে।

দেহতত্ত্ব।

রবিবার ১৩ই বৈশাখ, ১৮০৩ শক; ২৪শে এপ্রেল ১৮৮১।

হে যোগী, তুমি যদি যোগ সাধন করিয়া থাক, তুমি যদি যোগ বুঝিয়া থাক, তবে তুমি কখনও শরীরের প্রতি অবহেলা করিতে পার না। যোগী যোগ বলে পৃথিবী ছাড়িয়া, শরীর ছাড়িয়া, ইন্দ্রিয়াতীত আত্মারাজ্যে প্রবেশ করেন সত্য; কিন্তু তথাপি শরীর তাঁহার পক্ষে অনাদরের বস্তু নহে। কেন না. তিনি শরীরের মধ্যে তাঁহার ইষ্টদেবতা ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করেন। যোগী শরীরের মধ্যে থাকিয়াও সমুদয় অসার পার্থিব ব্যাপার অতিক্রম করিয়া অশরীরী পরমাত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। যোগী শরীরকে অবহেলা করেন না। হিন্দুস্থানে প্রাচীন যোগীগণ দেহতত্ত্বজ্ঞ হইয়া রীতিপূর্ব্বক দেহ সাধন করিতেন। হে নববিধানের ব্রহ্ম যোগী, ব্রহ্ম সাধক, তুমি যদি তোমার আপনার শরীরের ভিতরে তোমার জীবিতেশ্বরকে না দেখিতে পাও তবে তুমি প্রকৃত যোগী নহ। তোমার প্রাণের হরি তোমার বক্ষঃস্থলে যোগাসনে বসিয়া আছেন। প্রাণের প্রাণ, বিশ্বপ্রাণ আমাদের জীবনের মূলদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

হে ভক্ত, তোমার বক্ষের নিম্নে জীবন রক্ষার দুইটী প্রধান যন্ত্র স্থিতি করিতেছে; দক্ষিণ দিকে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র, আর বামে একটী রক্ত সঞ্চালনের যন্ত্র। এই দুইটী যন্ত্রের, কিম্বা দুইটীর মধ্যে একটীর কার্য্যও যদি বন্ধ হয় তবে ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত শারীরিক কার্য্য বন্ধ হইবে। হে যোগী, তুমি তোমার যে প্রাণ সিংহাসনে হরিকে বসাইবে সেই সিংহাসনের নিম্নে তোমার বুকের মধ্যস্থ এই দুটী যন্ত্র দুইটী স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই দুটী যন্ত্র তোমার প্রাণরক্ষার প্রধান উপায়। তুমি যখন হাঁচ, তুমি যখন হাই তোল, তুমি জান না তুমি কি কর। সেইরূপ যখন তুমি উপাসনা কর, যখন তুমি ব্রহ্ম সাধন কর তুমি জান না যে তোমার শরীরের কোন্ কোন্ যন্ত্র বিশেষরূপে তোমার সাহায্য করিতেছে। এ সকল যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন তুমি একটী নিঃশ্বাস ফেলিতে পার না, একটী কথা বলিতে পার না। ঈশ্বরের শক্তিতে তোমার শরীরে তালে তালে নিঃশ্বাস পড়িতেছে এবং রক্ত নাচিতেছে। প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শরীর হরি হরি বলিতেছে, তোমার নিঃশ্বাস বায়ু বন্ধ হইলে তোমার আর হরিনাম উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

যেমন তালে তালে নিঃশ্বাস পড়িতেছে ও রক্ত চলিতেছে সেইরূপ তালে তালে যোগীর যোগ সাধন চলিতেছে। যে আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারে না তাহাকে কিরূপে বিশ্বাসী যোগী অথবা জ্ঞানী বিজ্ঞানী

বলিব? জীবন্ত ঈশ্বর স্বয়ং যন্ত্রী হইয়া, ফুস্‌ফুস্‌ এবং রক্তাধার এই দুইটী যন্ত্র চালাইতেছেন। যেমন মনের জীবন সেইরূপ শরীরের জীবন সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নির্ভর করে। অনন্ত জীবন স্বরূপ ঈশ্বর শরীর মন উভয়ের মূল শক্তি, ইহা কোন জ্ঞানী যোগী অস্বীকার করিতে পারেন না। যখন প্রাচীন আর্য্য ঋষির ন্যায় গভীর যোগ ধ্যানে মগ্ন হইয়া, বল "হে ঈশ্বর, তুমি আছ" ইহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাধনের উপযোগী নিঃশ্বাস এবং রক্তও একবাক্য হইয়া বলে "হে ঈশ্বর, তুমি আছ।" এই যে শরীর মনের সঙ্গে ঐক্য ইহাই এখনকার দেহতত্ত্ব। এই দেহতত্ত্ব নববিধানের যোগের সহায়।

নিজের শরীরের মধ্যে এই দুইটী আশ্চর্য্য কলকে সহায় করিয়া তোমরা নববিধানের বিজ্ঞানযোগ সাধন কর। এই দুইটীর উপরে ঈশ্বরের চরণ স্থাপিত। এই দুয়ের ভিতর দিয়া তোমরা ঈশ্বরকে উপলব্ধি কর। এই দুইটী যোগমন্দিরে যাইবার পথ। কি রক্ত নদীর উপর দিয়া, কি নিঃশ্বাস বায়ুর উপর দিয়া যে দিক দিয়া যাও সেই যোগেশ সেই প্রাণেশকে দেখিতে পাইবে। এক দিকে শোণিত সরোবরে ঈশ্বরের চরণ কমলে গিয়া পৌঁছিবে, আর এক দিকে নিঃশ্বাস বায়ুতে উড়িতে উড়িতে ঈশ্বরের পবিত্র যোগনিকেতনে গিয়া উপস্থিত হইবে। এক দিকে রক্তনদী আর এক দিকে নিঃশ্বাস-পবন। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং

রক্ত সঞ্চালন ভিন্ন যেমন শরীরের জীবন থাকে না সেইরূপ প্রেমভক্তির রক্ত এবং পবিত্রতার বায়ু ভিন্ন আত্মার ধর্ম্ম-জীবন থাকে না।

প্রাণের প্রাণ ঈশ্বর স্বয়ংই আত্মার মধ্যে পুণ্যের নিঃশ্বাস এবং প্রেমের রক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। যেমন নিশ্বাস-বায়ু দ্বারা শরীরের রক্ত পরিষ্কৃত হয়, সেইরপ ঈশ্বরের পুণ্য-নিঃশ্বাসে সাধকের হৃদয়ের প্রেম রক্ত বিশুদ্ধ হয়। অতএব হে ব্রহ্ম সাধক, তুমি আপনার শরীর এবং মনের মধ্যে ঈশ্বরকে অন্বেষণ কর। তুমি বাহিরে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিয়া প্রবঞ্চিত হইও না। "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর" বলিয়া তুমি বাহিরের দিকে তাকাইও না; কিন্তু ঈশ্বরকে তোমার প্রাণের মূলে, তোমার অন্তরতম স্থানে দর্শন কর। হে যোগ শিক্ষার্থী, যখন তুমি উপাসনা আরম্ভ কর, তখন তোমার নিজের বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া জিজ্ঞাসা করিও "হে নিঃশ্বাস যন্ত্র, হে রক্ত যন্ত্র, তোমরা তোমাদের ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেও, তোমাদের মধ্যে একটী ঈশ্বরের প্রেমের নদী আর একটী তাঁহার পুণ্যের উৎস। তোমরা জীবের জীবনরক্ষার যন্ত্র, অতএব তোমরা তোমাদের প্রাণেশ্বরী জননীকে দেখাইয়া দেও। তোমরা অন্তরতম প্রাণস্থ ঈশ্বরকে প্রকাশ করিয়া সুখের উপাসনার পথ দেখাইয়া দেও।

যাহারা আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরকে দর্শন করে তাহারাই প্রকৃত মধুর ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র এবং রক্তাধার যন্ত্র সহায় হইয়া যখন সাধকের নিকট স্বীয় দেহস্থিত ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয় তখন সাধক শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই দুটী যন্ত্রের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমের লেখা পাঠ করেন। দুঃখী তাহারা তোমাদের মধ্যে যাহারা এখন পর্য্যন্ত এই দুইটী যন্ত্র পড়িল না। তোমরা আপনার বুকের উপর হাত দিয়া দেহের মধ্যে যে ব্রহ্মমন্দির আছে তাহা দেখিলে না। বক্ষে হস্ত রাখিয়া বল দেখি, "হরি হে এ দেহে আছ সদা বর্ত্তমান, নিঃশ্বাসে শোণিতাধারে করে তোমার নাম গান।" কেবল মুখে ঈশ্বর ঈশ্বর বলিলে হইবে না ; কিন্তু বিজ্ঞানবিৎ বিশ্বাসী যোগী হইয়া আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে ঈশ্বরের জ্বলন্ত সত্তা উপলব্ধি করিয়া "সত্যং" অথবা "হে ঈশ্বর তুমি আছ" এই কথা উচ্চারণ করিতে হইবে।

হে সাধক, তোমার নিজের রক্তনদীর মধ্যে প্রেমের জল, দয়ার জল রহিয়াছে, যতদিন না তুমি সেই জলে স্নান করিয়া ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ করিবে ততদিন তোমার উপাসনা উচ্চ শ্রেণীর মিষ্ট উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিব না। তোমার উপাসনা এখনও অতি নীচ প্রকার। উচ্চ উপাসনার তুমি অধিকারী হও নাই। যখন তোমার উপাসনার প্রত্যেক কথা একবার রক্তে ডুবিবে, আবার নিঃশ্বাসে উড়িবে, অর্থাৎ কি নিঃশ্বাসপথে কি রক্তনদীর পথে, উভয় পথেই তুমি জীবন্ত ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবে, তখন জানিব তুমি উচ্চ

শ্রেণীর উপাসক। এই দুই পথ আজ পর্য্যন্ত অনেকেই আবিষ্কার করে নাই। যিনি এই দুই পথ আবিষ্কার করিয়াছেন তিনি অতি সহজে স্বর্গে গমন করেন। তিনি আপনার নিঃশ্বাস ও রক্তের ভিতরে ঈশ্বরকে দেখিতে পান।

বাস্তবিক রক্তনদীর একটী একটী ঢেউ ব্রহ্মপাদস্পর্শ করিয়া চলিতেছে। ভক্ত বলেন "রক্ত, তুমি ব্রহ্মপদ ধৌত করিতে করিতে চল; নিঃশ্বাস, তুমি ব্রহ্মকে পক্ষে লইয়া উড়।" ভক্ত আপনার ফুসফুস যন্ত্রের ভিতরে, আপনার রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়ার মধ্যে হরির শব্দ শ্রবণ করেন। তিনি আপনার রক্তের বেগের মধ্যে ঈশ্বরের দয়ার বেগ দেখিতে পান। ঈশ্বরের দয়া নিঃশ্বাস ও রক্তরূপ ধারণ করিয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছে। ঈশ্বরের শক্তি আমাদিগের শরীরে রক্ত সঞ্চালন করিতেছে এবং নিঃশ্বাশ প্রশ্বাস বায়ু প্রবাহিত করিতেছে। তিনি যদি শক্তি কাড়িয়া লন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। হরিশক্তি বিনা একটী নিঃশ্বাস পড়ে না, এক ফোটা রক্ত চলে না। হে জীব মীন, তুমি হরিকে অতিক্রম করিয়া কোথায় যাইবে? তুমি হরি-বারি ভিন্ন থাকিতে পার না। তোমার নিঃশ্বাসে হরি, তোমার রক্তে হরি, তোমার অন্তরে হরি, তোমার বাহিরে হরি। অতএব তুমি কদাচ হরিকে ছাড়িয়া থাকিতে চেষ্টা করিও না। হরি আপনার সত্তাজালে তোমাকে ধরিয়া

ফেলিয়াছেন। তোমার সাধ্য নাই যে তুমি হরি হইতে বিচ্ছিন্ন হও।

মূঢ় জীবাত্মা বলিয়াছিল "আমি কোথাও মাকে দেখিতে পাই না।" এই জন্য বিশ্বাস ও বিজ্ঞান একত্র হইয়া তাহার নিজের শরীরের নিঃশ্বাস ও রক্তের মধ্যে তাহার মাকে দেখাইয়া দিয়া তাহাকে শান্তি দিল। ভক্ত ভক্তিনয়ন খুলিয়া আপনার নির্ম্মল রক্ত সরোবরের মধ্যে হরিচরণ কমল ভাসিতেছে দেখিতে পান। তিনি আপনার বুকের রক্তের মধ্যে মার পাদপদ্ম দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করেন। তিনি দেখিতে পান তাঁহার মা লক্ষ্মী এক দিকে যেমন নিঃশ্বাস বায়ুতে উড়িতেছেন, তেমনি আবার আর এক দিকে তাঁহার রক্তনদীতে খেলা করিতেছেন। বিশ্বজননী জগদ্ধাত্রী ভক্তের শরীরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া তাহা দ্বারা আপনার পবিত্র অভিপ্রায় সকল সম্পন্ন করিতেছেন।

এই যে মনুষ্য শরীর ইহা ভগবানের একটী অদ্ভুত কল। ইহার ভিতরে হরি আপনি যন্ত্রী হইয়া কত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন। হে সাধক, যখন তুমি আপনার শরীর স্পর্শ কর তখন তোমার জানা উচিত যে তুমি ব্রহ্ম-নিকেতন স্পর্শ করিতেছ। এই দেহতত্ত্ব জানিলে ভক্তের ভক্তি বৃদ্ধি এবং যোগীর যোগ বৃদ্ধি হয়। আপনার দেহের মধ্যে হরিকে দেখিয়া ভক্ত ভক্তির অশ্রু বর্ষণ করেন। যেমন শরীরের ভিতরে নিঃশ্বাস ও রক্তের দুইটী চমৎকার ভৌতিক কল

রহিয়াছে, আত্মার মধ্যেও ঠিক ইহার অনুরূপ দুইটী অধ্যাত্ম কল রহিয়াছে। যত দেখিবে নিঃশ্বাস, তত বাড়িবে বিশ্বাস, যত দেখিবে রক্ত, তত হইবে ভক্ত।

মা লক্ষ্মী পবিত্রতার বায়ু হইয়া এক দিকে খুব উচ্চ পর্ব্বতের উপরে উড়িতেছেন, আবার আর এক দিকে রক্তের মধ্যে শক্তিরূপে বাস করিতেছেন। জগজ্জননীর শক্তিতে আমরা অবস্থিতি করিতেছি, বিচরণ করিতেছি, জীবন ধারণ করিতেছি। জননীর বক্ষে আমরা জীবিত রহিয়াছি। মার নিঃশ্বাসে আমরা জীবিত, মার রক্তেতে আমরা জীবিত। মার শক্তি ছাড়া আমার কিছুই নাই। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই মার শক্তি দেখিতে পাই। অতএব আপনার বুকের ভিতরে সর্ব্বত্র মাকে অন্বেষণ কর। আপনার রক্ত নিঃশ্বাসের মধ্যে স্বর্গের জননীকে দর্শন কর। নিঃশ্বাস এবং রক্তস্বরূপ দুইটী অর্গান বাজাও, যতই বাজাইবে ততই ইহারা মধুরস্বরে হরিগুণ কীর্ত্তন করিবে। যেমন প্রস্রবণ হইতে ক্রমাগত জল ঝরে সেইরূপ সর্ব্বশক্তিময়ী জননীর স্নেহ প্রস্রবণ হইতে জীবের দেহ মনের মধ্যে ক্রমাগত শক্তি, সামর্থ্য নিঃসৃত হইতেছে। সেই জননীর স্নেহই নিঃশ্বাস-রূপে, রক্তরূপে, জ্ঞান প্রেম পুণ্য ও শান্তিরূপে আমাদিগের দেহ মনকে পরিপূর্ণ করিতেছে।

যেমন শরীরের মধ্যে নিঃশ্বাস বায়ু রক্তের মলা কাটিয়া রক্তকে পরিষ্কৃত করে সেইরূপ আত্মার মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র

নিঃশ্বাস জীবের বিকৃত হৃদয়কে সংশোধন করে। ঈশ্বরের পুণ্য সমীরণে জীবের প্রেমরক্ত পরিষ্কৃত হয়। ঈশ্বরের শক্তি হইতে ক্রমাগত পুণ্যের বাতাস আসিয়া সাধকের মনের সমস্ত জঞ্জাল দূর করে। আধ্যাত্মিক শরীরে ক্রমাগত যোগের বাতাস বহিতেছে, ভক্তি নদী চলিতেছে। হে নববিধানের ভক্ত, তুমি বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেখ, তোমার হৃদয়ের মধ্যে গৌরাঙ্গের ভক্তিনদী চলিতেছে, ঈশা শাক্যের পবিত্র নিঃশ্বাস পড়িতেছে। যেমন তোমার নিঃশ্বাস পড়িতেছে, এবং তোমার রক্তের ঢেউ উঠিতেছে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর তাঁহার সাধুভক্তদিগকে লইয়া তোমার দেহ মন্দিরে লীলা করিতেছেন এবং নৃত্য করিতেছেন। প্রতি নিঃশ্বাসে ও প্রত্যেক রক্তের তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে জীবন্ত ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করিয়া নিঃশ্বাস ও রক্ত হইতে কাম, ক্রোধ লোভ প্রভৃতি সমস্ত পাপাসুরকে তাড়াইয়া জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী হইলাম, ভাগবতী তনু লাভ করিলাম। হে জীব, এইরূপে দেহ মধ্যে ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপন করিলে তোমার অশেষ কল্যাণ হইবে।

পাপাসুর জয়।

রবিবার ২০শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক; ১লা মে ১৮৮১।

পাপ কি এ সম্বন্ধে মানুষের অনেক ভ্রম আছে। অধর্ম কি? অন্যায় কি? অশুদ্ধ কাহাকে বলে? ইহা অনেকে

বুঝিতে পারে না। যাহা বাহিরে করি তাহা পাপ নহে, যাহা মুখে বলি তাহা পাপ নহে। হস্ত অথবা রসনা পাপের আলয় নহে। পাপ বাহিরে নহে, পাপ অন্তরে। আবার যাহা ভাবিয়াছি, যাহা চিন্তা করিয়াছি, যাহা ইচ্ছা করিয়াছি, যাহা অভ্যাস হইয়াছে তাহাও পাপ নহে। যাহা এত দিন পাপ মনে করিয়াছি তাহা পাপ নহে। এ জীবনে যে কয়েকটী মিথ্যা বলিয়াছি, যে কয়েকটী নরহত্যা করিয়াছি তাহা পাপ নহে। মনের চিন্তাতে, কি আলোচনাতে, কি অভ্যাসেতে পাপ নাই। তবে পাপ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যে কোন ইচ্ছা পোষণ করিতে পারি ইহাই আমার প্রকৃত পাপ। এই যে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা ইহাই পাপের মূল। যে পাপ করিয়াছি তাহা ছোট, যাহা করিতে পারি তাহা বড়।

হে মহাপাপী, তুমি নরহত্যা প্রভৃতি যে সকল গুরুতর পাপ করিয়াছ, ভবিষ্যতে তোমার পাপ করিবার ক্ষমতার নিকটে সে সকল শর্ষপ কণার ন্যায় ক্ষুদ্র। অনুতপ্ত পাপী, তুমি অঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছ—"এই দেখ আমার জীবনের অমুক অমুক স্থানে এই এই ভয়ানক জঘন্য পাপের ক্ষত সকল রহিয়াছে।" সত্য বটে তোমার গত পাপ সকল ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার মনের মধ্যে যে পাপের মূল রহিয়াছে তাহা হইতে আরও কত ভয়ানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাপ বৃক্ষ সকল জন্মিতে

পারে। তুমি একবার ভাবিয়া দেখ, পবিত্রতা এবং বৈরাগ্য বিরুদ্ধ তুমি কত রাশি রাশি বিলাসসুখ কামনা করিতে পার; ক্ষমা গুণের বিরুদ্ধে সামান্য কারণে কিম্বা প্রবল শত্রুদিগের উত্তেজনায় কত রাগ প্রকাশ করিতে পার এবং তাহাদিগের প্রতি প্রতিহিংসা করিতে পার; লোভ পরবশ হইয়া অন্যায়রূপে প্রবঞ্চনা করিয়া কত লোকের নিকট হইতে টাকা লইতে পার; অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনাকে কত বড় এবং পৃথিবীকে কত ছোট মনে করিতে পার; পরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষানলে কত জ্বলিতে পার।

বাস্তবিক তুমি ইচ্ছা করিলে যেরূপ ভয়ানক পাপ করিতে পার, তাহার তুলনায় তুমি যে সকল গুরুতর পাপ করিয়াছ তাহা কিছুই নহে। তুমি সুবিধা পাইয়া পাঁচবার নিষিদ্ধ আমোদ প্রমোদ করিয়াছ, ভবিষ্যতে তুমি পাঁচ শতবার সেই নিষিদ্ধ অপবিত্র সুখ ভোগ করিতে পার। গত জীবনে লোভী হইয়া পাঁচটী টাকা চুরী করিয়াছ, ভবিষ্যতে তুমি পাঁচ শত টাকা চুরী করিতে পার। গত জীবনে প্রতিহিংসা ও ক্রোধে অন্ধ ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া একটী নর-হত্যা করিয়াছ, ভবিষ্যতে রাগে মত্ত হইয়া শত শত লোকের মস্তক ছেদন করিতে পার। তোমার মনের ভিতরে পাপ ধ্যান করিবার লালসা আছে কি না বল। তোমার প্রলো-ভনে পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না বল। টাকা দেখিলে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তোমার হস্ত চুলকায় কি না?

লোভের সামগ্রী সকল দেখিলে তোমার মুখ হইতে জল পড়ে কি না ?

যদি তুমি এ প্রকার স্থানে থাক যেখানে তুমি অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকা চুরী করিতে পার সেখানে তুমি প্রলুব্ধ হস্ত প্রসারণ করিতে পার কি না ? যদি পার, যদি সুবিধা পাইলে তোমার চুরী করিবার সম্ভাবনা থাকে তবে তুমি যে লোভী এবং প্রচ্ছন্ন চোর তাহা প্রমাণিত হইল। তোমার বন্ধুর অনিষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় তুমি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পার তবে প্রমাণিত হইল তোমার ভিতরে অসত্য আছে। মনে কর, একজন তোমার নামে অপবাদ রটনা করিয়াছে, একজন তোমাকে কটু বলিয়াছে, একজন তোমাকে কঠোরভাবে আঘাত করিয়াছে, একজন গলা টিপিয়া তোমার ছেলেকে বধ করিয়াছে, একজন তোমার স্ত্রীর অপমান করিয়াছে, এ সকল লোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কি তোমার অন্তরে ভয়ানক প্রতিহিংসা এবং রাগ উত্তেজিত হয় না, এ সকল লোককে স্মরণ করিবামাত্র কি তোমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রক্ত গরম হইয়া উঠে না ? যদি হয় তবে সিদ্ধান্ত হইল যে তুমি ক্ষমাশীল নহ, তুমি প্রতিহিংসা দোষে দোষী।

কেহ তোমার অপকার করিলে তুমি যদি তাহার অনিষ্ট ইচ্ছা করিতে পার, কেহ তোমার স্ত্রীর নিন্দা করিলে, তুমি যদি তাহার স্ত্রীর অধোগতি কামনা করিতে পার, কেহ

তোমার সন্তানদিগকে বিপদগ্রস্ত করিলে, তুমি যদি তাহার সন্তানদিগের মৃত্যু ইচ্ছা করিতে পার তবে জানিবে তুমি ক্ষমাবিবর্জ্জিত, তোমার মনে প্রতিহিংসা অত্যন্ত প্রবল, তোমার মনের ভিতরে রাগের নরক প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যাহাদিগকে তুমি পছন্দ কর না যদি তাহাদিগের সুখ তুমি সহ্য করিতে না পার, তাহাদিগের গাড়ী ঘোড়া দেখিলে, তাহাদিগের সন্তানের শ্রীবৃদ্ধি ও সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিলে যদি তোমার মনে কষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে তবে তুমি জানিবে তোমার মনের ভিতরে চাপা ঈর্ষানল রহিয়াছে।

হে সাধক, তুমি সাহস করিয়া বলিতে পার তোমার টাকার অহঙ্কার নাই, বিদ্যার অহঙ্কার নাই; কিন্তু তোমার কি ধর্ম্মের অহঙ্কার নাই? যখন তুমি কাঙ্গালের বেশে একতারা হাতে করিয়া পথে পথে, দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও তখন যদি লোকে তোমাকে চৈতন্যের ন্যায় ভক্ত বৈরাগী বলে তখন কি তোমার মনে একটু ধর্ম্মের উচ্চ অহঙ্কার উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাই? যদি সম্ভাবনা থাকে তবে জানিবে তোমার অহঙ্কার আছে এবং সে অহঙ্কার বিদ্যা ধনের অহঙ্কার অপেক্ষাও জঘন্য। কেন না ধার্ম্মিক হইয়াও যে অহঙ্কারী হয় সে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। অমৃতের ভিতরেও গরল? অহঙ্কার বিনাশ করিতে গিয়াও অহঙ্কার? এইরূপে বিচার করিয়া দেখিবে যদি ষড়রিপু সম্পর্কে তোমার প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে তবে জানিবে তোমার

মনের ভিতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা সম্বন্ধে পাপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে যত পাপ করিতে পারে তাহার তত পাপ আছে মনে করা উচিত। কেন না পাপ করিবার যত সম্ভাবনা তাহা পাপের পরিমাণ।

হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি যদি বলিতে পার, যে তোমার জীবনে ব্রহ্মকৃপায় এতদূর পাপ জয় হইয়াছে যে তোমার আর পাপ করিবার সম্ভাবনা নাই, তবে তুমি বিশ্বাস করিতে পার যে তুমি পাপের অতীত হইয়াছ। যদি তুমি সৎসাহসের সহিত বলিতে পার যে তোমার মন এতদূর শুদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়াছে যে কোন প্রকার প্রলোভন তোমাকে বিচলিত করিতে পারে না; তুমি এতদূর ক্ষমাশীল যে শত্রুদিগের ভয়ানক উৎপীড়নেও তোমার ক্রোধ উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি এতদূর নির্লোভী যে কোটি কোটি টাকাও তোমার লোভ উদ্দীপন করিতে পারে না; তুমি এতদূর বিনয়ী যে কিছুতেই তোমাকে অহঙ্কারী করিতে পারে না, এবং তুমি এমনই প্রেমিক যে যতই তুমি পরশ্রী দর্শন কর ততই তোমার অন্তরে আহ্লাদ বৃদ্ধি হয়। তাহা হইলে তুমি জানিবে যে ঈশ্বরের কৃপাতে তুমি রাগ লোভ অহঙ্কার ও ঈর্ষার অতীত হইয়াছ।

তুমি কল্পনা দ্বারা একবার সমস্ত পাপ ভাব। প্রলোভনে পড়িলে তুমি কত প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ করিতে পার, শত্রুর প্রতি কত নির্য্যাতন করিতে পার, পরকে প্রবঞ্চনা

করিয়া কত অর্থ সংগ্রহ করিতে পার, অনাথ পিতৃ মাতৃহীন শিশু এবং বিধবার দুঃখের প্রতি কত উপেক্ষা করিতে পার, অহঙ্কারী হইয়া অপরকে কত নীচ ও হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা করিতে পার, পরশ্রী দেখিয়া কত কাতর হইতে পার, কঠোর স্বার্থপর হইয়া নিরাশ্রয় দুঃখীদিগকে উৎপীড়ন করিয়া আপনার ধন সম্পদ কত বৃদ্ধি করিতে পার। এ সমস্ত এবং অন্যান্য যত প্রকার পাপাচরণ করিবার তোমার সম্ভাবনা আছে তাহা একবার কল্পনা দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখ।

যদি শাক্যসিংহ এবং মহর্ষি ঈশার ন্যায় সমস্ত পাপ প্রলোভনের ঘনীভূত আকর স্বরূপ সয়তান একেবারে বিদায় করিয়া দিতে পার তবে তোমার ভয় নাই। কথিত আছে প্রকাণ্ড ধর্ম্মবীর শাক্যসিংহকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিবার জন্য অসুর মার তাঁহার সমক্ষে নানা প্রকার প্রলোভন উপস্থিত করিয়াছিল, শাক্যসিংহ দুর্জ্জয় ধর্ম্মবল এবং মহাতেজ প্রকাশ করিয়া সেই অসুরকে পরাস্ত করিলেন। কথিত আছে মার আপনার প্রলোভন দল সঙ্গে লইয়া বুদ্ধদেবের কাছে গমন করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল,—"হে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, দেখ তোমার কঠোর বৈরাগ্যে তোমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার মুখ বিবর্ণ, চল সংসারে, সেখানে তোমাকে নানা প্রকার বিলাস সুখ দিব।" মারের এ সকল কথা শুনিয়া বুদ্ধদেব হুঙ্কার করিয়া বলিলেন, "তুই দূর হ।"

লিখিত আছে দানব সয়তান মহর্ষি ঈশাকে নানা প্রকার

প্রলোভন দেখাইয়াছিল, দুষ্ট সয়তান তাঁহাকে বলিয়াছিল "তুমি যদি ঈশ্বরার্চ্চনা পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজনা কর তবে তোমাকে এই সসাগরা পৃথিবীর রাজা করিয়া দিব।" সয়তান তাঁহাকে এইরূপ অনেক প্রলোভন দেখাইয়াছিল; কিন্তু ঈশা প্রবল পরাক্রমের সহিত বলিলেন, "সয়তান তুই দূর হ।" শাক্যসিংহের মার দমন এবং মহর্ষি ঈশার সয়তান জয়, এ দুটী গল্প নহে। যদিও মার অথবা সয়তান নামে কোন দৈত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তথাপি এই দুটী গল্পের মধ্যে মনুষ্য স্বভাবের একটী গূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। মারের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা সয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ—ইহার অর্থ কি? মার কি? সয়তান কি? প্রলোভন। সুতরাং প্রলোভন জয় করাই সয়তান জয়।

প্রত্যেক স্বর্গ যাত্রীকে এই সয়তান বধ অর্থাৎ প্রলোভন জয় করিতে হইবে। সয়তান অথবা মার বাহিরের কোন দানব নহে; ইহা মনুষ্যের মনের কল্পনা। মহাবীর শাক্যসিংহ এবং মহর্ষি ঈশা দুইজনেই বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার সময় সম্পূর্ণরূপে এই প্রলোভন জয় করিয়াছিলেন। পাপ প্রলোভনময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে যাইবার সময় কল্পনা ইহাঁদের উভয়ের নিকটেই সমুদয় পাপকে একত্র করিয়া একটী ভীষণাকার গঠন করিয়া উপস্থিত করিয়াছিল। শাক্যসিংহের সেই গম্ভীর শান্ত নয়ন সেই কল্পিত মার ও তাহার অনুচর প্রলোভন সকল দর্শন করিল; মহর্ষি

ঈশার যোগনেত্র সেই ভীষণাকার সয়তানকে দর্শন করিল। উভয়েই আপন আপন অন্তরস্থ স্বর্গীয় ব্রহ্মতেজ প্রভাবে সেই কল্পিত দৈত্যদ্বয়কে বিনাশ করিলেন।

এই দুই প্রধান বৈরাগীর জীবনে এতৎসম্বন্ধে কেমন আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! ঈশার কতকাল পূর্ব্বে শাক্যসিংহ রিপু সংহার করিয়াছিলেন। প্রলোভন জয় না করিলে কেহই স্বর্গীয় জীবন লাভ করিতে পারে না। শাক্যসিংহ এবং ঈশা উভয়েই পৃথিবীকে দেখাইলেন কিরূপ স্বর্গীয় সাহসের সহিত প্রলোভন জয় করিতে হয়। অতএব হে সাধক, তুমি কি কি পাপ করিয়াছ তাহা ভাবিবে না। কিন্তু তুমি কত পরিমাণে এবং কি কি পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ। ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য বশতঃ, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থ-পরতা বশতঃ কত পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ তোমার মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তোমার কি কি প্রলো-ভনে পড়িবার সম্ভাবনা তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। অর্থাৎ যত প্রকার পাপ প্রলোভন তোমার পক্ষে সম্ভব সমুদয়কে কল্পনা দ্বারা সংযোগ করিয়া একটী ভয়ানক আকার দিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত কর। যখনই দেখিবে তোমার সম্মুখে একটী বিকটাকার দৈত্য দাঁড়াইল, তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার করিয়া তাহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইবে। বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া এমনই দুর্জ্জয় পরাক্রমের সহিত হুঙ্কার করিবে যে তাহাতে চন্দ্র সূর্য্য কাঁপিবে এবং পর্ব্বত

সকল কড় কড় করিয়া উঠিবে। মহাতেজের সহিত বলিবে "রে পাপ সয়তান্, তুই দূর হইয়া চলিয়া যা।"

মহর্ষি ঈশা কেমন ভয়ানক জোরের সহিত এই কথা বলিয়া সয়তানকে দূর করিয়া দিলেন ; কিন্তু তিনি যে জোরের সহিত বলিলেন আমাদের ন্যায় সহস্র সহস্র অল্প বিশ্বাসীর সমবেত স্বরও সেরূপ সতেজ হয় না। সয়তান আমাদের দুর্ব্বল স্বর বুঝিতে পারে, এই জন্য সয়তান আমাদের নিস্তেজ কথায় চলিয়া না গিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। ঈশার স্বর শুনিবামাত্র সয়তান পলায়ন করে ; কিন্তু আমরা যদি দুর্ব্বল স্বরে শত শত বার সয়তানকে বলি, "তুই দূর হ" সয়তান আমাদের কথা গ্রাহ্য করে না, বরং কিছুতেই আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। ঈশার এক কথাতে, এক বাণ নিক্ষেপে সয়তান প্রাণত্যাগ করিল আর কখনও ঈশার কাছে গেল না। শাক্য-সিংহ এবং ঈশার হৃদয়স্থ বৈরাগ্যানলে মার এবং সয়তান ক্ষণকালের মধ্যে ভস্ম হইয়া গেল।

বাস্তবিক ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া হুঙ্কার না করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি একেবারে উন্মূলিত হয় না। যিনি মৃত্যুকে বধ করেন সেই মৃত্যুঞ্জয়ের তেজে তেজস্বী না হইলে কেহই শমন এবং সয়তানকে সংহার করিতে পারে না। যিনি ব্রহ্মতেজবলে একবার সয়তানকে সংহার করেন তাঁহার জীবনে আর সয়তানের দৌরাত্ম্য সম্ভব নহে। অন্তরের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ভিন্ন পাপ দৈত্য দগ্ধ

হয় না; বাহ্যিক বৈরাগ্যে কিছুই হয় না। কেবল কমণ্ডলু ও গৈরিক বস্ত্র ও উপবাসে কি নরকাগ্নি নির্ব্বাণ হয়? জোরের সহিত, ব্রহ্মতেজের সহিত বলিতে হইবে "রে সয়তান, তুই দূর হ, তোকে এখনই মারিব।" ধর্ম্ম যোদ্ধার বল দেখাইতে হইবে। সয়তান যোদ্ধার রক্তবর্ণ চক্ষু দেখিলে, ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিবে "মহাপ্রভু, ভ্রমবশতঃ আপনার নিকটে আসিয়াছি; আর কদাচ আপনার নিকটে আসিব না। আমাকে ছাড়িয়া দিন।"

হে নববিধানাশ্রিত ব্রহ্মভক্ত, তুমি ধর্ম্মবীরের ন্যায় সাহস করিয়া বল "ঈশ্বর আমার সহায় হউন, এই আমি সয়তানের বুকের উপর পা রাখিলাম, আর আমি মন্দ লোক হইব না, আর আমি পাপ করিব না।" যাঁহার মনে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিতেছে তিনি কেন সয়তানকে ভয় করিবেন? প্রকাণ্ড ভীষণাকার সয়তান তাঁহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র কীট স্বরূপ। তিনি বলেন, সয়তান—এটা কি? একটা সামান্য ক্ষুদ্র পোকা, টিপিব আর মরিবে, ফুঁ দিব আর উড়িয়া যাইবে। ঈশা ফুঁ দিয়া বলিলেন, "সয়তান, দূর হ" আর সয়তান চলিয়া গেল। ঈশার ধর্ম্মবল, এবং সৎসাহস দেখিয়া পাপ সয়তান আত্মহত্যা করিল। আমরা বলি আমাদের বল নাই তাই সয়তান আমাদিগকে ছাড়ে না। সয়তান বলে শাক্য ও ঈশার তীব্র বাক্যবাণে আমি বিদ্ধ হইয়াছি, আমার আর সাধ্য নাই, সাহস নাই যে আমি তাঁহাদের নিকট যাইতে

পারি। নববিধানের লোকেরা যদি সেইরূপ বলিতে পারেন তবে কি আর সয়তান তাঁহাদিগের নিকট আসিতে পারে?

অনুতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহা পুরাতন বিধি। ইহাতে কেবল অনুষ্ঠিত বিগত পাপ বিনাশ হয় কিন্তু ভাবী পাপের বারণ হয় না। নূতন বিধিতে পাপ রোগের ঔষধ সৎসাহস। যে সকল পাপ হইতে পারে, ভবিষ্যতে যে সকল প্রলোভন আসিতে পারে, সমক্ষে যে সকল ভয়ানক দুর্দ্দান্ত পাপ প্রতীক্ষা করিতেছে, সে সকল মনে করিয়া, কল্পনা করিয়া তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা দ্বারা ধর্ম্মবল ও সৎসাহস সঞ্চয় করিতে হইবে। এই যে দুই বীর ঈশা ও শাক্য মুনি ইহাঁরা পৃথিবীকে শমন দমন মন্ত্র শিখাইয়া গিয়াছেন। বন্ধুগণ, পাপকে যদি প্রশ্রয় দেও, সাপকে যদি দুগ্ধ দিয়া পোষণ কর, সেই পাপ, সেই সাপ তোমাদিগকে ছাড়িবে না। যখন তোমরা মনে করিতেছ তোমাদের চরিত্রে পাপের লেশমাত্র নাই তখন কল্পনাকে বলিবে, কল্পনা, আমার পক্ষে যত পাপ সম্ভব ডাকিয়া আন। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় দুর্জ্জয় বলে যদি এই সমুদয় সম্ভব পাপকে বিদায় করিয়া দিতে পার তাহা হইলে তোমাদের জীবনে প্রবল বেগে ব্রহ্মকৃপা পবন বহিবে, ধর্ম্মের জয় হইবে এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইবে।

কপটতার ঔষধ কপটতা।

রবিবার ২৭শে বৈশাখ, ১৮০৩ শক; ৮ই মে ১৮৮১।

এক প্রকার চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তাহাতে যে কারণে রোগ হয় সেই কারণেই রোগের প্রতীকার হয় এইরূপ যুক্তি আছে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও কথা প্রচলিত আছে, বিষে বিষ ক্ষয় হয়। অতএব পৃথিবীতে যদি পাপমূলক কপটতা রোগ হইয়া থাকে তবে, হে ধর্ম্মচিকিৎসকগণ, তোমরা ধর্ম্ম-মূলক কপটতা অবলম্বন করিয়া সেই রোগের প্রতীকার কর। পৃথিবীতে কপটতা রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; এখানে অধার্ম্মিক ধার্ম্মিকের ছদ্মবেশ, ঘোর পাপাসক্ত বৈরাগী সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ, এবং নিতান্ত নির্জীব ও অলস পরিশ্রমীর বেশ গ্রহণ করিয়া আত্মগোপন এবং জন সমাজকে প্রবঞ্চনা করিতেছে। মনের ভিতরে যাহাদের অনেক গরল, মুখে তাহারা মধু মাখিয়াছে। যে তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিবে সে তোমার নিকটে সাধুর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; যে তোমাকে নানা প্রকার বিপদ প্রলোভনে ফেলিবে সে তোমার নিকটে নীতি প্রচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছে; যে তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবারের সর্ব্বনাশ করিতে অভিলাষী সে তোমার নিকটে সাধু যোগীর বেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

উপাসকগণ, বোধ হয়, তোমরা সকলেই জান অসুরশ্রেষ্ঠ রাবণ ভিখারী যোগীর বেশ ধারণ করিয়া সীতাকে হরণ

করিয়াছিল। সেইরূপ অনেক দুরাত্মা অসুর এখনও সাধু মহন্তের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া জনসমাজের ধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। পৃথিবীতে এত ভয়ানক কপটতা। কপটতাশূন্য লোক প্রায় দেখা যায় না। প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকার কপটতায় কলঙ্কিত। ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস ভক্তি অল্প, আমাদিগের অন্তরে জীবের প্রতি দয়া অল্প, সুশীলতা অল্প; কিন্তু লোকের নিকট প্রকাশ করি যেন আমাদিগের কত বিশ্বাস ভক্তি, কত দয়া সুশীলতা। আমাদিগের ভিতরে সদ্‌গুণ অল্প; কিন্তু দেখাই অনেক। এই মন্দিরে আমরা যতগুলি লোক আছি ঈশ্বরের চক্ষে আমরা প্রত্যেকেই কপট। আমাদের প্রত্যেকের গুণ, প্রকাশ অপেক্ষা অতি অল্প। আশ্চর্য্য, এই পৃথিবীতে এমন নির্গুণ লোক কিরূপে গুণ-সম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত হয়।

তুমি ইংরাজী কিছুই জান না, জ্ঞান বিজ্ঞানে তুমি কখনও সুনিপুণ হও নাই, অথচ লোকে তোমাকে খুব বিদ্বান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত সুবক্তা বলিয়া সুখ্যাতি করে। কে তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে জিতেন্দ্রিয়? কে তোমাদের মধ্যে ক্ষমাশীল? কে তোমাদের মধ্যে বিবেকী বৈরাগী? কে তোমাদের মধ্যে বিনয়ী? কে তোমাদের মধ্যে যথার্থ দয়ালু? তোমাদের মধ্যে কে ষোল আনা কর্ত্তব্য-পরায়ণ? কে তোমাদের মধ্যে ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া স্ত্রী সন্তানাদির প্রতি যথা কর্ত্তব্য সাধন করেন? বাস্তবিক আমাদিগের কেহই কোন বিষয়ে সিদ্ধ

হন নাই; কিন্তু সকলেরই ইচ্ছা যে লোকে আমাদিগকে সিদ্ধ বলে। কে ইচ্ছা করে আগে আমরা ভাল হই, তার পর লোকে আমাদিগকে ভাল বলুক। আমরা প্রকৃত বিশ্বাসী ব্রাহ্ম হই আর না হই আমরা ইচ্ছা করি যে লোকে আমাদিগকে ভাল ব্রাহ্ম বলুক। আমরা সকলেই ইচ্ছা করি লোকে আমাদিগকে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম বলুক; কিন্তু "সত্যং" বলিবা মাত্র কি বাস্তবিক আমরা ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই?

বস্তুতঃ আমাদিগের অন্তরে যতটুকু বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মজ্ঞান আছে, লোককে তাহা অপেক্ষা কি আমরা অধিক দেখাই না? যদি প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিকদিগের মধ্যেও এত কপটতা থাকে তবে কিরূপে পৃথিবীর পরিত্রাণ হইবে? দেব দেব মহাদেবের নিকটে কি এমন কোন অস্ত্র নাই যদ্দ্বারা এই পর্ব্বত সমান কপটতা রাশি চূর্ণ হইতে পারে? হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মের নিকটে কি এমন কোন ঔষধ শিক্ষা কর নাই যাহাতে তোমরা এই ভয়ানক কপটতা রোগ হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পার? কি অস্ত্রে, কোন বাণে তোমরা এই প্রকাণ্ড পাপ কপটতাকে মারিবে? মহাদেবের নিকটে মহা অস্ত্র আছে। কপটতারূপ পাপাসুর বিনাশ করিবার জন্য তোমরা সকলে ব্যাকুল হইয়া দেবদেব মহেশ্বরের নিকট গমন কর, তিনি তোমাদিগকে সেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবেন যাহাতে তোমরা নিশ্চয়ই এই অসুর সংহার করিতে পারিবে। বিষ দ্বারা বিষ নষ্ট কর। সেইরূপ

কপটতা দ্বারা কপটতা বিনাশ কর। অর্থাৎ যাহারা লোককে দেখাইবার জন্য নানা প্রকার ধর্ম্মের আড়ম্বর এবং কপটাচরণ করে তাহারা তাহাদিগের বিপরীত আচরণ না দেখিলে কোন মতেই পরাস্ত হইবে না।

তাহাদিগের অন্তরে প্রকৃত বৈরাগ্য নাই; কিন্তু লোকের নিকটে তাহারা বৈরাগ্যের ছদ্মবেশ ধারণ করে। ইহা অতি নীচ এবং পাপমূলক কপটতা। ইহার বিপরীত উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমূলক কপটতা এই যে—আমার অন্তরে ঈশ্বরের কৃপায় অকৃত্রিম বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছে; কিন্তু তাহা লোককে দেখাইবার জন্য ইচ্ছা পোষণ করা দূরে থাকুক বরং তাহা লোকের নিকট গোপন করিবার জন্য বিলক্ষণ ইচ্ছা জন্মিয়াছে; এবং এই প্রবলা ইচ্ছা যে, সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী ঈশ্বর কেবল তাহার সাক্ষী হইয়া থাকুন। এই সরল পবিত্র কপটতা দ্বারাই কেবল পাপমূলক কপটতা জয় করা যায়।

হে পৃথিবীর সাধু সজ্জনগণ, এই কপটতারূপ পাপাসুর সংহার করিবার জন্য আপনারা এই যুদ্ধক্ষেত্রের অপর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হউন, এই অসুরকে বিনাশ করিবার জন্য আপনারা অব্যর্থ সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ করুন, স্বর্গীয় সাহস অবলম্বন করিয়া আপনারা গুপ্ত প্রচ্ছন্ন সদ্‌গুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া ঐ অসুরকে বধ করুন। আপনাদিগের অন্তরে যে ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্বলন্ত বিশ্বাস, বিবেক বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বর্গের অমূল্য রত্ন সকল রহিয়াছে তাহা কপট হইয়া পৃথিবীর চক্ষু হইতে

গোপন করিয়া রাখুন। পৃথিবীর প্রশংসারূপ বিষাক্ত বায়ু সাধুদিগের স্বর্গীয় পবিত্রতা দূষিত করে। অতএব আপনারা এই দূষিত বায়ু হইতে দূরে অবস্থিতি করুন। কোন মনুষ্যের মলিন চক্ষু যেন আপনাদিগের সাধুতা দেখিতে না পায়।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে কপট হইবার জন্য, আত্মগোপন করিবার জন্য কেন উপদেশ হইতেছে? যে বেদী হইতে এতদিন পূর্ণ সরলতা সাধন, যোগ সাধন, ভক্তি সাধন, বিবেক বৈরাগ্য সাধন প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে উচ্চ উচ্চ নীতি শিক্ষা করিলাম, সেই বেদী হইতে আজ কপটতা সাধনের জন্য কেন অনুরুদ্ধ হইতেছি? তবে ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব শ্রবণ কর। হে ব্রহ্ম-সাধকগণ, যখন তোমরা বৈরাগীর বেশে দ্বারে দ্বারে, পথে পথে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতে যাও তোমাদিগের হস্তের একতারা এবং গৈরিক বস্ত্র দর্শনে তোমাদিগকে সাধু বৈরাগী বলিয়া জগতের লোক প্রচুর প্রশংসা করিতে পারে; কিন্তু সাবধান, তোমরা লোকের প্রশংসায় বিচলিত হইও না। বাহ্যিক লক্ষণ দেখিয়া যাহারা প্রশংসা করে তাহাদিগের প্রশংসায় কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ইতিপূর্ব্বে এই বেদী হইতে তোমরা শুনিয়াছ পূর্ব্বকার সাধু বৈরাগীগণ বৈরাগ্যের যে সকল সুলক্ষণ দেখাইয়া গিয়াছেন তোমাদিগের পক্ষে সে সমস্ত আদরণীয় ও অবলম্বনীয়। সুতরাং তোমাদিগকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনানুসারে ঝুলি, একতারা গৈরিক বস্ত্র প্রভৃতি

গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু এ সকল গ্রহণ করিলেই শত শত লোক তোমাদিগকে হরিভক্ত বৈরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, এবং তোমাদিগকে এমনই বাড়াইবে ও আদর করিবে যে তোমরা লজ্জিত হইবে।

বাস্তবিক পৃথিবীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করা অতি সহজ। এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিলে কিম্বা একটী উপবাস করিলেই তুমি পৃথিবীর নিকটে যোগী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসিত হইতে পার। অতএব হে ভক্তগণ, পৃথিবীর নিকটে তোমাদিগের বৈরাগ্য দেখাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। পৃথিবীর নিকটে তোমরা প্রচ্ছন্ন থাকিলে তোমাদিগের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদিগের পুরস্কার ঈশ্বরের নিকটে। ঈশ্বর তোমাদিগের হৃদয় দেখিলেই তোমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট। বাহ্যিক বৈরাগ্য লক্ষণ সকল দেখাইয়া কদাচ পৃথিবীর নিকটে সুযশ ক্রয় করিতে যেন কাহারও ইচ্ছা না হয়; বরং পৃথিবীতে বৈরাগ্য অপ্রকাশিত থাকুক প্রত্যেক সরল বৈরাগীর যেন এইরূপ ইচ্ছা হয়। যে পৃথিবীতে অতি সামান্য কৌশলে যোগী বৈরাগী হওয়া যায় সেই পৃথিবীর প্রশংসা লাভ করিতে কি তোমাদিগের ভয় লজ্জা হয় না? অতএব তোমরা পৃথিবীর নিকটে আত্মগোপন করিয়া সুখ্যাতি এবং পুরস্কার লাভ করিবার জন্য কেবল ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হও। যাহারা লোকের নিকট প্রশংসা ও সুখ্যাতি অন্বেষণ করে তাহাদিগের মনে অনেক প্রকার বিকার উপস্থিত হয়।

নববিধানের বৈরাগীদল, তোমরা সরল অন্তরে পৃথিবীকে জানিতে দেও যে, যদিও তোমরা সময়ে সময়ে প্রাচীন বৈরাগীদিগের ন্যায় গৈরিক বস্ত্র পরিধান কর, তথাপি তোমরা তাঁহাদিগের ন্যায় উচ্চ প্রকৃতির বৈরাগী যোগী নও। অতএব যাহাতে লোকে তোমাদিগকে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বলিয়া প্রশংসা না করে তজ্জন্য তোমরা গৈরিক বস্ত্রের সঙ্গে এমন কিছু সংযোগ কর যাহা দেখিলে লোকের শ্রদ্ধা হ্রাস হইবে। পৃথিবীর কপট ধূর্ত্তদিগের অন্তরে কাল; কিন্তু সাধুবেশ পরিয়া বাহিরে দেখায় ভাল। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমাদিগের অন্তরে থাকুক ভাল, বাহিরে লোকে দেখুক কাল। তোমরা প্রাণের ভিতরে অমৃত প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখ। তোমরা পৃথিবীকে বল, "হে পৃথিবী, তুমি আর আমাদিগকে ভক্ত যোগী বলিয়া আমাদিগের পায়ে পড়িও না, আর তুমি আমাদিগকে সাধু বিবেকী বৈরাগী বলিয়া বৃথা প্রশংসা করিও না, কেন না আমাদিগের চরিত্রের কত কলঙ্ক এবং কত অসাধুতা রহিয়াছে।"

আত্মসংযম এবং চিত্তশুদ্ধির জন্য যদি হে ব্রাহ্মসাধক, তুমি উপবাস করিয়া থাক তবে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া এমনই ভাবে মুখের অবসন্নতা ঢাকিয়া রাখিবে যেন কেহ না জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। ঈশ্বরের জন্য অথবা ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া যদি লোকের মনে দয়া উৎপাদন করিবার চেষ্টা কর তবে তুমি ঈশ্বর

বিশ্বাসী নহ। হে ভ্রান্ত মানব, তুমি কি তোমার বৈরাগ্য এবং ঈশ্বরানুরাগ প্রদর্শন করিয়া লোকের নিকট পুরস্কার প্রত্যাশা কর? মনুষ্য কি তোমার অন্তরের ভাব বিচার করিতে পারে? মানুষের বিচারে কি ভুল নাই, তাহার প্রশংসায় কি গরল নাই? অতএব লোকের নিকটে কদাচ আপনাকে সাধু বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিও না।

একটু সামান্য বাহ্যিক লক্ষণ দেখিলেই লোকে কাহাকেও শাক্যের ন্যায় বৈরাগী, কাহাকেও ঈশার ন্যায় পাপীর বন্ধু, কাহাকেও গৌরাঙ্গের ন্যায় ভক্ত মনে করে। যাহার অন্তরে কিছুমাত্র বৈরাগ্য নাই তাহার স্কন্ধে এক খণ্ড ক্ষুদ্র গৈরিক বস্ত্র দেখিলে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী সন্ন্যাসী বলিয়া লোকে তাহার পদধূলি গ্রহণ করে। যাহার পাঁচ পয়সা সম্বল নাই লোকে তাহাকে লক্ষপতি বলে পৃথিবীর এই রীতি। হে ভ্রান্ত মানব, লোকের স্তুতি নিন্দার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিও না। ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তুমি যে সকল কষ্ট বহন কর তাহা জানাইবার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দ্বারে দ্বারে বেড়াইও না। উপবাস করিয়া গৃহের মধ্যে বসিয়া থাক যেন লোকে না জানিতে পারে যে তুমি উপবাস করিয়াছ। যাহা ঈশ্বরকে দেখাইবার সামগ্রী তাহা কদাচ লোককে দেখাইবার জন্য ইচ্ছা বা চেষ্টা করিও না। যদি ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বত্যাগী অকিঞ্চন হইয়া থাক লোককে তাহা দেখাইবার প্রয়োজন কি?

বাস্তবিক বৈরাগ্য কি বাহ্যিক চিহ্ন দ্বারা দেখান যায়? মুখের উপরে কি বৈরাগ্যের রঙ্গ প্রতিফলিত হয়? যদি তুমি সত্য সত্যই ঈশ্বর-পরায়ণ হও তবে কি তোমার শরীর সম্পূর্ণরূপে তোমার ঈশ্বরভক্তি দেখাইতে পারে? যদি তোমার অন্তরে যথার্থ বৈরাগ্য ও দয়া থাকে, যদি জগতের দুঃখ দেখিয়া তোমার প্রাণ ফাটে তবে তাহা তুমি মানুষকে কিরূপে দেখাইবে? জগতের পাপ দূর করিবার জন্য প্রাণ-বন্ধু ঈশা কত দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা কি পৃথিবীর কেহ জানে? জরা, রোগ, মৃত্যু এবং বিষয়-বাসনা প্রভৃতি বিবিধ জ্বালা হইলে মানুষকে উদ্ধার করিবার জন্য বুদ্ধ-দেব দয়ালু হইয়া অন্তরের অন্তরে কত কষ্ট সহ্য করিয়া-ছিলেন তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ জানে না। তাঁহাদিগের বৈরাগ্যের সঙ্গে কি আমাদিগের বৈরাগ্যের তুলনা হইতে পারে?

আমরা একদিন নিজ হস্তে রাঁধিয়া খাইলাম, অথবা একদিন একটী উপাদেয় ফল খাইলাম না, অমনি সেই ব্যাপার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল এবং চারিদিকে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবেশী সকলে বলিয়া উঠিল, ইহাদের কি বৈরাগ্য! ঈশ্বরের প্রতি ইহাদের কি প্রগাঢ় ভক্তি! কি গভীর অনুরাগ! হে ব্রহ্মভক্তগণ, সাবধান, এ সকল কথায় প্রবঞ্চিত হইও না, যখনই এই প্রকার কথা শুনিবে তৎক্ষণাৎ কাণে হাত দিবে। যদি তোমরা পৃথিবীর সুখ্যাতিতে প্রবঞ্চিত

হও, তবে তোমাদের অসদ্দৃষ্টান্তে পৃথিবীর অনেক লোক মরিবে; ভবিষ্যৎ বংশের লোকেরা তোমাদিগের এই সহজ পথ ধরিয়া চারি পয়সার গৈরিক বস্ত্র ব্যবহার করিয়া লোকের নিকট সুখ্যাতি ক্রয় করিবে। তাহারা পৃথিবীর লোককে বলিবে তোমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে গৈরিক ব্যবহার করিতে দেখিয়া কত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে আমরাও সেই গৈরিক ব্যবহার করিতেছি আমাদিগকেও তোমরা সেইরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি দেও। আমাদিগকেও তোমরা শাক্য, ঈশা, চৈতন্যসদৃশ জ্ঞান করিয়া সমাদর কর।

এইরূপে বাহ্যিক লক্ষণ অবলম্বন করিয়া ভাবীবংশের লোকেরা অতি সহজে পৃথিবীকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিবে, অতএব হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি আত্ম সঙ্গোপন কর, তুমি কোন প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ দেখাইয়া লোকের প্রশংসা কিম্বা অনুরাগ পাইতে ইচ্ছা করিও না। তোমার যাহা দেখাইবার তাহা কেবল সর্ব্বদর্শী ঈশ্বরকে দেখাইবে। যদি তুমি মানুষের নিকট তোমার ধর্ম্মের পরিচয় দিতে চেষ্টা কর তাহা হইলে তোমার নিজের অনিষ্ট এবং জগতের অনিষ্ট হইবে। ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য, যোগানন্দরস পান করিবার জন্য তুমি কত কঠোর তপস্যা এবং কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ ও কত প্রকার বৈরাগ্য ব্রত পালন করিয়াছ তাহা মানুষকে বলিয়া তোমার কি লাভ হইবে?

মানুষের নিকট বৈরাগী বলিয়া পরিচিত হইবার বাসনা

পোষণ করিও না, বরং তোমার বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিলাসের এমন কোন চিহ্ন ধারণ কর, যাহাতে লোকে বলিবে ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় বৈরাগী নহে, ইহাদিগের তেমন আন্তরিক বৈরাগ্য নাই, ইহাদের মনে এখনও বিষয়-বাসনা, বিলাসকামনা রহিয়াছে। যদিও ইহারা গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়াছে সত্য; কিন্তু ইহারা ভদ্রতা ও সভ্যতাও রক্ষা করিতেছে। ইহারা দীন হীন বৈষ্ণব বৈরাগীদিগের ন্যায় অপমানিত হইতে চায় না, ইহারা শাক্য চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মের জন্য সংসার ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। এইরূপে বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু সংসার ধর্ম্মের চিহ্ন রাখিবে। পাত্র অমৃতে পূর্ণ করিবে, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু তিক্ত রাখিবে, তাহা হইলে লোকে তোমাদিগকে প্রাচীন বৈরাগীদিগের ন্যায় উচ্চ মনে করিবে না, বরং বিষয়ী বলিয়া নিন্দা করিবে। লোকে তোমাদিগকে সুখ্যাতি দিবে না; কিন্তু ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার আপনার দরবারের মধ্যে ডাকিয়া দেবতাদিগকে বলিবেন, "দেখ, আমার এই সাধু পুত্রগণ ভিতরে সরলতা পবিত্রতারূপ স্বর্গীয় হীরক খণ্ড গোপন করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু বাহিরে ইহারা কত নিন্দা ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছে।"

হে ভক্তগণ, তোমরা মানুষের সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া কেবল ভগবানের প্রসন্ন মুখ দেখিয়া আপন আপন ধর্ম্ম সাধন করিয়া যাও, তোমাদিগকে আজ

না জানুক হাজার হাজার বৎসর পরে পৃথিবী তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে। তোমার প্রাণের ভিতরে ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি স্বর্গের আতর গোলাপ লুকাইয়া রাখ, অন্তরে পুণ্য সূর্য্য প্রেমচন্দ্র লুকাইয়া রাখ। কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ চমৎকার নিয়ম যে তোমরা যতই কেন এ সকল স্বর্গীয় সামগ্রী ঢাকিয়া রাখিতে যত্ন কর না, ইহারা আপনার বলে আপনারা প্রচারিত হইয়া পড়িবে। তোমরা যে পরিমাণে চাপা দিবে সেই পরিমাণ বেগের সহিত ইহারা বাহির হইবে। সকল প্রকার মেঘ ভেদ করিয়া তোমাদিগের অন্তরে বৈরাগ্য সূর্য্য যথা সময়ে বাহির হইবে, এবং বাহির হইয়া বলিবে যে আমি ঐ সাধুদিগের অন্তরে গোপনে ছিলাম, তাঁহারা বলপূর্ব্বক আমাকে অনুরোধ করিয়া বলিতেন, হে সূর্য্য, তুমি গোপনে থাক, দেখা দিও না। এখন তাঁহারা পরলোকে গিয়াছেন তাই আমি প্রকাশিত হইয়াছি। বাস্তবিক হে ভক্তগণ, তোমরা যতই কেন চাপা দেও না তোমাদিগের অন্তরে যদি অকৃত্রিম হরিভক্তি ও বৈরাগ্য থাকে ঈশ্বর তাহা প্রকাশ করিয়া দিবেন এবং তখন পৃথিবী তোমাদিগকে মাথায় লইয়া বলিবে "ইহাঁরাই প্রকৃত সাধু বৈরাগী, কারণ ইহাঁরা এতকাল ইহাঁদিগের সাধুতা ও বৈরাগ্য গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন।" বন্ধুগণ, তোমাদিগের বৈরাগ্য ও হরিভক্তি গোপনে রাখিয়া জন সমাজের মধ্যে থাকিয়া লোকের মনকে আস্তে আস্তে হরণ করিয়া ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ কর। তোমাদিগের গুপ্ত

ধর্ম্মবল প্রবং প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্য দ্বারা পৃথিবীর পাপমূলক, কপটতাকে জয় কর।

শব্দব্রহ্ম।

রবিবার ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক ; ১৫ই মে ১৮৮১।

শব্দব্রহ্মের তত্ত্ব শ্রবণ কর, এই তত্ত্ব সাধন কর। ব্রহ্ম-মুখের কথা যতক্ষণ না বিনির্গত হয় ততক্ষণ কিছুই সৃষ্ট হয় না, ততক্ষণ ব্রহ্ম সৃষ্টিলীলাতে বিহার করেন না ; কিন্তু ততক্ষণ তিনি নির্লিপ্ত, স্বতন্ত্র ভাবে আপনার মহিমাতে আপনি বিরাজ করেন। সর্ব্বগুণময় ঈশ্বর সৃষ্টির পূর্ব্বে নির্গুণ ব্রহ্মরূপে আপনার মধ্যে আপনি বাস করিতেন। যতক্ষণ ব্রহ্মের কথা ব্রহ্মের মধ্যে গোপনে রহিল ততক্ষণ সৃষ্টি হইল না, ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইল না, চন্দ্র সূর্য্য, সাগর পর্ব্বত জীব জন্তু প্রভৃতি কিছুই সৃষ্ট হইল না। অণ্ডের মধ্যে যেমন ভাবী পক্ষী লুক্কায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মকথা প্রকাশের পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মবক্ষে লুক্কায়িত ছিল। যে মুহূর্ত্তে ব্রহ্ম কথা বলিলেন, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল। ব্রহ্ম বলিলেন 'হও ব্রহ্মাণ্ড'। এই ব্রহ্মবাণী গভীর নিনাদে অনন্ত আকাশকে কাঁপাইল এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে সারি গাঁথা জগতের পর জগৎ, জ্যোতিষ্কের পর জ্যোতিষ্ক, শোভার পর শোভা রচিত হইল এবং উৎকৃষ্ট নিয়ম সকল প্রতিষ্ঠিত হইল।

সমুদয় সৃষ্টির মূল কারণ ব্রহ্মকথা। ব্রহ্মবাক্য যতক্ষণ ব্রহ্মমুখে ছিল ততক্ষণ সৃষ্টি হয় নাই। ততক্ষণ সমস্ত সৃষ্টি ব্রহ্মবক্ষে নিদ্রিত ছিল। তখন কোথায় ছিল চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি? কোথায় ছিলেন ঈশা মুসা শাক্য, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সাধুগণ? কোথায় ছিল বেদ, বেদান্ত? কোথায় ছিল বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ? তখন কিছুই হয় নাই, এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। 'না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি, ঘের দিগন্ত প্রসারি, ইচ্ছা হইল তব ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।' ব্রহ্ম কথার অভাবে সমুদয় অপ্রকাশিত ছিল। এই অপ্রকাশের হেতু কি? হেতু এই মাত্র যে তখন ব্রহ্মমুখের শব্দ অথবা সৃজনের ইচ্ছা বাহির হয় নাই। পরে যখনই ব্রহ্মশব্দ বাহির হইল, যখনই ব্রহ্ম বলিলেন 'জগৎ, এস, আলোক, এস' তৎক্ষণাৎ আকাশের ভিতর হইতে প্রকাণ্ড জগৎ উৎপন্ন হইল, নানা দিকে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইল, দিক নিরূপিত হইল। সৃষ্টির পূর্ব্বে এত কাল অসীম আকাশে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দিক ছিল না। সূর্য্য প্রকাশে দিক নিরূপিত হইল।

যখনই ব্রহ্মবাণী বিনিঃসৃত হয় অমনি সমুদয় প্রয়োজনীয় বিষয়ের উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মবাণী নিঃসরণের পূর্ব্বে যেন সমস্ত কাল নিদ্রায় অচেতন ছিল, কোথাও কোন প্রকার চৈতন্য অথবা জীবনের চিহ্ন ছিল না। যখন ব্রহ্ম হুঙ্কার করিয়া বলিলেন 'ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হও' তখনই দশ দিকে

আশ্চর্য্য জীবনের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রহ্ম-কথা বিনা কিছুই জন্মে না, কোন বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না। ব্রহ্মকথা প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু এবং প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের আদিকারণ। এই ব্রহ্মকথা কি? ইহা কোন প্রকার প্রাকৃত শব্দ নহে; কিন্তু ইহা ব্রহ্মর শক্তি, ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মের ইচ্ছা। তাঁহার এই গূঢ় শক্তি, জ্ঞান, প্রেম এবং ইচ্ছা প্রভাবে তিনি এই বিচিত্র সৃষ্টি লীলা প্রকাশ করেন। তাঁহার এ সকল গুণ নিত্য, অনাদি অনন্ত। তাঁহার কোন গুণের আদি কিম্বা অন্ত নাই। কেবল দেশ ও কাল ভেদে নানা প্রকারে এ সকল গুণ প্রকাশিত হয়।

এ সকল প্রকাশিত গুণ দেখিয়া কবি, সুলেখক এবং সাধু মহাজনেরা বেদ, বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি রচনা করেন। এ সকল ধর্ম্ম শাস্ত্রের আদি আছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান অথবা ব্রহ্মবেদের আদি নাই। ব্রহ্মবেদ, ব্রহ্মজ্ঞান অনাদি নিত্য। ব্রহ্ম নিজেই বেদ, তাঁহার মুখ হইতে যে জ্ঞানগর্ভ অশব্দ শব্দ উচ্চারিত হয়, সে সকল শব্দ শুনিয়া যাঁহারা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন তাঁহারাই বেদ লিপিকর। যতদিন ব্রহ্মবাণী ব্রহ্মমুখে থাকে ততদিন বেদ অব্যক্ত অথবা অনিঃসৃত থাকে। ঈশা, মুশা, মহম্মদ, গৌরাঙ্গ, শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের বক্ষে নিদ্রিত ছিলেন; সুতরাং যদিও তাঁহাদের প্রকাশের আদি

আছে; কিন্তু তাঁহারা অনাদি। তাঁহারা এক একজন ব্রহ্মের যে সকল বিচিত্র স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের অবতরণের আগে কি ব্রহ্মেতে সে সকল গুণ ছিল না? ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপ ও গুণ নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। সাধু মহাজনেরা আসিয়া সে সকল বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রকাশ করেন। সাধুদিগের অবতরণের এবং ঐ গুণ সমুদয় প্রকাশের আদি আছে; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান কিম্বা ব্রহ্মের অন্যান্য গুণের আদি নাই।

ব্যক্তব্রহ্ম বেদ, ব্যক্তব্রহ্ম পুরাণ, ব্যক্তব্রহ্ম বাইবেল, ব্যক্তব্রহ্ম শ্রদ্ধেয় মহর্ষি ও যোগী জীবন। কিন্তু সাধুদিগের অবতরণের পূর্ব্বে তাঁহারা ব্রহ্মের মধ্যে অব্যক্ত ভক্তরূপে এবং অব্যক্ত সাধু গুণরাশিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ধর্ম্মগ্রন্থাদি লিখিত হইবার পূর্ব্বে সেই গ্রন্থোক্ত সত্য সকল ব্রহ্মের বক্ষে বীজরূপে, অকথিত বাক্যরূপে স্থিতি করিতেছিল। সুতরাং একদিকে সাধু এবং ধর্ম্ম গ্রন্থাদির আদি আছে এবং আর এক ভাবে আদি নাই। যখন অকথিত কথারূপে, অব্যক্ত সত্যরূপে সাধু এবং ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল ব্রহ্মেতে স্থিতি করে তখন তাহাদের আদি নাই। এই জন্য উক্ত হইয়াছে ব্রহ্ম কথা মনুষ্যের আকার ধারণ করিল; কথা ব্রহ্মের সঙ্গে ছিল এবং কথাই ব্রহ্ম। তাঁহার শক্তি, তাঁহার ইচ্ছাই তাঁহার কথা। যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইতেছে এবং যাহা কিছু হইবে সমস্ত ব্যাপারের বীজ দৈব

শব্দ। ব্রহ্মের কথা ভিন্ন কিছুই হয় না; কিছুই হইতে পারে না।

এই যে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শতাব্দীতে নববিধান প্রকাশিত হইতেছে ইহা তাঁহার কথার ফল। এই নববিধান অব্যক্ত-রূপে তাঁহার বক্ষে গোপনে ছিল। তাঁহারই কথাতে ইহা জীবোদ্ধারের জন্য যথা সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অনন্ত বক্ষের মধ্যে আরও কত বিধান প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কে জানে? গম্ভীর বিরাট পুরুষ ব্রহ্মের ভিতরে বড় বড় হিমালয় সমান প্রকাণ্ড কথা, অকূল অতলস্পর্শ সাগরস্বরূপ কথা সকল রহিয়াছে। অনন্তকাল আমাদের সম্মুখে প্রসারিত, এখনও তাঁহার মুখ হইতে কত কথা বাহির হইবে কে জানে? শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে আর ব্রহ্মের মুখ হইতে এক এক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নূতন অপূর্ব্ব কথা বাহির হইবে। এক এক যুগ চলিয়া যাইবে, আর ব্রহ্মকথাতে এক এক বিধান পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবে যুগে যুগে এক এক প্রকাণ্ড বীর পুরুষ ব্রহ্মশব্দ হইতে উৎপন্ন হইবে। অনন্ত গুণশালী বিচিত্র ঈশ্বরের কত শক্তি, কত জ্ঞান, কত প্রেম, কত পুণ্য, কত সুখ শান্তি, তাহা কে ভাবিতে পারে? ভবিষ্যতে তিনি কত নূতন লীলা প্রকাশ করিবেন, কত আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন তাহা কে কল্পনা করিতে পারে? এক এক প্রকাণ্ড ধর্ম্ম বিধান তাঁহার এক এক বিস্ময়কর শক্তির পরিচয় দিতেছে।

সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিতে অথবা কথাতে এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বিবৃত রহিয়াছে। তাঁহার কথা অথবা তাঁহার শক্তি এবং তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই। যিনি কথা তিনিই শক্তি, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই ভক্তদিগের আরাধিত হরি, তিনিই নববিধানের জননী। হে ভক্তগণ, তোমরা যাঁহাকে ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া কোমল ভাবে জগজ্জননী বলিলে তিনিই অনাদি অনন্ত কথা, তিনিই অশব্দ শব্দ স্বরূপ। ব্রাহ্মসমাজে এত দিন শব্দের মহিমা বিবৃত হয় নাই। এই শব্দব্রহ্মের কাছে আমাদিগকে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে। ব্রহ্মের এক শব্দ এই বাহিরের সুবিশাল বিশ্বমন্দির রচনা করিয়াছে, তাঁহার আর এক শব্দ অধ্যাত্ম-জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহারই এক এক গম্ভীর নিনাদে জগতের নাস্তিকতা ও পাপ অন্ধকার দূর করিবার জন্য এক এক ধর্ম্মবিধান-রূপ-তেজোময়-সূর্য্য গঠিত ও প্রকাশিত হইতেছে।

যেমন সৃষ্টির পূর্ব্বে চারিদিকে ঘোরান্ধকার ছিল এবং কোথাও কিছু ছিল না, পরে যখনই ব্রহ্ম হুঙ্কার করিয়া বলিলেন "চন্দ্র সূর্য্য ও গ্রহ তারাপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড, এস" তৎক্ষণাৎ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইল। সেইরূপ বঙ্গদেশের মানসিক আকাশ ঘোর অবিদ্যা অধর্ম্ম এবং অসত্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সেই অন্ধকার দূর করিবার জন্য ব্রহ্মমুখ হইতে গভীর শব্দ নিনাদিত হইল "নববিধান হউক!" আর সেই শব্দে নববিধানের জন্ম হইল। বঙ্গদেশের পাপ

দুঃখ এবং ভ্রম কুসংস্কার দেখিয়া স্বয়ং প্রভু ভগবান ব্রহ্ম তাঁহার সমস্ত সাধু সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া নববিধানরূপে প্রকাশিত হইলেন। যেমন প্রবল বায়ু সম্মুখে যাহা কিছু পায় তাহা ভয়ানকরূপে আন্দোলিত করিয়া শোঁ শোঁ করিয়া নক্ষত্রবেগে চলিয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মের বিশেষ কৃপাপবন নববিধানরূপে বঙ্গদেশের মস্তকের উপর দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, ইহার বেগে পর্বত সমান বাধা বিঘ্ন সকল চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, শত শত বৎসরের সঞ্চিত ভ্রম, কুসংস্কার, কুপ্রথা, অধর্ম্ম, অনাচার, পাপ জঞ্জাল প্রভৃতি একেবারে উড়িয়া যাইতেছে। ইহা সাধারণ ব্যাপার নহে।

নববিধান ব্রহ্মের এক প্রকাণ্ড শব্দ। এই প্রকাণ্ড শব্দের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই প্রকাণ্ড নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মবিধানের সামঞ্জস্য ও সমষ্টি। ইহাতে যোগভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম সমুদয় ভাবের সমন্বয় হইয়াছে যেমন মধুর বীণাযন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন সংযুক্ত তারের সমষ্টি, সেইরূপ এই নববিধানও নানা প্রকার সুমিষ্ট ব্রহ্ম শব্দের লীলা। ইহাতে বিশ্বগুরুব্রহ্ম তাঁহার শিষ্য সাধকদিগের কর্ণে বিবেক, বৈরাগ্য, যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম প্রভৃতি নানা প্রকার মন্ত্র দান করিতেছেন। স্বর্গের গুরু কখনও তাঁহার সাধককে বলিতেছেন "বৎস, তুমি ঐ বৃক্ষতলে বসিয়া তোমার অগ্রজ শাক্য মুনির ন্যায় সকল প্রকার আসক্তি ও বিষয় বাসনা নির্ব্বাণ করিয়া শান্তি ভোগ কর।" সেই

সাধককেই আবার অন্য সময় বলিতেছেন "হে যোগ শিক্ষার্থী, তুমি এখন কিছুকাল ভক্তি সাধন কর, যাহাতে তোমার হৃদয় সরস এবং কোমল হয় তজ্জন্য তুমি বিশেষরূপে যত্ন কর, কেবল নির্ব্বাণ ও বৈরাগ্য সাধন করিলে হইবে না, এত দিন আমার গম্ভীর যোগেশ্বর মূর্ত্তি দেখিলে এখন আমার ভক্ত-বৎসল প্রেমস্বরূপ দর্শন কর, জগতের প্রতি আমার প্রেম দেখিয়া মোহিত হও, কৃতজ্ঞ হও এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হও।"

এইরূপে শব্দব্রহ্ম কখনও যোগীকে ভক্ত হইতে বলিতেছেন কখনও ভক্তকে যোগী হইতে বলিতেছেন, কখনও জ্ঞানীকে কর্ম্মী হইতে বলিতেছেন, কখনও কর্ম্মীকে জ্ঞানী হইতে বলিতেছেন এবং এই নববিধানে তিনি বিশেষরূপে প্রতিজনকে আপনার জীবনে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম এই সমুদয়ের সামঞ্জস্য করিতে বলিতেছেন। যাহাদিগের অন্তর্জগৎ শূন্য ছিল ব্রহ্মের এক এক শব্দে তাহাদিগের সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মনের মধ্যে আশ্চর্য্য সত্যরাজ্য, যোগরাজ্য, প্রেমরাজ্য, পুণ্যরাজ্য এবং শান্তিরাজ্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মের এক এক হুঙ্কার ধ্বনি আসিয়া এক দিকে যেমন জীবের কল্পিত পাপরাজ্য এবং সকল প্রকার আসক্তির বন্ধন খণ্ড খণ্ড করে, অন্য দিকে তাহার পরিবর্ত্তে পুণ্যরাজ্য এবং শান্তিরাজ্য দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করে। ব্রহ্মবাণীর তেজে যখনই সাধকের হৃদয় হইতে ভ্রম ও পাপের অন্ধকার তিরোহিত হইল, তখনই কোটি কোটি স্বর্গের নক্ষত্র তাঁহার

পাপপ্রমুক্ত অন্তরে আপনাদিগের দিব্য জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল; এবং তখনই সাধক ঈশ্বরের আলোকে অন্তরে শত শত যোগী ঋষিদিগের আশ্রম এবং সাধু ভক্তদিগের প্রেম-নিকেতন দেখিতে পাইলেন।

ব্রহ্মবাণীতে এইরূপে জীবের পরিত্রাণ হয়। ব্রহ্মবাণী ভিন্ন জীবোদ্ধারের অন্য উপায় নাই। ব্রহ্মবাণীর মৃত-সঞ্জীবনী শক্তিতে অচেতন মৃতপ্রায় আত্মা নবজীবন লাভ করে, নিতান্ত বিকৃত হৃদয় সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়। এই ব্রহ্মবাণী এক এক মহাসাধককে এবং এক এক প্রকাণ্ড জাতিকে অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে, এবং মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যায়। ব্রহ্মবাণী ভিন্ন স্বর্গে যাইবার, সত্য লোকে যাইবার অন্য পথ নাই। ব্রহ্মের এক এক প্রকাণ্ড হুঙ্কার ধ্বনি আসিয়া নিদ্রিত পাপীকে জাগ্রৎ করে। সেই যে প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, যোহন, দেশে দেশে বলিয়া বেড়াইতেন, "অনুতাপ কর, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী।" সেই যোহনের কথার মধ্যে ব্রহ্ম শব্দ লুকায়িত ছিল। এখনও সেই এক পুরাতনব্রহ্ম প্রত্যেক পাপীকে বলিতেছেন "অনুতাপ কর।"

অনবরত ব্রহ্মের এই শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, যখনই পাপী নিদ্রায় অচেতন হয় তখনই সেই শব্দ তাহার মাথার কেশ ধরিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করে। "পাপী, অনুতাপ কর।" ব্রহ্মের প্রমুখাৎ যখনই পাপী এই কথা শুনিল

তখনই তাহার শরীর মন জাগিয়া উঠিল ; এবং তাহার অন্তরে গূঢ়তম স্থানে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল, তাহার অন্ধকারময় হৃদয়ের মধ্যে নূতন আলোক, নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই যে বিস্তীর্ণ সৃষ্টির ব্যাপার দেখিতেছি ইহা ব্রহ্ম শব্দের কীর্ত্তি। সৃষ্টির আদিতেও এই শব্দ ছিল, এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এই শব্দ নানা দেশে নানাবিধ ব্যাপার সম্পাদন করিতেছে। অতএব হে ব্রহ্মভক্ত, তোমাকে বিনীত ভাবে বলিতেছি, তুমি শব্দকে অবহেলা করিও না, শব্দকে ব্রহ্ম মনে করিয়া শব্দের যথোপযুক্ত সমাদর কর।

এই শব্দ হইতে জগৎ জীব, তন্ত্র মন্ত্র, বিধি বিধান, ধন ধান্য, গতি মুক্তি সমস্ত বাহির হইতেছে। ব্রহ্মমুখ হইতে শব্দ বাহির হইল। সেই শব্দ একটী প্রকাণ্ড তেজরূপে গড়াইতে গড়াইতে অসীম আকাশে বিস্তৃত হইয়া অসংখ্য অগণ্য রাজ্য স্থাপিত করিল, বিচিত্র অদ্ভুত পদার্থ সকল রচনা করিল, নানা প্রকার জীব জন্তু সৃষ্টি করিল, এবং সেই শব্দ এখনও আপনার কার্য্য করিতেছে। সেই শব্দের বিশ্রাম নাই। সেই শব্দ যেমন সকলকে সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনি তাহা সকলকে রক্ষা করিতেছে। এই শব্দ যেখানে যাহা আবশ্যক সেখানে তাহাই স্থাপন করিয়াছে। এই শব্দই এখানে সূর্য্য, ওখানে চন্দ্র ; এখানে পর্ব্বত ওখানে সমুদ্র ; এখানে যোগী, ওখানে ভক্ত ; এখানে পুরুষ, ওখানে স্ত্রী ; এখানে শাক্য গৌর ; ওখানে মুসা ঈশা ; এখানে বেদ

পুরাণ; ওখানে বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োজনীয় বস্তু সকল যথাস্থানে স্থাপন করিয়াছে। হে ব্রহ্মশব্দ, ধন্য তুমি! কেন না 'এই বিশ্বমাঝে, যেখানে যা সাজে, তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।'

একই ব্রহ্মশব্দ অভাব অনুসারে নানা স্থানে ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই নিঃশব্দ শব্দ তোমার আমার সকলের কাছে আসিতেছে। এই ব্রহ্মশব্দ জীবের অবস্থা ভেদে কখনও বিশ্বরাজের মুখবিনিঃসৃত গম্ভীর অনুজ্ঞারূপে, কখন স্নেহময়ী জগজ্জননীর মুখবিনিঃসৃত সুমিষ্ট বচনরূপে প্রকাশিত হইতেছে। এই শব্দ কাহাকেও গম্ভীর ধ্বনিতে বলিতেছে, "রে মূঢ় পাপাচারী, পাপাসক্তি ছাড়্, অনুতাপ কর, কুসঙ্গ ছাড়িয়া সৎসঙ্গ কর, সংসারের দাসত্ব ছাড়িয়া ব্রহ্ম পূজা ব্রহ্ম সেবায় নিযুক্ত হও।" এই শব্দ কাহাকেও বলিতেছে "স্ত্রী পরিবার রাজত্ব ঐশ্বর্য্য, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল গহন কাননে বৃক্ষতলে বসিয়া ঘোর তপস্যা ও ধ্যান সমাধি সাধন কর।

এই জীবন্ত শব্দ আর একজনকে বলিতেছে "হে প্রমত্ত প্রেমিক, গৃহ পরিবার ছাড়িয়া তুমি প্রেমোন্মত্ত হইয়া দেশ দেশান্তরে হরিনাম প্রচার কর।" এই তেজোময় শব্দ আর একজনকে বলিতেছে "বৎস, তুমি পিতা মাতা ভাই বন্ধু সকলের স্নেহ বন্ধন ছেদন করিয়া নববিধানের শরণাগত হও।" এই জ্বলন্ত অগ্নিময় শব্দ তোমাকে আমাকে বলিতেছে

"ঈশার ন্যায় ব্রহ্মসর্ব্বস্ব হও, শাক্যসিংহের ন্যায় বৈরাগী হও, মহম্মদের ন্যায় দুর্জ্জয় বিশ্বাসী হও, গৌরাঙ্গের ন্যায় প্রমত্ত প্রেমিক হও, প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের ন্যায় যোগ ধ্যানপরায়ণ হও ও জনকের ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হও।"

বাস্তবিক যেমন নামেতে ব্রহ্মেতে অভেদ তেমনি শব্দেতে এবং তাঁহাতে অভেদ। যিনি ব্রহ্ম তিনি শব্দ। তিনি এবং শব্দ এক। ঐ আকাশে যেমন মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, তেমনি চিদাকাশে নিঃশব্দভাবে ব্রহ্ম ডাকিতেছেন। হে নববিধানের সাধকগণ, ঐ শুন ঘোর বজ্রধ্বনিতে ব্রহ্মশব্দ আসিতেছে, ঐ শব্দ কখন কাহাকে কি বলিবে কেহ জানে না। ঐ শব্দ শুনিয়া জীবন পথে চলিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হও। ঐ শব্দানুসারে না চলিলে কেহই স্বর্গের দিকে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে না। ঐ শব্দ আমাদের প্রতিজনের জীবন দাতা এবং ঐ শব্দ আমাদের প্রত্যেকের অনন্ত জীবনের হেতু। ঐ শব্দ অগ্রাহ্য করিয়া কেহই অমরত্বের অধিকারী হইতে পারে না। এস, আমরা সকলে নিজের ইচ্ছা অথবা নিজের কথা পরিহার করিয়া ঐ ব্রহ্ম বাক্যের অনুসরণ করি; নিজের বুদ্ধি ছাড়িয়া ব্রহ্মজ্ঞানালোক দেখিয়া চলি। হে শব্দ-ব্রহ্ম, হে বাণীব্রহ্ম, পৃথিবীতে তোমার জয় হউক! চারি-দিকে তোমার রাজ্য বিস্তৃত হউক!

মন্ত্র এবং ব্রত।

রবিবার ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক; ২২শে মে ১৮৮১।

যে রাজ্যে শব্দপূজা হয়, যে রাজ্যে অশব্দ ঈশ্বর শব্দব্রহ্মরূপে অর্চিত হন সেই রাজ্যে মন্ত্র এবং ব্রতের অত্যন্ত আদর। শব্দকে যাহারা বিদ্রূপ ও পরিহাস করে তাহারা স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপন ইচ্ছাতে ধর্ম্মসাধন করে। যেখানে শব্দব্রহ্মের আদর, যেখানে ব্রহ্মশব্দ অথবা ব্রহ্মের আদেশের প্রতি অনুরাগ সেখানে নিয়ম, ব্রত, মন্ত্র এবং সাধন প্রণালীর প্রাদুর্ভাব। যেখানে শব্দশ্রবণ নাই, যেখানে প্রভুর আদেশের প্রতি নির্ভর নাই সেখানে লোকেরা আপন ইচ্ছানুসারে, আপন বুদ্ধিমত আপনাদিগের চরিত্র ও ধর্ম্ম জীবন গঠন করে। তাহারা স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পায় না, ঈশ্বরবাণী শুনিতে পায় না, তাহারা মনে করে তাহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুযায়ী ধর্ম্মসাধন দ্বারা পবিত্র হইবে ও পরিত্রাণ লাভ করিবে। ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে তাহারা আপনাদিগকে আপনাদিগের পরিত্রাতা পদে প্রতিষ্ঠিত করে। তাহারা ঈশ্বরবাণীর অপেক্ষা করে না। কিন্তু এই জ্ঞান, এই স্বেচ্ছাচার জীবের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর কারণ।

তোমরা ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছ ব্রহ্মশব্দ যেমন আমাদিগের স্রষ্টা ও জীবনদাতা তেমনই ইহা আমাদিগের অনন্ত জীবনের হেতু। সুতরাং এই ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ এবং সাধন ভিন্ন কেহই

প্রকৃতরূপে অমৃতত্ব আস্বাদন করিতে পারে না। যাহারা এই ব্রহ্মশব্দ না শুনিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে ধর্ম্মসাধন কিম্বা কঠোর তপস্যাও করে তাহারা আত্মার প্রকৃত জীবন ভোগ করিতে পারে না। কেন না ব্রহ্মশব্দই সৃষ্ট আত্মার পক্ষে একমাত্র অমৃত এবং পূর্ণ জীবন। যাহারা সেই অমৃত পান করিল না তাহারা কিরূপে প্রকৃত জীবন লাভ করিবে? অতএব হে মানব, যদি তুমি যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছ বিশ্বাস কর তবে তোমার জীবনের প্রত্যেক ক্রিয়াতে দেখাও যে ব্রহ্মশব্দ তোমাকে পরিচালিত করিয়াছে। হইলেই বা তুমি ব্রহ্মজ্ঞানী; কিন্তু তুমি যে ব্রহ্মবাণী দ্বারা পরিচালিত তাহার প্রমাণ কি? তোমার তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ কি? ঈশ্বর মুখের বাণী কি তোমার বেদ? না তুমি আপনার বুদ্ধি অনুসারে কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া বলিতেছ, এই আমার ধর্ম্মশাস্ত্র, এই আমার তন্ত্র মন্ত্র, এই আমার বেদ পুরাণ? তোমার শাস্ত্রের প্রমাণ কি?

হে ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানী, যদি তোমার শাস্ত্র, ব্রহ্মোপাসনা এবং রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার ব্রহ্মশব্দ দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত না হয় তবে তোমার ধর্ম্মকে স্পর্শ করা উচিত নহে। এই নিত্য জীবন্ত ঈশ্বরের নববিধানের সময় তোমার আমার ধর্ম্মকে অথবা মানুষের বুদ্ধিরচিত ধর্ম্মকে আমরা বড় মনে করিতে পারি না। আমরা ব্রহ্মের নিত্য প্রত্যাদেশের পক্ষপাতী, আমরা আদেশবাদী, আমরা ব্রহ্মশব্দ বিশ্বাসী।

যাহাতে ব্রহ্মবাণীর প্রমাণ নাই তাহাকে আমরা কদাচ সত্যধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

যে শব্দ ঘোরান্ধকার মধ্যে বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিল, যে শব্দ ডুবরি হইয়া অকূল অতলস্পর্শ অনন্ত আকাশসমুদ্রের ভিতর হইতে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি মহারত্ন সকল উদ্ধার করিল, যে শব্দ তোমাকে আমাকে এবং সকলকে জীবন, জ্ঞান, পুণ্য শান্তি দান করিতেছে, দেখাও হে ব্রহ্মভক্ত, যে সেই শব্দ তোমাকে আজ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার সমুদয় কার্য্যে পরিচালিত করিতেছে। দেখাও যে তোমার সমুদয় চিন্তা, সমুদয় বাক্য, সমুদয় কার্য্য সেই ব্রহ্মশব্দের অনুসরণ করিতেছে। দেখাও যে তোমার উচ্চারিত প্রত্যেক হলবর্ণ ও স্বরবর্ণ ব্রহ্মশব্দ।

যেখানে ব্রহ্মশব্দ আসিয়া উপস্থিত সেখানে মানুষ নীরব, সেখানে জীবের মৌনাবলম্বনই ধর্ম্ম। যেখানে ব্রহ্মের ঝড় বহিতেছে সেখানে আর মানুষের বক্তৃতা নাই। স্বয়ং ব্রহ্ম ভক্তের হৃদয় মধ্যে থাকিয়া কথা বলিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন. আর সহস্রাধিক শ্রোতা শ্রবণ করিতেছে। প্রণালী কি? ভক্তের রসনা। ভক্ত নিজে চুপ স্থির একেবারে নিঃশব্দ থাকেন। হে ব্রহ্মসাধক, তুমি নিজে যত নীরব হইবে ততই তোমার হৃদয় ও রসনাকে যন্ত্র করিয়া ব্রহ্ম কথা কহিবেন। হে বক্তা, যখনই তুমি আপনার মত চালাইতে যাইবে তখনই ব্রহ্মবাণী বন্ধ হইবে।

যিনি প্রকৃতরূপে ব্রহ্মশব্দকে জানেন, ব্রহ্মশব্দের আদর করেন, তিনি নিজে একটী ক্ষুদ্র বর্ণও উচ্চারণ করেন না। ব্রহ্মশব্দ হইতেছে, ব্রহ্মঝড় বহিতেছে তাঁহার ভিতরে যদি কেহ একটী "ক" উচ্চারণ করে তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মশব্দস্রোত অবরুদ্ধ হইবে। হে অনুতপ্ত পাপী, ব্রহ্মশব্দরূপ ঝড় আসিয়া তোমার সমস্ত জীবনের অপবিত্রতা উড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় তুমি হঠাৎ কেন আপনার কথা বলিয়া ফেলিলে, যদি বাঁচিতে চাও তবে মৌনী হইয়া আবার অনুতাপ কর।

যখন ব্রহ্ম কথা কহিতে থাকেন তখন কোন ভক্ত নিজে কথা কহেন না, ভক্ত চুপ করিয়া থাকেন। ভক্তের হৃদয়ে যখনই প্রত্যাদেশ বায়ু বহিতে থাকে, ভক্ত তখনই স্বর্গের ইঙ্গিত বুঝিতে পারেন; ব্রহ্মবাণীর বাতাস উঠিল, বক্তার মুখে আর কথা নাই। যখন ব্রহ্মশব্দরূপ পবন বহিতে লাগিল তখন ভক্ত বলিলেন "হে শব্দ, তব পাদপদ্মে আমার এই রসনা উৎসর্গিত হইল।" যখনই ভক্ত ঈশ্বরের হস্তে আপনার রসনা উৎসর্গ করিলেন তৎক্ষণাৎ মৃত জড় রসনা ভয়ানক দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় দৌড়িতে লাগিল, এবং নূতন নূতন জীবন্ত সত্য সকল বলিতে লাগিল। শব্দব্রহ্ম, চিন্ময়ী বাগ্দেবী সরস্বতী স্বয়ং ভক্তের রসনায় আবির্ভূত।

যখন ভক্তের রসনায় ব্রহ্মশব্দ নির্গত হয়, সেই শব্দের তেজ মৃত ব্যক্তিকে নবজীবন দান করে, অসাধুকে সাধু করে।

বিকৃত মানব সমাজকে শাসন ও সংশোধন করিবার জন্য ভক্তের মুখ দিয়া ব্রহ্মশব্দ বিনির্গত হয়। এই শব্দকে অবহেলা করিয়া কেহই শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই শব্দ যদি ঘোর দ্বিপ্রহর রজনীতে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী রাজাকে বলে, "হে রাজন, তুমি স্ত্রী পুত্র, এবং সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া এক বৎসর কাল কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হও।" সেই রাজাকে তৎক্ষণাৎ ঐ শব্দের অনুগত হইতে হইবে।

ব্রহ্ম শব্দের বিশ্রাম নাই, নিরন্তর ব্রহ্মমুখ হইতে তাঁহার প্রেমধ্বনি উঠিতেছে, কেবল তাঁহার অনুরাগী ভক্তগণ সেই ধ্বনি শুনিতে পান। "বাজে ভেরী অনাহত শুনে প্রেমিক যে জন।" প্রেমিকেরা ব্রহ্মের আহ্বান, ব্রহ্মের ডাক অথবা ব্রহ্মবাণী শুনিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট জীবন পথে চলিতেছেন। সর্ব্বান্তঃকরণে অনুরাগী না হইলে কেহ এই ব্রহ্মশব্দ শ্রবণ ও সাধন করিতে পারে না। যেমন আকাশে মেঘ ঘনীভূত হইয়া শিলা বৃষ্টি অথবা হিমানী খণ্ডের আকার ধারণ করে, সেইরূপ ব্রহ্মবাণী ভক্তের চিদাকাশে ঘনীভূত হইয়া এক একটী মন্ত্রের আকার ধারণ করে।

ব্রহ্ম যে সাধককে তাঁহার সত্তা সাধন ব্রতে ব্রতী করিবেন মনে করেন, তাহার বিশ্বাস কর্ণে তিনি "আমি আছি" এই গম্ভীর মন্ত্র প্রদান করেন। অল্প বিশ্বাসী এবং ক্ষীণ বিবেকী ব্রহ্মবাণী শুনিতে পায় না, তাহার নিকটে শব্দের আদর নাই।

সে মনে করে শব্দ অথবা মন্ত্রের শক্তিতে বিশ্বাস করা কুসংস্কার। আমরা নববিধানাশ্রিত হইয়া বলিতেছি শব্দই মুক্তির হেতু।" "আমি আছি" যিনি বলিতেছেন তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম। "আমি আছি" এই গম্ভীর শব্দ ব্রহ্মমুখ বিনিঃসৃত মন্ত্র।

ব্রহ্মমুখের বাণী অথবা ব্রহ্মমুখ-বিনিঃসৃত মন্ত্র নির্জীব দুর্ব্বল মনে জীবন ও বল দান করে, মূঢ় অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনে জ্ঞান চৈতন্য দান করে, অপবিত্র অন্তঃকরণে পবিত্রতা আনিয়া দেয় এবং বিষন্ন চিত্তকে প্রসন্ন করে। ব্রহ্মপ্রদত্ত মন্ত্র সাধকের বিশ্বাস, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেমভক্তি, ক্ষমা শান্তি বৃদ্ধি করে, নিত্য নব নব ভাব উদ্দীপন করে। সাধকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের প্রয়োজন। অনুতাপের অবস্থাতে "পতিতপাবন, অধমতারণ, পাপসন্তাপহরণ" ব্রহ্মের এ সকল নামমন্ত্র সাধকের পক্ষে বিশেষ কল্যাণদায়ক; উচ্চতর নির্ম্মলতার অবস্থায় "ভক্তচিত্তহারী, ভক্তমনোহরা, সাধুজননী, জগন্মোহিনী জগজ্জননী" এ সকল মন্ত্র বিশেষ প্রীতিকর ও আনন্দ প্রবর্দ্ধক।

এইরূপে সাধকের অবস্থানুসারে ব্রহ্মের বিভিন্ন স্বরূপ, শব্দ, নাম অথবা মন্ত্র সাধন আবশ্যক। পূর্ণ পরব্রহ্মেতে কোন পরিবর্ত্তন কিম্বা অবস্থান্তর নাই; কিন্তু অপূর্ণ উন্নতিশীল জীবাত্মাতে নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। অপূর্ণ জীব একেবারে পূর্ণ ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারে না, এই জন্য তাহার পক্ষে সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র সাধন প্রয়োজন। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর

এই প্রয়োজন জানিয়াই সাধককে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপযুক্ত মন্ত্র সকল দান করেন।

হে অল্প বিশ্বাসী, তুমি যদি বল যে তুমি শব্দ মন্ত্র কিছুই মান না, যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মাধীন নহ, তুমি স্বেচ্ছাচারী। যাহারা বলে স্বাধীন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে বদ্ধ হইবে কেন তাহারা ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতা এবং ধর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব জানে না। যাঁহারা প্রকৃত সাধক তাঁহারা শব্দব্রহ্মকে মানেন, তাঁহারা ব্রহ্মশব্দের আদর করেন, ব্রহ্মশব্দ সাধন করেন। "আমি আছি" ব্রহ্ম গম্ভীর ধ্বনিতে যে অনন্তকাল নিরন্তর এই নিঃশব্দ শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন, তাঁহারা কি দিনে কি নিশীথে এই শব্দ শ্রবণ করেন, এই শব্দ সাধন করেন। "আমি আছি" এই নিত্য গম্ভীর ধ্বনি ঈশ্বরের নাম। সাধক এই নাম ধরিয়া ডাকিলেই প্রকৃত ঈশ্বরদর্শন লাভ করেন।

ঈশ্বরের কোন নাম এবং কোন শব্দ অর্থ শূন্য নহে। যাঁহার নাম "আমি আছি" তিনিই নববিধানের দয়াসিন্ধু পতিতপাবন বিধাতা, তাঁহারই অপর নাম ভক্তহৃদয়বিহারিণী জগজ্জননী। যেমন ঈশ্বরের এক এক নাম বারম্বার উচ্চারণ ও সাধন করিতে করিতে সেই নামের অন্তর্গত ভাব সাধকের হৃদয়ে উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত ও দৃঢ়তররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সেইরূপ, "নববিধান নববিধান" এইরূপ বারম্বার বলিতে বলিতে আমরা নববিধানের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি এবং উহার

সুধা পান করিতে পারি। নববিধান শব্দটী পুণ্যপ্রদ। যদিও শব্দ অথবা মন্ত্রের নিজের জীবন নাই; কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যে মন্ত্র সাধন দ্বারা আমরা পরিত্রাণ এবং দিব্য জীবন লাভ করি।

প্রত্যেক ব্রহ্মশব্দ অথবা ব্রহ্মমন্ত্রের মধ্যে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, সুখ শান্তি ঘনীভূত হইয়া স্থিতি করে। কথিত আছে যখন মুসা পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিলেন তখন ঘোর ঘটা করিয়া মেঘ সকল আসিয়া চারিদিক ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিল, এবং বারম্বার বিদ্যুতাগ্নি প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেইরূপ যখন সাধকের জীবনে এক একবার ভয়ানক বিপদ পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে বিপদভঞ্জন হরি সেই বিপন্ন সাধকের কর্ণে এক এক শব্দ অথবা এক এক মন্ত্র উচ্চারণ করেন। সেই মন্ত্রে পাপ যায়, ঘুম ভাঙ্গে। সেই মন্ত্রে সাধকের অশেষ উপকার হয়; সেই মন্ত্রে দুর্ব্বলতার মধ্যে বল, এবং পাপ দুর্গন্ধের মধ্যে পুণ্যের সৌরভ প্রকাশিত হয়। সেই মন্ত্র সাধন করিলে উজ্জ্বলতররূপে ব্রহ্ম দর্শন এবং মুহুর্মুহুঃ ভক্তির উচ্ছ্বাস হয়।

হরিনামের কত গুণ, হরিনাম মন্ত্রের কত মহিমা তোমরা অনেকেই জানিয়াছ। পথে পথে, দ্বারে দ্বারে, হরি হরি, শ্রীহরি, মনোহর হরি, সচ্চিদানন্দ হরি বলিলে মন উন্নত হয়, মৃত সঞ্জীবিত হয়, দুর্ব্বল সবল হয়, অপবিত্র পবিত্র হয়, দুঃখী সুখী হয়, পাড়া মাতিয়া উঠে, বালক বৃদ্ধ যুবা নরনারী সকলে আনন্দিত হয়। মন্ত্রের এত গুণ, ব্রহ্মশব্দের এত মাহাত্ম্য!

দৃঢ়তা এবং অধ্যবসায়ের সহিত নির্দ্দিষ্ট কাল ব্রহ্ম আদেশ সাধনই ব্রত। ব্রত বিনা জীবন সুস্থির হইতে পারে না। ব্রত বিনা আজ এই মত ধরিলে কাল ঐ মত ধরিলে, এবং এইরূপে ক্রমশঃ অস্থিরতার মধ্যে চলিলে।

স্বেচ্ছাচারীর দর্পচূর্ণ করিবার জন্য ব্রত একান্ত আবশ্যক। সত্যকথনব্রত, বিদ্যাদানব্রত, দয়াব্রত, পশুসেবাব্রত, ক্ষমাব্রত, রিপুসংহারব্রত, বৈরাগ্যব্রত, যোগব্রত, ভক্তিব্রত, সেবাব্রত, এ সমস্ত ব্রতই ব্রহ্মবাণী অথবা ব্রহ্ম আদেশ। যেমন ব্রহ্মেতে এবং মন্ত্রেতে কোন প্রভেদ নাই, তেমনি ব্রহ্মেতে ও ব্রতেতে কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মই ব্রত। যিনি আদেশ করেন সেই প্রভু কিম্বা কর্ত্তার সঙ্গে তাঁহার আদেশের কোন প্রভেদ নাই। সেইরূপ ব্রত ও মন্ত্র দাতা গুরু ব্রহ্মের সঙ্গে মন্ত্র ও ব্রতের প্রভেদ নাই। অতএব হে স্বেচ্ছাচারী মানব, তুমি আপনার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্র ও ব্রতের পথ গ্রহণ কর। এই পথ গ্রহণ না করিলে কখন জীবন পবিত্র হইবে না। ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও শাসন ব্রতের আকারে উপস্থিত হয়, ব্রতের সমস্ত নিয়ম ব্রহ্মমুখবিনিঃসৃত।

হে সাধক, এক সপ্তাহ তুমি এই ব্রত নিয়ম পালন করিবে, ইহার অর্থ এই যে এক সপ্তাহ ব্রহ্মের কৃপা পবন বিশেষরূপে তোমার মস্তকের উপর দিয়া বহিবে। সত্য পালন করিবে, ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, বিনয়ী ও দয়ার্দ্র হইবে, ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ করিবে, রিপু সংহার এবং

ইন্দ্রিয় জয় করিবে, বৃহৎ ব্রতধারী হইয়া সংসার জয় করিয়া ব্রহ্মবান হইবে, এ সকল আদেশপূর্ণ প্রত্যেক ব্রত জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জড়তা আলস্য দূর করে এবং বিকৃত আত্মাকেও সংশোধিত প্রকৃতিস্থ করিয়া ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী করে। ব্রহ্মপ্রদত্ত প্রত্যেক ব্রত জীবের কল্যাণপ্রদ। অতএব ব্রহ্ম যে শাসনে আমাকে রাখিতে চাহেন আমি সেই শাসনে শাসিত হইব। তিনি আমাকে যে মন্ত্র, যে ব্রত দেন তাহাই আমি সাধন করিব।

স্বেচ্ছাচারী নির্ব্বোধ মনুষ্য জানে না ব্রত মন্ত্রের কত গুণ। ব্রহ্মজ্ঞ এবং ব্রহ্মানুগত ব্যক্তি বুঝিতে পারেন কোন্ মন্ত্র তাঁহার পক্ষে কখন আবশ্যক, তিনি বুঝিতে পারেন এই মন্ত্র, এই শাসন আমার জন্য, এই ব্রতের আকারে আমার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ আদেশ আসিয়াছে। যাঁহারা এইরূপ ব্রত পালন করেন তাঁহারা নানা প্রকার প্রলোভন ও পাপের ব্যভিচার হইতে মুক্ত থাকিয়া অনায়াসে ভবসাগর পার হইয়া ঈশ্বরের শান্তি নিকেতনে চলিয়া যান। যাহারা মন্ত্র ব্রত মানে না তাহাদের দেবতা মৃত। কেন না যে ঠাকুর কথা কহে না, যে মা কোলে এস বলে না, সে ঠাকুর কি জীবন্ত ঈশ্বর, সে মা কি দয়াময়ী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী? যে দেবতা সহস্র প্রার্থনারও একটী উত্তর দিতে পারে না, যাহার একটী মন্ত্র দিবারও ক্ষমতা নাই সেটা মৃত নিদ্রিত অপদার্থ। যদি ব্রহ্ম কথা না কহেন, যদি অবস্থানুসারে ব্রহ্ম উপযুক্ত মন্ত্র না দেন

তবে হে সাধক, তুমি কিরূপে বাঁচিবে? আমার সঙ্গে যিনি কথা কহেন, যিনি আমার কথার উত্তর দেন, যিনি দুর্ব্বলতার সময় বল দেন, পাপবিকারের ঔষধ দেন, দুঃখের সময় সান্ত্বনা এবং প্রাণ ভরিয়া সুখ শান্তি দেন তিনিই আমার বন্ধু, তিনিই আমার জীবনদায়িনী মাতা।

দুই পক্ষী।

রবিবার ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক; ২৯শে মে ১৮৮১।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥

বেদান্ত মধ্যে দুই সুন্দর পক্ষীর কথা বোধ হয় অনেকে শুনিয়াছেন। একটী নয়, দুইটী পক্ষী। "দ্বা সুপর্ণা।" অদ্বৈত নয়, দ্বৈত। দুই পক্ষী একত্র হইয়া এক বৃক্ষে স্থিতি করে। দুই পক্ষী পরস্পরের সখা; কিন্তু তাহাদের অবস্থা ভিন্ন। এক পক্ষী সৃষ্ট, আর এক পক্ষী স্রষ্টা; এক পক্ষী ক্ষুদ্র, অপর পক্ষী বৃহৎ ও অনন্ত; এক পক্ষী দয়ার পাত্র, অপর পক্ষী অনন্ত দয়ার সাগর; এক পক্ষী ফল ভোগ করে, অপর পক্ষী ফলপ্রদাতা। এই দুই সুন্দর পক্ষীর কথা অতি সুন্দর, বিজ্ঞান অতি মনোহর। অতএব হে ব্রহ্মভক্তগণ, স্থির হইয়া তোমরা এই দুই সুন্দর পক্ষীর তত্ত্ব শ্রবণ কর। প্রথমে মত শ্রবণ কর, পরে সাধন প্রণালী শুনিবে।

হে বিশ্বাসী, তোমার এই দেহ মধ্যে দুইটী পাখী একত্রে সুখে বাস করে। তুমি জ্ঞান দ্বারা এই তত্ত্ব স্বীকার কর। তোমার এই দেহ একটী বৃক্ষ, এই বৃক্ষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। এই দেহবৃক্ষ সাকার; কিন্তু ইহার ডালে দুটী নিরাকার পক্ষী বসিয়া আছে। বাসগৃহ সাকার; কিন্তু অধিবাসীদ্বয় নিরাকার। হে ভ্রান্ত মনুষ্য, তুমি মনে কর তোমার দেহবৃক্ষে কেবল একাকী তুমি বাস কর; কিন্তু তোমার পার্শ্বে যে অপর একটী বৃহৎ পক্ষী বসিয়া আছে তুমি তাহাকে দেখ না।

হে আত্মন্, সর্ব্বদা তুমি আমি আমি বল কেন? তুমি কি আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিয়াছ না আপনাকে আপনি জীবিত রাখিতে পার? তোমার স্রষ্টা এবং তোমার প্রতিপালক যে তোমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তাঁহার শক্তি ভিন্ন যে তুমি কিছুই করিতে পার না। তবে কেন 'আমি আহার করি, আমি চিন্তা করি, আমি দয়া করি, আমি ধর্ম্মসাধন করি' এ সকল কথা বলিয়া বৃথা অভিমান কর? যখন ঈশ্বর ভিন্ন তুমি নিমেষের জন্যও বাঁচিতে পার না তখন আমির পরিবর্ত্তে আমরা বল না কেন? প্রাচীন যোগী ঋষি এবং শাস্ত্রকারেরা দুই পক্ষীর কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব হে ব্রহ্মজ্ঞগণ, তোমরা সকলেই আমির পরিবর্ত্তে আমরা, তুমির পরিবর্ত্তে তোমরা, তিনির পরিবর্ত্তে তাঁহারা, এই ভাষা ব্যবহার কর।

এক দেহবৃক্ষ দুটী পাখীর বাসস্থান। প্রত্যেক দেহ পিঞ্জরে যুগল পক্ষী বিহার করিতেছে। আমরা দুটী পাখী, তোমরা দুটী পাখী, তাঁহারা দুটী পাখী। প্রত্যেক নরদেহে প্রত্যেক নারীদেহে দুই আত্মা বাস করিতেছে। একটীর আগে 'জীব' শব্দ অর্থাৎ একটী জীবাত্মা, অপরটীর আগে 'পরম' বিশেষণ অর্থাৎ অপরটী পরমাত্মা। জীবাত্মার কতক-গুলি লক্ষণ আছে যাহা পরমাত্মাতে নাই এবং পরমাত্মার অনেকগুলি গুণ আছে, যাহা জীবাত্মাতে নাই। এই জন্য উভয়ের স্বতন্ত্র বিশেষণ হইয়াছে। কিন্তু দুটীই অতি সুন্দর, লাবণ্যযুক্ত, মনোহর। যদিও দুটীর মধ্যে কোনটীরই আকার নাই; কিন্তু নিরাকার হইয়াও উভয়েই অশেষ সৌন্দর্য্য ও গুণশালী।

হে মানব, তুমি যাহাকে আমি বলিতেছ এই আমিকে কাটিলে দুটী সুন্দর পাখী বাহির হইবে; একটী তুমি, অপরটী তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক স্বয়ং ঈশ্বর। তোমার এই দেহের অধিকারী স্বামী কেবল তুমি নহ। তুমি যাহাকে তোমার দেহ, মন, হৃদয় আত্মা বলিতেছ, সেই দেহ, মন, হৃদয় আত্মার অধিকারী তুমি এবং তোমার ঈশ্বর। প্রত্যেক আমিকে খণ্ড খণ্ড করিলে তাহার ভিতর হইতে এইরূপ দুই আমি বাহির হইবে; এক জীব আমি, আর এক পরম আমি; এক সৃষ্ট আত্মা আর এক স্রষ্টা অথবা পরমাত্মা। এক আমির ভিতরে দুই অতীন্দ্রিয় আত্মা। এক আধারে

দুই অদৃশ্য আধেয়। একাধারে, এক গাছে, এক শরীরে এই দুই নিরাকার পক্ষী, দুই সুন্দর আত্মা নিয়ত বাস করিতেছে। হে মনুষ্য, তোমার দেহবৃক্ষে নিত্য দুই পাখী স্থিতি করিতেছে; এক পাখী তুমি, আর এক আকাশরূপ বৃহৎপক্ষী অর্থাৎ ব্রহ্মপক্ষী। এই দুই সুন্দর পক্ষীর বিষয় যত ভাবিবে, এই দুই সুন্দর পক্ষীকে যত দেখিবে ততই তুমি দিব্যজ্ঞান লাভ করিবে, ততই তোমার ব্রহ্মজ্ঞান পরিষ্কার হইবে।

হে জীব, হে সাধক, যতই তুমি এই কথা ভাবিবে, যতই তুমি এই গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা করিবে, যে তুমি এবং ব্রহ্মপক্ষী এক দেহবৃক্ষে বাস করিতেছ, একত্র কার্য্য করিতেছ, একত্র কথা বলিতেছ, একত্র ভাবিতেছ, একত্র হইয়া জগতে দয়া বিস্তার এবং ধর্ম্ম প্রচার করিতেছ, ততই তুমি উন্নত, শুদ্ধ এবং সুখী হইবে। ব্রহ্মপক্ষী এবং আমি এই আমরা দুই জন একত্র থাকি, একত্র কার্য্য করি, এ চিন্তা স্বর্গীয় চিন্তা, এ চিন্তা নবজীবনের হেতু এবং পরিত্রাণপ্রদ। ব্রহ্মবিশ্বাসী এবং ব্রহ্মভক্ত বলেন যখনই আমি আমার দেহবৃক্ষের দিকে তাকাই তখনই দেখি দুটী স্বর্গের পাখী একত্র বসিয়া আছে; একটী ছোট, একটী বড়। এই দুই স্বর্গের পক্ষীকে একত্র দেখিলে যথার্থ ব্রহ্মদর্শন হয় এবং ব্রহ্মানন্দ লাভও হয়।

হে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, যখনই তুমি তোমার দেহবৃক্ষে জীবাত্মাকে দেখিবে তখনই তুমি তাহার অব্যবহিত

পার্শ্বে পরমাত্মাকে দেখিতে পাইবে। পরমাত্মা চিরকাল অনশন ব্রতধারী, তিনি আহার করেন না, তিনি মহাযোগী, চিরনিস্তব্ধ, নিত্য ধ্যানশীল; তাঁহার আলস্য নাই, তিনি নিদ্রা যান না; অনন্তকালের পক্ষী, স্রষ্টা পক্ষীর কোন প্রকার ভোগবাসনা নাই, তিনি চিরবৈরাগী, তিনি পরম বৈরাগী; কিন্তু সৃষ্টপক্ষী স্রষ্টা পক্ষী হইতে নানা প্রকার ফল এবং প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল লাভ করিতেছে, সে সকল ভোগ করিতেছে, ক্ষুদ্র সৃষ্ট পক্ষী কখনও মনের আনন্দে স্রষ্টাপক্ষীর গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, কখনও অলস হইতেছে: কখনও জাগ্রৎভাবে ব্রহ্মধ্যান করিতেছে, কখনও নিদ্রার অচেতন হইয়া পড়িতেছে। হে ব্রহ্মজ্ঞ, তুমি এই যুগল পক্ষীতত্ত্ব স্মরণ করিয়া রাখ। যাহাকে তুমি আমি বলিতেছ এই আমির মধ্যে দুই আমি স্থিতি করিতেছে; এক ছোট আমি, আর এক বড় আমি: এক 'জীব' আমি আর এক 'পরম' আমি। শাস্ত্রেতে এই যুগল পক্ষীর প্রমাণ পাইলে, এবং দিব্য জ্ঞানে ইহা বুঝিলে। এই নিগূঢ় দ্বৈততত্ত্ব জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিলে, এখন ইচ্ছা সাধন প্রণালী অবধারণ কর।

আমি দুই, আমার এই দেহবৃক্ষে আমি একাকী বাস করিতেছি না; কিন্তু আমি এবং আমার স্রষ্টা ও প্রতিপালক একত্র বাস করিতেছি,—বারম্বার স্মৃতি ও চিন্তা দ্বারা এই নবজীবনপ্রদ সত্য অন্তরে আয়ত্ত কর এবং বিশেষ যত্নপূর্ব্বক ইহা জীবনে পরিণত কর। কখন আপনাকে ঈশ্বরবিহীন

মনে করিবে না। আমি কর্ত্তা, আমি প্রভু, আমি স্বামী কদাপি মনের মধ্যে এই বিষাক্ত অহঙ্কার পোষণ করিবে না; কিন্তু নিয়মিত সাধন দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বমূলাধার, সকলের কর্ত্তা ঈশ্বরকে আপনার মধ্যে দেখিবে। কি শারীরিক কি মানসিক প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব অনুভব করিবে।

যখন তুমি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা এবং রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ এবং আস্বাদন কর, তখন তুমি তোমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় শক্তির মূলে ঈশ্বরের শক্তি উপলব্ধি করিবে। এবং যখন তুমি তোমার মনের শক্তি সকল পরিচালন কর, তন্মধ্যেও তুমি ঈশ্বরের শক্তি দেখিবে। কেন না তাঁহার শক্তি ভিন্ন তুমি একটী সচ্চিন্তা করিতে পার না, এক বিন্দু প্রেম অথবা পুণ্যও উপার্জ্জন করিতে পার না। তিনি সকল শক্তির মূল শক্তি। যেমন তিনি ভিন্ন তুমি তোমার হস্তপদ অথবা শরীরের কোন অঙ্গ পরিচালন করিতে পার না, তেমনি তাঁহার শক্তি ভিন্ন তোমার মন চিন্তা করিতে পারে না। এইরূপে দেখিবে তুমি এবং তোমার স্রষ্টা দেহবৃক্ষ মধ্যে দুশ্চেদ্য যোগ শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে।

স্রষ্টাকে অতিক্রম করিয়া সৃষ্ট আত্মা কিছুই করিতে পারে না। স্রষ্টা পক্ষী এবং সৃষ্ট পক্ষী দুটী বন্ধু পার্শ্বে পার্শ্বে বসিয়া সর্ব্বদা আমোদ করিতেছে। যখনই ভাবিবে তখনই দেখিবে

দুই পাখী দৃঢ়যোগে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সখ্য বৃদ্ধি করিতেছে। হে বিশ্বাসী, তুমি কখনও আপনাকে ঈশ্বর ছাড়া ভাবিতে পার না। ক্রমাগত বিশ্বাস ভক্তি নয়নে দেখ তোমার সর্ব্বাঙ্গে দুই পক্ষী বেড়াইতেছে। একটী ফল দিতে-ছেন অপরটী ফল ভোগ করিতেছে; ছোট ছানা পক্ষী বড় স্রষ্টা পক্ষীর পক্ষপুটে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে নিজ দেহবৃক্ষের মধ্যে নিয়ত এই দুই সুন্দর পক্ষীর খেলা না দেখিলে তুমি প্রকৃতরূপে ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা ব্রহ্মভক্ত হইতে পার না। এই দুটী পাখী সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে।

যখন তুমি একটী সুন্দর গোলাপফুল দর্শন কর, তখন স্রষ্টা পাখী তোমাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা দেন এবং তুমি সৃষ্ট পক্ষী তাহা দর্শন কর। আবার যখন তুমি মধুর ব্রহ্ম সঙ্গীত শ্রবণ কর, স্রষ্টা পক্ষী তোমাকে শ্রবণ করিবার শক্তি দেন, তুমি শ্রবণ কর। অথবা যখন তুমি নিজে বিভুগুণ কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ কর, তখন স্রষ্টা পক্ষী তোমার রসনাতে বসিয়া তোমাকে বাক্য উচ্চারণ করিবার শক্তি দেন। আবার যখন তুমি বাহ্যিক ক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া মনের মধ্যে ধ্যান চিন্তা করিতে লাগিলে তখন তোমার রসনা হইতে দুটী পাখী ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া মনের মধ্যে গেল। স্রষ্টা পক্ষী মনের মধ্যে বসিয়া তোমাকে চিন্তা করিবার শক্তি, মনন ও নিধিধ্যাসন করিবার শক্তি দিতে লাগিল। এই-রূপে মনের প্রত্যেক কার্য্য এবং শরীরের প্রত্যেক কার্য্য

ঈশ্বরের শক্তিতে নির্ব্বাহ হয়। ঈশ্বর শক্তিদাতা, জীবাত্মা শক্তি গৃহীতা।

হে সৃষ্ট আত্মন, তোমার অব্যবহিত সন্নিধানে স্রষ্টাপাখী নিত্য বসিয়া আছেন; তিনি তোমার সমস্ত অভাব মোচনের আয়োজন করিয়া দিতেছেন। তোমার চাহিতেও হয় না, তোমার চাহিবার পূর্ব্বে তিনি জানিয়া তোমাকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করিতেছেন। তোমার শরীরে অন্ন জল ও বল স্বাস্থ্য দিতেছেন এবং তোমার আত্মাতে ধর্ম্ম পুণ্য শান্তি বিধান করিতেছেন। তিনি তোমাকে তাঁহার অজস্র দয়াঋণে বদ্ধ করিতেছেন। এইরূপে দুটী পক্ষীর পরস্পরের সখ্যভাব বৃদ্ধি হইতেছে। যখন দুই জনের সৌহার্দ্দ ঘনীভূত হয় তখন জীবাত্মা পরমাত্মাকে বলেন—"পরমাত্মন্, আর যে তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না।" পরমাত্মা জীবাত্মাকে বলিলেন "হে ক্ষুদ্র জীবাত্মা, তুমি আমাকে এত ভালবাস যে তুমি আমা ছাড়া আর কাহাকেও জান না, অতএব আমিও তোমাকে নিত্য আমার চক্ষের ভিতরে রাখিব।"

এইরূপে দিন দিন বৎসরে বৎসরে পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ বাড়িতে থাকে। অনন্ত প্রেমের আধার পরমাত্মা কদাচ জীবাত্মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। আবার যখন উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয় তখন জীবাত্মাও পরমাত্মাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি, তুমিও

সাধন দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে তোমার সখ্যভাব এতদূর প্রগাঢ় কর যে তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়া সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে সেই উচ্চতম অবস্থায় উপস্থিত হও, যেখানে ছোট পাখীটী অনুগত ভৃত্য হইয়া বড় পাখীর ভিতরে চিরাশ্রিত হইয়া থাকিবে এবং বড় পাখী ছোটটীকে আপনার বুকের ভিতরে টানিয়া লইবে।

এই পাখীর গল্প মজার গল্প; দুই সুন্দর পাখীর কথা মনোহর ভাগবত কথা। পরমাত্মা পক্ষী এবং জীবাত্মা পক্ষী উভয়ই অত্যন্ত সুন্দর এবং লাবণ্যযুক্ত, উভয়ে পরস্পরের লাবণ্যে আসক্ত। আবার ছোট পাখীটী যতই বড় পাখীর সৌন্দর্য্যে অনুরক্ত হয় ততই সে নিজে আরও উজ্জ্বলতর ও প্রিয়দর্শন হয়। ছোট পাখীটী যতই বড় পাখীর সৌন্দর্য্য-রস পান করে, বড় পাখীর সুস্বর শ্রবণ করে এবং বড় পাখীর সহবাসে থাকে, ততই তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। অতএব হে ভক্ত পক্ষী, তুমি অনলস হইয়া পরমাত্মা পক্ষীর শক্তিতে শক্তিমান হও, তাঁহার জ্ঞানে জ্ঞানী হও, তাঁহার প্রেমে প্রেমিক হও, তাঁহার পুণ্যে পুণ্যবান হও এবং তাঁহার সুখে সুখী হও।

এই মন্দিরে যত নর নারী আছেন প্রত্যেকের দেহবৃক্ষে দুটী পাখী খেলা করিতেছে। আমি পরমার্থতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব বলিতেছি, তোমরা শুনিতেছ। আমার মধ্যেও দুই পাখী

তোমাদের মধ্যেও দুই পাখী। তোমাদের প্রত্যেকের দেহ-বৃক্ষের ডালে দুটী পাখী স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে; এক পাখী শুনিতেছে, অপর পাখী শুনিবার শক্তি দিতেছেন। আমি যে বলিতেছি আমার মধ্যেও দুই পাখী খেলা করিতেছে, কার্য্য করিতেছে, এক পাখী বলিবার শক্তি দিতেছেন, অপর পক্ষী বলিতেছে। এই দুই সুন্দর পক্ষীর মিত্রতা ও যোগতত্ত্ব জানিয়া বড় সুখী হইলাম।

আহা! কি সুখের কথা, আমি কখনও একাকী নহি, আমার মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী নিত্য আমার কাছে কাছে রহিয়াছেন। আমি দিবা নিশি অবিশ্রান্ত সেই পূর্ণ প্রেম পক্ষীর পক্ষপুটে প্রতিপালিত, আচ্ছাদিত ও আশ্রিত হইয়া রহিয়াছি। আমি প্রতিদিন প্রেম ভক্তি ফুলে এই প্রেমপক্ষীর পূজা করিব, এই সুন্দর পরম পক্ষীকে আমার বক্ষে বসাইব, এই পাখীর সুস্বর যুক্ত বেদবাক্য এবং সুমধুর সঙ্গীত শুনিব, এই পাখীর সঙ্গে নিগূঢ় সৌহার্দ্দে সংযুক্ত হইয়া শুদ্ধ ও সুখী হইব। কি গৃহে কি কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বদা আমি এই পক্ষীর সঙ্গে থাকিব, ইহাঁর সঙ্গে থাকিলে পাপ প্রলোভন অসম্ভব হইবে। মার পক্ষপুটের শোভা দেখিয়া এবং তাহার আশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া শান্তি সুখ সম্ভোগ করিব। দুই জনে মনের আনন্দে একত্রে গান করিব, পরস্পরের সুস্বর ও সঙ্গীতের বিনিময় হইবে, আমার আর সুখের সীমা থাকিবে না। আমি আমার এই পার্শ্বস্থ, এই অন্তরতম,

নিকটতম পরমাত্মা পক্ষীর পূজা ও সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব। এই প্রেমপক্ষীর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইব, অন্য সৌন্দর্য্য আর আমার ভাল লাগিবে না; এই পক্ষীর সুস্বর ছাড়িয়া আর পৃথিবীর লোকের কর্কশ স্বর শুনিতে যাইব না ইহাঁর সহবাস ছাড়িয়া আর পাপভয় পূর্ণ লোকের সহবাস অন্বেষণ করিব না। পুত্র যেমন পিতা মাতার উপরে নির্ভর করে এবং তাঁহাদিগকে ভালবাসে, সুহৃদ বন্ধু যেমন সুহৃদ বন্ধুকে হৃদয়ের প্রেম দেয় তেমনি আমরা এই পক্ষীকে পিতা মাতা ও পরম সুহৃদ জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইব।

তিন যুদ্ধ।

রবিবার ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক; ৫ই জুন ১৮৮১।

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে আচার্য্য, নববিধান প্রতিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বে যে তিন মহাযুদ্ধ হইয়াছিল তাহার বিবরণ বলুন এবং তাহা হইতে জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভগবান কি কি মহাসত্য উদ্ধার করিয়াছেন তাহাও পরিষ্কার করিয়া বলুন।" আচার্য্য বলিলেন, অতি সুন্দর প্রশ্ন হইয়াছে। তবে সেই তিন মহাযুদ্ধের কথা শ্রবণ কর এবং বিধাতার প্রেমলীলা রস পান কর। যখন এই দেশে মূর্ত্তিপূজার ভয়ানক প্রাদুর্ভাব ছিল এবং পৌত্তলিকতার অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছিল সেই সময়ে বিধাতা পুরুষ, ভারতবর্ষের ঈশ্বর, বিশেষ-

রূপে তাহার অতুল মহিমা এবং অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তির মনোমধ্যে জ্ঞানের আসনে বসিয়া প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যখন ভারতবর্ষের চারিদিকে নানা প্রকার দেব দেবীর পূজা হইতেছিল সেই সময়ে সনাতন ব্রহ্ম ভারতবর্ষ এবং সমস্ত জগৎ হইতে সকল প্রকার অসত্য এবং পৌত্তলিকতা দূর করিবার জন্য, কয়েকজন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মনে তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব প্রকাশ করিলেন। সেই কয়েকজন ব্রহ্মনিষ্ঠ একেশ্বরবাদী সাহসপূর্ব্বক তুরীভেরী প্রভৃতি রণবাদ্য বাজাইয়া ভারতের আকাশে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই নিশান উড়াইলেন। তাঁহাদিগের নিকটে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরিচয় পাইয়া বঙ্গদেশের এবং ভারতবর্ষের অনেকেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক দিকে যেমন অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নিশান উড়িল অপর দিকে তেমনি পৌত্তলিকেরা একেশ্বরবাদীদিগকে ভয়ানকরূপে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল কে জানিত কোন্ পক্ষের জয় লাভ হইবে। অল্প বিশ্বাসী সাধারণ লোকেরা মনে করিল যে দিকে লোকসংখ্যা অধিক সেই দিকেই জয় হইবে; কিন্তু সত্যেরই জয় হইল। সত্য সূর্য্যের উদয়ে অসত্য

পৌত্তলিকতার অন্ধকার ক্রমে ক্রমে চলিয়া যাইতে লাগিল। যে দেশ সেই এক পুরাতন সনাতন পরব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই অতীন্দ্রিয়, নির্ব্বিকার, নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ঘোরতর পৌত্তলিকতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল সেই দেশ আবার অদ্বিতীয় প্রাচীন পরব্রহ্মকে মাথায় করিয়া লইল। দেশ দেশান্তরে একমেবাদ্বিতীয়মের নিশান উড়িতে লাগিল।

এক ঈশ্বর আপনার প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার মূর্ত্তিপূজাকারীদিগের সঙ্গে একেশ্বরবাদীদিগের মধ্যে এই যে মহাযুদ্ধ উহা দেশ উদ্ধারের জন্য, দুঃখী দুঃখিনীদিগের পরিত্রাণ জন্য অদ্বিতীয় ঈশ্বর স্বয়ং ঘটাইলেন। ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া, সত্যের বলে বলবান হইয়া একেশ্বরবাদীগণ অসত্য পৌত্তলিকতার দুর্গ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশ্বরের সাহায্যে তাঁহারা বিঘ্ন বিপত্তির সাগর অতিক্রম করিয়া পরিণামে জয় লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও যত্নে চারিদিকে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম ঘোষিত হইতে লাগিল। অপ্রতিহত বিশ্বাসের সহিত তাঁহারা বলিতে লাগিলেন "ঈশ্বর এক, ঈশ্বর দুই নহেন, ঈশ্বর তিন নহেন, ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর হইতে পারে না। যিনি অসংখ্য গুণধারী পরব্রহ্ম, যিনি কোটি কোটি রূপ ধারণ করেন তিনি এক।"

প্রথম মহাযুদ্ধে এই আদি সত্য জয় লাভ করিল এবং

ভারতভূমিতে ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম যুদ্ধে ঈশ্বর জয়ী হইলেন, এবং তাঁহার অনুগত একেশ্বরবাদীগণ পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইল। এইরূপে প্রথম যুদ্ধে বিস্তীর্ণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, জীবন্ত ঈশ্বরের বলে, সত্যের অনুরোধে, মূর্ত্তি উপাসকদিগের দল পরিত্যাগ করিয়া আমরা এক[illegible] [illegible]িশ্বাসী দল সত্য ধামের দিকে চলিলাম। ইহার পর কিছুদিন আমরা কুশলে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম, ঈশ্বরের বিশেষ কৃপায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সমাজ অথবা ব্রহ্মোপাসকদিগের সমাজ অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বিতীয়বার এদেশে রণভেরী বাজিয়া উঠিল। আমাদিগের এই ক্ষুদ্র একেশ্বরবাদীদলের ভিতরে আবার বিভাগ হইল। প্রথম যুদ্ধে প্রকাণ্ড পৌত্তলিক হিন্দুসমাজ হইতে একেশ্বরবাদীগণ বিচ্ছিন্ন হইলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেক পরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থগণ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের দল হইতে নির্ব্বাসিত ও বিচ্ছিন্ন হইলেন। প্রথম যুদ্ধ একেশ্বরবাদের যুদ্ধ, দ্বিতীয় যুদ্ধ বিবেকের যুদ্ধ। সঙ্কীর্ণ ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। পুরাতন অভ্যস্ত ভাবের সহিত নূতন নূতন ভাবের বিরোধ হইতে লাগিল। এই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে অধিকাংশ কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট রহিলেন; কিন্তু কয়েকজন সেই জ্ঞান জীবনে পরিণত করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং ব্যাকুল হইলেন। তাঁহারা বলিলেন,

"কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ভাবে ব্রহ্মোপাসনা করিলে হইবে না; কিন্তু প্রতিদিনের জীবনে আপন বিশ্বাসানুসারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। দৈনিক জীবন ব্রহ্মপাদপদ্মে উৎসর্গ করিতে হইবে। প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইবে এবং সমস্ত জীবন দ্বারা ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে। ঈশ্বরের অভিপ্রায় অথবা বিবেকের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্য করা উচিত নহে; অতি সামান্য বিষয়েও মনুষ্যের ইচ্ছা পূর্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে, জীবনের ক্ষুদ্রতম কার্য্য সকলও বিবেকের অনুমোদিত হওয়া উচিত।"

প্রথমোক্ত ব্রহ্মবাদীগণ জীবনপথে এতদূর অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না, সুতরাং তাঁহারা বিবেকবাদীদিগের বিরোধী হইয়া উঠিলেন এবং অবশেষে বিবেকবাদীদিগকে তাঁহাদের দল হইতে নির্ব্বাসন করিলেন। এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোরতর যুদ্ধ। বিধাতা পুরুষ তাঁহার অনন্ত সিংহাসনে বসিয়া এই যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার বিবেকপরায়ণ নব্য যুবাদলের মনে স্বর্গীয় সৎসাহস এবং দুনির্ব্বার উৎসাহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিবেক জয় লাভ করিল। বিবেকী ব্রহ্মানুরাগীদল জীবন্ত ভাবে বিবেকের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন।

প্রাচীন ব্রহ্মবাদীগণ ক্রমশঃ শুষ্ক, নির্জীব ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, এবং কঠোর নিয়মতন্ত্র হইয়া জীবনশূন্য ধর্ম্মচর্চ্চা

করিতে লাগিলেন। প্রথম যুদ্ধে একেশ্বরবাদীগণ প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেকী ব্রহ্মভক্তগণ ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। উভয় যুদ্ধেই বিচ্ছেদ হইল; কিন্তু এই বিচ্ছেদ মঙ্গলময়ের মঙ্গলাভিপ্রায়সম্ভূত। বিবেকী ব্রহ্মানুরাগী নব্যদল প্রাচীন দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই ভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "হে ঈশ্বর, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই আমাদের ইচ্ছা হউক! কি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, কি গৃহধর্ম্মানুষ্ঠান কি দৈনিক রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার, সমুদয় বিষয়ে, হে অদ্বিতীয় সর্ব্বাধিকারী মহাপ্রভু পরমেশ্বর, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে শক্তি দাও।"

এইরূপে দ্বিতীয় যুদ্ধে ভারতের আকাশে ব্রহ্মের ইচ্ছার নিশান উড়িল এবং ব্রাহ্মসমাজে বিবেকের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল নিজের ইচ্ছা অথবা স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া বিবেকের অধীন হইয়া চলিতে হইবে, বিষয়-সুখভোগলালসা নির্ব্বাণ করিয়া বৈরাগ্য ব্রত পালন করিতে হইবে, এই স্বর্গীয় সুন্দর ছবি দেখাইবার জন্য, এই মত ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্রাহ্মদিগের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই সংগ্রামে ঈশ্বরকৃপায় তাঁহার অনুগত বিবেকী সন্তানগণ জয়ী হইলেন। প্রাচীন সমাজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়া নূতন দল ঈশ্বরাজ্ঞায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন এবং কিছুকালের মধ্যে

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় নিয়মিতরূপে সবান্ধবে ব্রহ্মপূজা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা ইহাঁদিগের সমস্ত জীবনকে অধিকার করিতে লাগিল; এবং ইহাঁদিগের চরিত্র শাসন করিতে লাগিল। প্রথম যুদ্ধে সত্যের জয় হইল, দ্বিতীয় যুদ্ধে বিবেক অথবা ব্রহ্মের ইচ্ছার জয় হইল।

কিছুকাল পরে তৃতীয় মহাযুদ্ধের রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। আবার সূর্য্যালোকে নানা প্রকার যুদ্ধের অস্ত্র সকল চক্‌মক্ করিয়া উঠিল। তৃতীয় মহাযুদ্ধ সমাগত, ইহাতেও ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল। দ্বিতীয় যুদ্ধ অপেক্ষাও এ যুদ্ধ প্রবলতর। ঈশ্বরের আদেশ অথবা প্রত্যাদেশ ভূমির উপরে এই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এক দল প্রত্যাদেশবাদী, অন্য দল প্রত্যাদেশ বিরোধী, এই দুই দল যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইল। সেই পূর্ব্বোক্ত বিবেকী ব্রহ্মভক্তদল বলিলেন, "যাহা বিবেকের আদেশ তাহাই ঈশ্বরের বাণী অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছা। নিজের ইচ্ছা সংযত হইলেই ঈশ্বরের আদেশ এবং তাঁহার পবিত্রাত্মার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করা যায়।" প্রত্যাদেশবিরোধী-দল ইহাতে সম্মতি দিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, "ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন তদনুসারে চলিলেই ধর্ম্ম-সাধন হয়, ঈশ্বর কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে আমাদিগের নিকটে তাঁহার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন না, কেহই তাঁহার সাক্ষাৎ আদেশ শুনিতে পায় না।"

দুই দলের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, কামানের গোলা উঠিতে লাগিল ও পড়িতে লাগিল, যুদ্ধের ধূম স্তম্ভের আকৃতি ধারণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল। যেমন প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধ ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ঘটিয়াছিল, এই তৃতীয় যুদ্ধও সেই মঙ্গলময় বিধাতার অভিপ্রায়েই ঘটিয়াছিল, ইহাতে উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং বিশ্বাসীদিগের বিশেষ কল্যাণ ও কুশল হইয়াছে। এই তৃতীয় যুদ্ধ হইতেও জীবের কল্যাণদাতা ভগবান তাঁহার এক প্রবল সত্য উদ্ধার করিয়া নববিধানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তৃতীয় যুদ্ধে এই শিক্ষা লাভ হইল যে বিবেকের বাণীকে ব্রহ্মবাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। তৃতীয় যুদ্ধ এই সত্য প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে ঈশ্বর তাঁহার প্রেরিত যোগী সাধকদিগের নিকটে প্রত্যক্ষ ভাবে আদেশ দান করেন; এবং তাঁহাদিগের প্রাণের মধ্যে স্বয়ং প্রাণ ও শক্তিরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাদিষ্ট করেন।

ভক্তাধীন ভগবান তাঁহার ভক্তদিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং ভক্তদিগের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে কৃষ্ণ পাণ্ডবসখা নাম ধারণ করিয়া অর্জ্জুনের সারথি হইয়া আপনি রথ চালাইয়াছিলেন। সেইরূপ ভগবান স্বয়ং প্রত্যাদেশবাদীদিগের বন্ধু হইয়া আপনি তাঁহার নববিধান রথ চালাইতে লাগিলেন। স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর ভক্তসখা সারথি হইয়া প্রত্যাদেশবাদীদিগকে জয়ী করিলেন।

এই ভয়ানক কলিযুগের মধ্যেও ঈশ্বর কথা কহিয়া ভক্ত-দিগকে রক্ষা করেন এই সত্য প্রমাণিত হইল।

নিরাকার অদৃশ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও প্রেমনয়নে দেখা যায়, অশব্দ ঈশ্বরের অভ্রান্তবাণী বিবেককর্ণে শুনা যায়, নিকটতম অন্তরতম ঈশ্বরকে স্পর্শ করা যায়, এবং তাঁহার সঙ্গে নিত্য প্রত্যাদেশ যোগে যোগী হওয়া যায় এ সকল গুরুতর সত্য তো স্বীকার ও সাধন করিতেই হইবে। যে কলিযুগে সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাচারী লোক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করে না, সেই কলিযুগের মধ্যেই তাঁহার প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট সন্তানগণ প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা জানিয়া পৃথিবীর পাপ প্রলোভনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতেছেন; তৃতীয় যুদ্ধ উজ্জ্বলতররূপে এই সত্য প্রকাশ করিলেন।

এই তিন যুদ্ধে তিন অমূল্য সত্য লব্ধ হইল। প্রথম যুদ্ধে এক ঈশ্বর অথবা সমস্ত জগতের এক পিতা, এই সত্য নিষ্পন্ন এবং প্রকাশিত হইল, দ্বিতীয় যুদ্ধে সেই পিতার ইচ্ছাধীন বিবেকী সৎপুত্রের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইল, তৃতীয় যুদ্ধে সাধকদিগের আত্মাতে পবিত্রাত্মার সিংহাসন দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল। এই তিন যুদ্ধের পরে মহাপ্রভু পরমেশ্বর তাঁহার সাধকদিগকে বলিলেন, "সচ্চিদানন্দের মন্দির প্রতি-ষ্ঠিত কর।" সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই তিন ভাবের সমষ্টি সচ্চিদানন্দ। তিনটী যুদ্ধের পর এই তিনটী সত্য, এই ত্রিভাব অথবা ত্রিনীতিগত প্রকাশিত হইয়া নববিধান সঙ্গঠিত হইল।

মঙ্গলময় বিধাতা অতি আশ্চর্য্যরূপে এ সকল ঘটনা ঘটাইলেন। এই তিন যুদ্ধে ক্রমান্বয়ে পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার জয় হইল।

প্রথম যুদ্ধে নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ব্রহ্মবাদীগণ তাঁহার পূজা অর্চনায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু কিছুকাল পরে সেই ব্রহ্মবাদীদিগের মধ্যে কয়েকজন বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে কেবল সপ্তাহান্তে একবার সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা করিলে জীবন পবিত্র ও সুখী হয় না, প্রত্যহ বিবেকী অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হইয়া জীবনের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রতিদিন সরল হৃদয়ে বলিতে হইবে, "হে ঈশ্বর, আমার ইচ্ছা নহে; কিন্তু আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

সেই জেরুসেলাম নগরে স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছাধীন ঈশা যেমন এই কথা বলিতেন ভারতবর্ষের বিবেকী ব্রহ্মানুরাগীগণও এই কথা বলিতে লাগিলেন। পিতা পুত্রের ইচ্ছাগত মিলন চাই, কেবল পিতার পূজা করিলে হইবে না; কিন্তু সমস্ত হৃদয় প্রাণ দিয়া জীবনে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। ইচ্ছাযোগ দ্বারা পরমাত্মা পক্ষীর সঙ্গে সৃষ্টাত্মা পক্ষীর সখ্যযোগ করিতে হইবে। এইরূপে এক বিবেকসূত্রে ঈশার প্রাণ বঙ্গবাসী ব্রাহ্মের প্রাণ হইল। দ্বিতীয় যুদ্ধে এই পিতা পুত্রের মিলনতত্ত্ব প্রকাশিত হইল। বাইবেল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ঈশ্বরপুত্র ঈশা ঈশ্বরের বাক্য অথবা জ্ঞানের নিঃসরণ। চিৎ শব্দের অর্থ চৈতন্য অথবা সুবুদ্ধি,

যে সুবুদ্ধি সৎ পুত্রের মধ্যে অবতীর্ণ। অথবা যে ইচ্ছা ও শক্তি তনয়ের জীবনে সঞ্জীবিত তাহার জয় হইল। কিন্তু ইহাতেও ভাগবত পূর্ণ হইল না। এই জন্য তৃতীয় যুদ্ধের প্রয়োজন হইল।

সাধক বিবেকী হইয়াও ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিতে পারে। সাধককে ঈশ্বরের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য পবিত্রাত্মার আবির্ভাব প্রয়োজনীয়। যখন ঈশ্বরের বিবেকী পুত্রের অন্তরে পবিত্রাত্মার প্রকাশ হয় তখন তিনি ঈশ্বর দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যাদিষ্ট হন, এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের বাণী অবলম্বন করেন। পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত না হইলে মানুষ ঈশ্বরের অভ্রান্তবাণী শুনিতে পায় না; এবং শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারে না। এই পবিত্রাত্মা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের মনে আনন্দ ও শান্তি সমাগত হয়। খৃষ্টীয় শাস্ত্রে পবিত্রাত্মার অন্যতর একটী নাম আনন্দদাতা। এইরূপে আমরা প্রাচীন আর্য্য মহাবাক্য সচ্চিদানন্দের মধ্যে খৃষ্টীয় ত্রিদেব মতের ঐক্য দেখিতেছি।

প্রথমতঃ 'সৎ' অর্থাৎ একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাঁহার আর্য্য নাম উপাধি নাই, যাঁহার একমাত্র নাম "আমি আছি"। অতএব 'সৎ' সর্ব্বপালক ঈশ্বরের পিতৃভাববাচক, 'চিৎ' তাঁহার পুত্রভাববাচক এবং 'আনন্দ' তাঁহার পবিত্রাত্মাপ্রদ শান্তি ও আনন্দবাচক। সৎ, চিৎ, আনন্দ, অথবা জ্বলন্তব্রহ্ম, পুত্র, পবিত্রাত্মা এই তিনের মিলনে নববিধান প্রতিষ্ঠিত। তিন

প্রকাণ্ড যুদ্ধের পরে, এই তিন মহাসত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তিন সত্যের মিলনে সচ্চিদানন্দের পূর্ণ গৌরব সমুজ্জ্বলিত হইল। হে ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা অথবা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে লাভ করিয়া শুদ্ধ হও, এবং শান্তি ও কুশল লাভ কর।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা।

রবিবার ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক; ১২ই জুন ১৮৮১।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মার মধ্যে অনেক প্রভেদ। ব্রহ্ম শব্দে আকার নাই এবং ব্রহ্ম নিজেও আকারবিহীন। ব্রহ্ম শব্দে আকার দিলে ব্রহ্মা হয়। ব্রহ্মা শব্দ যেমন আকার বিশিষ্ট, ব্রহ্মা বস্তুও আকার বিশিষ্ট অর্থাৎ সাকার। এদেশে বহুকাল হইতে অগ্নির দেবতা ব্রহ্মা আকাররূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। ব্রহ্ম নিরাকার নির্ব্বিকার এবং অনাদি ও অনন্ত, ব্রহ্মা সাকার এবং আদি ও অন্ত বিশিষ্ট। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মা এই দুয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নাই, দুই সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন; ব্রহ্ম স্বয়ং স্রষ্টা পুরুষ এবং ব্রহ্মা একটী সৃষ্ট বস্তু। কিন্তু এমন কোন সাধারণ সূত্র কি নাই যদ্দ্বারা এই দুইকে একত্র করা যায়? এই দুইয়ের মধ্যে কি কোন যোগ নাই? ব্রহ্মা কি ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র? ব্রহ্মবিহীন হইয়া কি ব্রহ্মা অবস্থিতি করিতে পারে? ব্রহ্মার ভিতরে কি এমন

কোন পরিষ্কৃত পথ নাই যাহা অবলম্বন করিলে ব্রহ্মের নিকটে যাওয়া যায়? বাস্তবিক ব্রহ্ম ভিন্ন ব্রহ্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ ব্রহ্মা অর্থাৎ অগ্নির মধ্যে যদি ব্রহ্মের আবির্ভাব না অনুভব করিতেন তাহা হইলে হোমের সৃষ্টি হইত না। হে ব্রহ্মজ্ঞ সাধুগণ, পৌত্তলিক অনুষ্ঠান বলিয়া অগ্নিপূজাকে একেবারে অর্থশূন্য মনে করিও না। এই যে নানা দেশে নানা জাতির মধ্যে বহু শতাব্দী হইতে অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিকে সমক্ষে রাখিয়া অগ্নির দেবতাকে পূজা করিয়া আসিতেছে ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন নিগূঢ় সত্য নিহিত রহিয়াছে। তোমরা বিজ্ঞান চক্ষে ভ্রম কুসংস্কার ভেদ করিয়া সেই সত্য দর্শন কর। অগ্নিহোত্রব্রত কেন হইল? আগুন জ্বালিয়া হোম না করিলে কি প্রাচীন সাধকদিগের ধর্ম্ম হইত না? অগ্নিকে কেন তাঁহারা এত সমাদর করিতেন? ঋগ্বেদে অগ্নিস্তব কেন দেখিতে পাই? যে সকল আর্য্য ঋষিগণ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসক বলিয়া জগতে বিখ্যাত তাঁহাদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে জড় অগ্নির উপাসনার উল্লেখ কেন দেখিতে পাওয়া যায়? ইহাতে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত সভ্য জাতির নিকটে কি আর্য্য মস্তক অবনত হইল না? এই কুসংস্কারের গুরুভার বশতঃ কি আর্য্যমস্তক হইতে জ্ঞানের মুকুট খসিয়া পড়িল না?

ঋগ্বেদ, তোমার মধ্যে অগ্নির স্তব আছে বলিয়া কি তুমি এই উনবিংশ শতাব্দীতে সভ্য সমাজে অনাদৃত হইয়াছ? না বিজ্ঞ সমাজে এখন তোমার আদর আরও বাড়িতেছে? হে ঋগ্বেদ, হে হৃদয়ের বন্ধু, হে আর্য্যগুরু, আমাদিগকে তুমি বলিয়া দাও কেন সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অগ্নিকে সমাদর করিয়া অগ্নির স্তব করিতেন। ঋগ্বেদ বলিলেন, ঋগ্বেদ বলিতেছেন, এবং ঋগ্বেদ আমাদিগের পুত্র পৌত্রদিগকেও বলিবেন, "অকারণ অগ্নিপূজা হয় নাই। অগ্নির সঙ্গে ব্রহ্মের যোগ আছে। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তিনি অগ্নিব্যাপী।" তোমরা সকলেই জান হুতাশনের গ্রাসে সর্ব্ববস্তু দগ্ধ হয়। এই দহন করিবার শক্তি অগ্নি কাহার নিকটে লাভ করে? যিনি সকল শক্তির মূল শক্তি সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের নিকটে অগ্নি এই দাহিকা শক্তি লাভ করে। অগ্নির মূল শক্তি ব্রহ্মশক্তি। অগ্নির উপরে জ্বলেন ব্রহ্মা, অগ্নির ভিতরে জ্বলেন ব্রহ্ম। সেই আদ্যাশক্তি অগ্নির ভিতরে বাহিরে আপনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রকাশ করেন। আদ্যাশক্তি জগজ্জননী এই অগ্নিশক্তি দ্বারা কত কার্য্য সম্পাদন করিয়া লইতেছেন।

এই অগ্নি দ্বারা মনুষ্য সমাজের কত প্রকার উপকার হইতেছে আর্য্য সন্তানেরা তাহা পর্য্যবেক্ষণ এবং আলোচনা করিতেন। তাঁহাদিগের সময়ে পুতুল পূজা অথবা পৌত্ত-লিকতার প্রাদুর্ভাব হয় নাই। তাঁহারা স্বাভাবিক বস্তু

সকলের মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি ও অতুল মহিমা দেখিয়া স্বভাবের স্তব স্তুতি অথবা স্বভাব পূজা করিতেন। স্বভাবের মধ্যে তাঁহারা ঈশ্বরের অপার জ্ঞান কৌশল ও অসীম মহিমা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতেন। যখন তাঁহারা দেখিতেন এই এক অগ্নি নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া এবং নানা রূপ ধারণ করিয়া নানা প্রকারে জগতের হিতসাধন করিতেছে তখন তাঁহারা একেবারে চমৎকৃত এবং কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হইয়া এই অগ্নির স্তব করিতেন। তাঁহারা দেখিতেন এই অগ্নি আকাশে প্রচণ্ড সূর্য্যের আকারে জীবের হিতের জন্য পৃথিবীর দশ দিকে তেজ ও উত্তাপ বিকীর্ণ করিতেছে, মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের আকার ধারণ করিতেছে। আকাশ হইতে পৃথিবীতে নামিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে এই অগ্নি ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিয়া খাদ্য দ্রব্য সকল পাক করে, এবং রাত্রে প্রদীপের আকার ধারণ করিয়া গৃহস্থকে অন্ধকার ও নানা প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করে। এই অগ্নি গরিবের কাছে উত্তাপ দানে শীতের কঠোরতা হ্রাস করে; এই অগ্নি চতুর্দ্দিকের বায়ু বিশুদ্ধ করিয়া বিবিধ রোগ এবং পূতি গন্ধ দূর করে। এই অগ্নি প্রাণবন্ধু হইয়া উদাসীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদিগকে নানা প্রকার বিপদ ও হিংস্র জন্তু সকল হইতে রক্ষা করে।

সর্প, ব্যাঘ্রপূর্ণ অরণ্যের মধ্যে যখন যোগী একাকী ধ্যান সমাধিতে নিযুক্ত হইলেন, তখন ভগবদ্ভক্ত যোগী একবার বিশ্বাস ও নির্ভরপূর্ণনয়নে ব্রহ্মের পানে তাকাইলেন, চারি-

দিকে হিংস্র জন্তুদিগের তর্জ্জন গর্জ্জনে বন প্রতিধ্বনিত, সেই অবস্থায় অসহায় যোগী ব্রহ্মের দিকে তাকাইয়া রহিলেন; বিপদভঞ্জন যোগেশ্বর, ভক্তবৎসল ভগবান ভগবদ্ভক্তকে বলিলেন "তুমি নিশ্চিন্ত মনে ধ্যান কর, অগ্নি তোমাকে বাঁচাইবে; অগ্নি তোমার যোগাসনের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিয়া তোমার সমুদয় শত্রুদিগকে দূর করিয়া তোমাকে বাঁচাইবে। এই কথা শুনিয়া যোগী শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করিয়া তাঁহার যোগাসনের চারিদিকে অগ্নি জ্বালাইলেন। জ্বলন্ত অগ্নি প্রবল প্রহরী হইয়া তাঁহার আশ্রমের কুশল রক্ষা করিতে লাগিল। অগ্নির মুখ ব্যাদান দেখিয়া ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি দুরন্ত হিংস্র জন্তু সকল দূরে চলিয়া গেল।

ভয়ানক বিপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে অগ্নিই একমাত্র সহায়, সেই বিঘ্নময় স্থানে বিপন্নব্যক্তির পক্ষে অগ্নিই বিপদভঞ্জন হরির একমাত্র প্রতিনিধি। সেই অবস্থায় যোগী সন্ন্যাসী তপস্বী স্বীয় স্বীয় আশ্রমের চারিদিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া নানা প্রকার বিপদের মুখে ধ্যানস্থ হইয়া অনায়াসে নির্ভয় এবং নিশ্চিন্ত মনে দিন যাপন করেন। অগ্নির এ সকল উপকার দেখিয়া প্রাচীন ঋষিগণ বলিলেন, "হে অগ্নি, তুমি জীবের পরমোপকারী বন্ধু, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি মহৎ, তুমি গৃহস্থের গৃহে অন্ন পরিপাক কর, তুমি আকাশে সূর্য্যের আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে আলোক এবং উত্তাপ দান কর, তুমিই মেঘমণ্ডলার মধ্যে বিদ্যুৎ হইয়া ক্রীড়া কর, তুমি রাত্রে

গৃহে প্রদীপের আলোক হইয়া মনুষ্য সকলকে অন্ধকার ও নানা বিপদ হইতে রক্ষা কর।"

জ্ঞানীরা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যখন অগ্নিকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করা হইল, তখন তো অগ্নিকে দেবতা, অথবা একজন পুরুষ বা ব্যক্তি মনে করা হইল। আর্য্যসন্তানেরা অগ্নিকে কেন তুমি বলিয়া সম্বোধন করিলেন? অগ্নি কি দেবতা? যাঁহারা অলঙ্কার শাস্ত্র জানেন তাঁহারা এই প্রশ্নের এক প্রকার মীমাংসা করিতে পারেন। অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে ভাবুক এবং কবিরা জড় বস্তুকেও সময়ে সময়ে ব্যক্তি অথবা পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করেন। ঋগ্বেদের সময়ের কবিরা যখন অগ্নির নানা প্রকার উপকারিতা এবং ক্ষমতা দর্শন করিতে লাগিলেন তাঁহারা অগ্নিকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহার স্তব করিতে লাগিলেন, এবং অনুরাগের সহিত অগ্নির মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অগ্নিকে দেবতা জ্ঞানে তাহার পূজাও করিতে লাগিলেন।

আমরা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক, সুতরাং অগ্নিকে দেবতা বলিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব; কিন্তু কবিদিগের ন্যায় অলঙ্কারের অনুরোধে অগ্নিকে তুমি বলিলে আমরা তাহার আপত্তি করিতে পারি না। যাহারা বলে অগ্নি ব্রহ্ম তাহারা ভ্রমান্ধ; আবার যাহারা বলে ব্রহ্মের সঙ্গে অগ্নির কোন যোগ নাই তাহারাও ভ্রমান্ধ। আমাদিগকে এই উভয় ভ্রম

পরিত্যাগ করিয়া সত্য পথ অবলম্বন করিতে হইবে। আমরা ভক্তির সহিত সরল অন্তরে স্বীকার করিব, অগ্নির ভিতরে যে শক্তি তাহা ব্রহ্মশক্তি। অগ্নিশক্তির ভিতরে অগ্নির স্রষ্টা ও রক্ষক ব্রহ্ম অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই ব্রহ্মপুরুষকে আমরা অগ্নিমধ্যে উপলব্ধি করিয়া তুমি বলিয়া সম্বোধন করি। সেই ব্রহ্মপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া আমরা অগ্নির মধ্যস্থ অগ্নির প্রাণ, ব্রহ্মকে তুমি বলিতে পারি। আমরা বলিতে পারি, "হে অগ্নি, তোমার ভিতরে জ্বলন্ত ব্রহ্মপুরুষ বসিয়া আছেন।"

এই যে তুমি সম্বোধন ইহাতে কল্পনা কিম্বা অলঙ্কার নাই। প্রথম তুমি কবিতার তুমি। অলঙ্কার শাস্ত্র মতে প্রথম ভাবে অগ্নিকে তুমি বলাও অন্যায় নহে। কিন্তু শেষোক্ত ভাবে যে অগ্নিকে তুমি বলা তাহা কল্পনা কিম্বা কবিতা নহে। যখন প্রাচীন আর্য্য সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মজ্ঞগণ অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক নিরাকার জ্বলন্ত অগ্নিস্বরূপ ব্রহ্মকে দেখিলেন, তখন তাঁহারা সেই অগ্নির অন্তরস্থ ব্রহ্মকে বলিলেন, "হে অগ্নির অগ্নি, তুমিই অগ্নির দাহিকা শক্তির মূল শক্তি, তুমিই অগ্নিকে মহৎ ও ক্ষমতাশালী করিয়াছ, অতএব তোমাকে নমস্কার করি।"

অগ্নির মধ্যে এই জ্বলন্ত ব্রহ্মকে না দেখিলে আর্য্য সন্তানেরা হোম এবং অগ্নিহোত্র ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া অগ্নিকে এত বাড়াইতেন না। প্রজ্ঞাবান আর্য্যগণ ব্রহ্মার মধ্যে ব্রহ্মকে

না দেখিলে কদাচ ব্রহ্মার এত গৌরব বৃদ্ধি করিতেন না। অনেকে তাঁহাদিগের গূঢ়ভাব বুঝিতে না পারিয়া অগ্নিকে ব্রহ্ম সমান জ্ঞান করিয়া অগ্নির পূজা করিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মবাদীরা জানেন সেই সর্ব্বমূলাধার সর্ব্বাশ্রয় ব্রহ্মের ক্রোড়েই ব্রহ্মা আশ্রিত, সেই নিত্য অগ্নিময় পরব্রহ্মের হস্তে সাকার অগ্নি বিধৃত। অগ্নি হইতে অগ্নিকর্ত্তা, অগ্নিস্রষ্টা, অগ্নিরক্ষক ব্রহ্মকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

তোমরা অনেকেই অগ্নির প্রকাণ্ড বল দেখিয়াছ। যখন অগ্নি দাবানলের আকার ধারণ করিয়া বড় বড় বৃক্ষ সকল ভক্ষণ করে এবং বিস্তীর্ণ অরণ্য সকল ভস্ম করিয়া ফেলে, অথবা অগ্নি যখন সহস্র সহস্র গৃহ অট্টালিকাদি পরিপূর্ণ গ্রাম কিম্বা নগর ভস্ম করিয়া ফেলে তখন অগ্নি এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা কাহা হইতে লাভ করে? ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন অগ্নির স্বতন্ত্র কোন ক্ষমতা নাই। প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণ অগ্নির মধ্যে ব্রহ্ম-শক্তির ব্যাপার সকল দেখিয়া অগ্নির এত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মের পর এখন নববিধান আবির্ভূত হইয়াছে। নববিধানাশ্রিত সাধকেরাও এখন অগ্নির মধ্যে অগ্নির ঈশ্বর ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, হোমের ভিতরে হোমের ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করিয়া এই সভ্যতম ঊনবিংশ শতাব্দীতে অগ্নিহোত্রী হইবেন। যখন আমরা অগ্নি জ্বালিব, তখন ব্রহ্মকে সম্বোধন করিয়া বলিব, "হে অগ্নির অগ্নি, জ্বলন্ত ঈশ্বর, তুমি আবার

অগ্নির মধ্যে আসিয়া আমাদিগকে দর্শন দাও।" "জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি" এ সকল কথা বলিয়া আমরা সঙ্গীত করি, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমরা জলে কিম্বা অনলে হরিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার জন্য তেমন কোন সাধন ব্রত অবলম্বন করি নাই। এই নব হোমাগ্নির মধ্যে আমরা জ্বলন্ত অগ্নি স্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন করিতে শিক্ষা করিব।

প্রাচীন অগ্নি পূজার দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন অগ্নিকে কেহ ঈশ্বর বলিবে না। পৌত্তলিকদিগের ব্রহ্মাকে ভেদ করিয়া এখন ব্রহ্ম উঠিলেন। ব্রহ্ম স্বয়ং বলিলেন, "হে ব্রহ্ম-ভক্ত নববিধানবাদীগণ, আমি অগ্নির দেবতা, আমি সেই এক পুরাতন নিরাকার নির্ব্বিকার জ্বলন্ত পুরুষ, অগ্নির মধ্যে তোমরা আমাকে দর্শন করিয়া আমার পূজা করিয়া শুদ্ধ ও সুখী হও।" জ্বলন্ত অনলের ভিতরে জ্বলন্ত ব্রহ্মকে দর্শন কর। ব্রহ্মশক্তিতে অগ্নি এত তেজ দেখাইতেছে। জড় অগ্নির মধ্যে চৈতন্যময় মহাপ্রভু বিরাজ করিতেছেন। পৌত্তলিক চক্ষু জড় ব্রহ্মাকে দেখে, জ্ঞানী ব্রাহ্ম জড় অগ্নির মধ্যে চিন্ময় ব্রহ্মকে দেখেন। চিন্ময় জীবাত্মা জড় বস্তুর আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মক্রোড় অথবা দেবাশ্রয় লাভ করে। যদিও অগ্নি অচেতন বস্তু, কিন্তু তন্মধ্যে জ্বলন্ত পাবন স্বরূপ জাগ্রৎ ঈশ্বর অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই জন্য হোম প্রশংসনীয়—যে হোমে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মার যোগ হয়।

জীবন মরণে এবং নানা অবস্থায় অগ্নি আমাদিগের

উপকারী বন্ধু। মৃত্যুর পর অগ্নি আমাদের শেষ সৎকার করে। যখন আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য পর-লোকে, অমৃতময়ীর শান্তিগৃহে চলিয়া যায় তখন অগ্নি মৃত দেহের সৎকার করে। মৃত্যুর পরে তো অগ্নি মৃত দেহের সংকার করিবেই, এখন শরীর থাকিতে থাকিতে শরীরের জীবিতাবস্থায় হোমাগ্নি দ্বারা শরীরের সংকার কর। জ্বলন্ত বৈরাগ্যরূপ প্রচণ্ড হোমাগ্নি জ্বালিয়া তন্মধ্যে ষড়রিপু সহ দেহ দহন কর।

হে প্রাচীন অগ্নিহোত্রীগণ, হে প্রাচীন যোগী ঋষিগণ, আমরা হোমাগ্নি দ্বারা আমাদিগের অশুদ্ধ তনু ভস্ম করিয়া ভগবানের কৃপাবলে আবার ভাগবতী তনু লাভ করিতে অভি-লাষ করি, আপনারা সকলে অনুমতি ও সৎ পরামর্শ দিন। আপনারা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এবং বিনীত অন্তরে আপনাদিগকে নমস্কার করিয়া এই নববিধানের ব্রহ্মমন্দিরে আধ্যাত্মিক হোমাগ্নি জ্বালিলাম। ইহার মধ্যে আমরা মনের বিবিধ জঞ্জাল ও ষড়রিপু নিক্ষেপ করিব। এই অগ্নির প্রভাবে আমাদিগের মনের ভিতর হইতে সকল প্রকার কুরুচি, কুবাসনা, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা সমস্ত দগ্ধ হইয়া ভস্ম হইয়া যাইবে। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে এই স্বর্গীয় চিতারোহণ করিয়া পুড়িয়া মরি, পরে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব তাঁহার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রকাশ করিয়া আমাদিগের ভস্মাবশেষ হইতে নূতন দ্বিজাত্মা বাহির করিবেন।

আমরা তনুত্যাগ, স্বার্থত্যাগ করিলাম, অগ্নিশিখার নিকটে যখন দয়াময় প্রভু এই সংবাদ পাইবেন তখন স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইবে। আমাদের পাপ জীবনের মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গদেশে আসিয়া আবার মৃত্যুকে সংহার করিয়া নূতন জীবন বাহির করিবেন। ষড়রিপুময় পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ তনু বিনষ্ট না হইলে নূতন ভাগবতী তনু লাভ করা যায় না। হে পুরাতন ব্রাহ্ম, তুমি একবার ব্রহ্মের পুণ্যাগ্নিতে পুড়িয়া না মরিলে নবজীবন লাভ করিয়া তাঁহার কৃপারস আস্বাদন করিতে পারিবে না। অতএব জ্বলন্ত বৈরাগ্যানলরূপ নূতন হোমাগ্নি জ্বালিয়া আপনার কলুষিত শরীর মনকে দহন ও শোধন কর এবং কৃপাসিন্ধু ঈশ্বরের কৃপাবর্ষণে নূতন জীবন লাভ করিয়া নববিধানের মহিমা মহীয়ান্ কর।

জলসংস্কার।

রবিবার ৬ই আষাঢ়, ১৮০৩ শক; ১৯শে জুন ১৮৮১।

উত্তপ্ত হিন্দুস্থান স্বভাবতঃ স্নানপ্রিয়। যে প্রদেশে সূর্য্যের নাম অগ্নি, সে প্রদেশে কোটি কোটি লোক যে নদীর দিকে ধাবিত হইবে ইহা বিচিত্র নহে। যেখানে প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে লোক অস্থির হয়, সেখানকার লোকেরা নিশ্চয়ই জলের মহিমা কীর্ত্তন করিবেন। যেখানে নিয়ত অগ্নি বর্ষণ

হইতেছে, সেখানে বারি বর্ষণ কেন না প্রার্থনার বস্তু হইবে। যাহারা প্রখর রৌদ্রে কষ্ট পাইতেছে এবং যাহারা পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, তাহারা জলের মহিমা ও আদর জানে। এই জন্য হিন্দুর বীণা ইন্দ্রের মহিমা অথবা বৃষ্টির দেবতার গুণ গান করিয়াছে। এই জন্য ঋগ্বেদ বরুণের প্রতি স্তব স্তুতি করিয়াছে।

এ দেশের লোক চিরকাল প্রকৃতির ভিতরে জলের মহিমা দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছে। নরনারী সকলেই বিলক্ষণরূপে জলের মাহাত্ম্য অবগত আছে। হিন্দুকে আবার স্নান অবগাহন শিক্ষা দিবে কে? যে হিন্দুভ্রাতা রৌদ্রে চিরজর্জ্জরিত, এবং নিত্যস্নান অবগাহন ভিন্ন যে হিন্দু সুস্থির থাকিতে পারে না, তাহাকে কি আবার জলাভিষেক শিক্ষা দিতে হয়? প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি ঈশা জনের দ্বারা জলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই অভিষেকরীতি যে কেবল য়িহুদী দেশে প্রবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছিল তাহা নহে; ইহা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন আর্য্য যোগী ঋষিদিগের মধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল।

যে সকল হিন্দু গঙ্গাস্নানের এত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণরূপে অভিষেকের তত্ত্ব জানিতেন। এই জলাভিষেকবাসনা হিন্দুহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস। অতএব অভিষেক রীতিকে আমরা বিজাতীয় বলিতে পারি না। এই রীতি অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয় নাই; কিন্তু

এই অভিষেক হিন্দুজাতির প্রাচীন রীতি ও দেশাচার। এই পুনরুদ্দীপন দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রাচীন সদনুষ্ঠানকে আধুনিক নববিধানে স্থান দান করা হইল।

প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঈশার পবিত্র জলাভিষেক হইয়াছিল; কিন্তু প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋগ্বেদে পবিত্র জলের স্তব স্তুতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। নববিধানবাদী-দিগের নিকটে দেশ ভেদ এবং কাল ভেদ নাই, সুতরাং ঋগ্বেদ এবং খ্রীষ্টবেদ উভয়ই নববিধানবাদীদিগের সম্পত্তি। ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্র পবিত্র স্নানবিধি প্রচলিত। যেমন এই দেশে গঙ্গাস্নান পবিত্র অনুষ্ঠান, সেইরূপ পঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে সিন্ধু, নর্ম্মদা, গোদাবরী প্রভৃতি নদীতে স্নানও পবিত্র। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি নদী হিন্দুদিগের নিকটে পবিত্র, এবং যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু তাঁহারা এ সকল নদী স্মরণ ও সাধন করিয়া পবিত্র স্নান দ্বারা আপনাকে শুদ্ধ করেন।

ভারতবর্ষে নদীর অভাব নাই, ভারতবর্ষময় নদী। ভারত-বর্ষের পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ নদীতে বিভক্ত। সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত ভারতবর্ষে রাশি রাশি জলের প্রয়োজন, এই জন্য বিধি নিজেই অনেকগুলি নদী প্রণালীর ভিতর দিয়া ভারতে প্রচুর পরিমাণে জল ঢালিয়া দিতেছেন। এই জন্যই ভারতের আকাশ বর্ষাকালে সর্ব্বদা মেঘে পরিপূর্ণ থাকে। প্রাচীন আর্য্যগণ এই জলের নাম জীবন রাখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক

জল আমাদিগের পরমোপকারী প্রাণের বন্ধু। জল ভিন্ন জীবন ধারণ করা অসম্ভব। এই জল আমাদিগের আহারের সামগ্রী সকল প্রস্তুত করে, এই জল আমাদিগের পিপাসা নিবারণ করে, এই জল আমাদিগের গাত্র প্রক্ষালন করে, এই জলে আমরা স্নান অবগাহন করিয়া শরীর শীতল করি। যে জলের নিকটে আমরা এত উপকার লাভ করি, সেই জলের পক্ষপাতী হইয়া তাহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

হে নববিধানভুক্ত ব্রাহ্ম, তুমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর যে তোমার ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তবে তুমি কোন্ মুখে বলিবে যে জলে ব্রহ্ম নাই। যে জলের এত গুণ, যে জলের এত মহিমা, যে জলে আমাদিগের দেহশুদ্ধি, প্রাণরক্ষা, পিপাসানিবৃত্তি এবং সুচারুরূপে বাণিজ্য ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়, সেই জলকে কি আমরা অবহেলা করিতে পারি? প্রাচীন আর্য্য কবি এবং যোগী ঋষিগণ যখন জলের আশ্চর্য্য ক্ষমতা এবং প্রতাপ দেখিলেন, যখন তাঁহারা দেখিলেন আকাশ হইতে জল বৃষ্টি-বিন্দুরূপে উত্তপ্ত ভূমিখণ্ডের উপরে পড়িয়া উর্ব্বরা ভূমিকে সহস্রগুণে উর্ব্বরা করিতেছে, নদীসকলকে বৰ্দ্ধিত ও প্রবলতর-রূপে বেগবতী করিতেছে, গৃহস্থদিগের তড়াগ, সরোবর, দীর্ঘিকা প্রভৃতি পরিপূর্ণ করিতেছে, নানা প্রকারে প্রজাপুঞ্জের হিতসাধন করিতেছে, তখন তাঁহারা জলকে অত্যন্ত মহৎ মনে করিয়া জলের উপরে দেবত্ব আরোপ করিলেন। তাঁহারা

জলের একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনা কারলেন এবং মনে করিতেন সেই দেবতা প্রসন্ন হইয়া বৃষ্টির আকারে গৃহস্থদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন।

আকাশ হইতে পড়িল বৃষ্টি, হইল ধান্যের সৃষ্টি। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, আকাশ হইতে যত ফোঁটা জল পড়িল ততগুলি মোহর পড়িল, বৃষ্টিবিন্দুর আকারে ততগুলি মুক্তা পড়িল। ধান্যবন্ধু বৃষ্টি, ধান্য পোষণ করিয়া পৃথিবীকে প্রচুরধনে ধনী করে। এই বৃষ্টি অথবা জল আমাদিগের দেশে যে কেবল শস্য উৎপাদন করে তাহা নহে, জল আবার আমাদিগকে স্নিগ্ধ করে, আমাদিগের অন্ন প্রস্তুত করে, তৃষ্ণা নিবারণ করে, জঞ্জাল পরিষ্কার করে, গাত্রশুদ্ধি করে। হে বৃষ্টি, তুমি ক্ষুধার অন্ন সৃজন করিলে আবার পিপাসার জল তুমি বর্ষণ করিলে। জলের কত গুণ এক মুখে বলা যায় না।

জল ভিন্ন হিন্দু কোন মতে শুদ্ধ হইতে পারেন না। জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধ না করিলে সাত্বিক হিন্দু মনের আনন্দে ব্রহ্মপূজা করিতে পারেন না। ভালরূপে জল দ্বারা গাত্র প্রক্ষালন না করিলে হিন্দুর শরীরে জড়তা ও মলিনতা অনুভূত হয়; এই জন্য প্রত্যূষ হইবা মাত্র সহস্র সহস্র হিন্দু নরনারী গঙ্গাস্নান করেন। কি বারাণসী, কি প্রয়াগ, কি কলিকাতার গঙ্গাতীরে যদি প্রাতঃকালে যাও তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, গঙ্গার উভয় পার্শ্বে সহস্র সহস্র হিন্দু অগাধ ভক্তি এবং মহা আনন্দের সহিত গঙ্গাস্নান করিতেছে। তাহাদিগের কেমন

ভক্তির উচ্ছ্বাস! কত স্তব স্তুতির ধ্বনিতে আকাশ পরিপূর্ণ হয়, এবং প্রাতঃকালে গঙ্গা কেমন আশ্চর্য্য ধর্ম্মস্থানের আকার ধারণ করে!

গঙ্গাতীরবাসী, গঙ্গাতীরবাসিনী হিন্দুগণ নিত্য গঙ্গাস্নান করাকে একটী মহাপুণ্যব্রত মনে করেন। হিন্দুশাস্ত্রে গঙ্গার কত মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। গঙ্গাতীরবাসী হিন্দুপরিবারস্থ বালক বালিকা যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, সকলেই গঙ্গাস্নান করে। প্রকৃত হিন্দু মনে করেন গঙ্গাস্নান দ্বারা যেমন গাত্রশুদ্ধি হয়, তেমনি চিত্তশুদ্ধিও হয়। বাস্তবিক জলকে পবিত্র মনে করা হিন্দুর স্বাভাবিক ভাব। সুতরাং জর্ডন নদীতে ঈশার জলাভিষেকের শত শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুগণ জলাভিষেকের পবিত্রতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

কোটি কোটি হিন্দু বিশ্বাস করিতেন, গঙ্গাস্নান ভিন্ন যেমন উত্তপ্ত ও মলিন শরীর শীতল এবং নির্ম্মল হয় না, সেইরূপ মনের পাপ দুঃখও যায় না। তাঁহারা সরলান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন, গঙ্গাজলাভিষেকে পাপের আগুন নির্ব্বাণ হয়। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে অভিষেকের মন্ত্রাদি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি জান বাস্তবিক জলেতে এমন কোন গুণ নাই যাহাতে মনের বিকার দূর হইতে পারে, তবে জলাভিষেক দ্বারা কিরূপে পাপ প্রক্ষালিত হইয়া নব জীবনের সঞ্চার হইতে পারে? তোমরা সকলেই জান, স্বয়ং ভগবান জীবের একমাত্র পরিত্রাতা, তবে জল দ্বারা কিরূপে পরিত্রাণ

হইতে পারে? 'তত্ত্বপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন 'জল দ্বারা গাত্রশুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়।' অতএব অসাধারণ বিশ্বাস ও ভক্তিনয়নে যদি জলের মধ্যে সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডপতিকে দেখিতে পাও, তবে জলাভিষেক দ্বারা নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধ হইবে।

হে ব্রহ্মভক্ত, যদি তুমি প্রতিদিন স্নানের সময় জলের মধ্যে সেই ভক্তহৃদয়কমলবাসিনী কমলা, জননী লক্ষ্মীদেবী, মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে দেখিতে পাও তবে তোমার স্নান কেবল শারীরিক স্নান হইবে না, কিন্তু তোমার স্নান স্বর্গপ্রদ, নব জীবনপ্রদ জলাভিষেক হইবে। সেই জল স্পর্শ করিবার সময় তোমার মনে হইবে যেন তুমি কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় পদার্থ স্পর্শ করিতেছ। বাস্তবিক সর্ব্বমঙ্গলা লক্ষ্মী জগদ্ধাত্রী স্বয়ং জলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। সেই সর্ব্বব্যাপিনী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর অমৃত ক্রোড় জলের মধ্যেও প্রসারিত রহিয়াছে। বিশ্বাসী হিন্দুগণ গঙ্গার মধ্যে সেই ক্রোড়ের আভাস পাইয়া গঙ্গাকেই মা বলিয়া সম্বোধন করেন।

হে ভক্ত, নির্ম্মল পূর্ণিমা রাত্রে যদি কখনও গঙ্গায় বেড়াইয়া থাক, তাহা হইলে গঙ্গার আশ্চর্য্য শোভা দেখিয়া অবশ্যই বলিয়া থাকিবে, মা ভুবনমোহিনী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী গঙ্গার বক্ষে বসিয়া কি সুন্দর লীলা প্রকাশ করিতেছেন! ভক্ত দেখিতে পান, যেমন এক দিকে আকাশের পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্না গঙ্গার বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তেমনি সেই অশেষ গুণনিধান

হরির মুখচন্দ্রের মধুর হাস্য গঙ্গাকে আরও সুশোভিত করিয়াছে। "জলে হরি, স্থলে হরি, অনলে অনিলে হরি," হে ভক্তগণ, তোমরা নগরে নগরে পথে পথে এই সঙ্গীত করিয়া বেড়াইয়া থাক; কিন্তু তোমরা যথার্থ বল দেখি, তোমরা কি বাস্তবিক জলের মধ্যে হরিকে দেখিয়াছ, তোমরা কি নদী বক্ষে কমলের মধ্যে সেই মা লক্ষ্মী মহাদেবীকে দেখিয়াছ? জল সেই বিশ্বজননীর প্রেমজলের প্রতিনিধি, জল ব্রহ্মময়। ব্রহ্ম ছাড়া জল থাকিতে পারে না। জলের মধ্যে ব্রহ্মশক্তি, জলের উপরে ব্রহ্মজ্যোতি বিকীর্ণ। বহুকাল পূর্ব্বে উপনিষদে আমরা এই শ্লোক পাঠ করিয়াছি "যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।" "যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।" ইহাতে বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রাচীন আর্য্যেরা জলের মধ্যে ব্রহ্মকে দর্শন করিতেন। সুতরাং জর্ডন নদীতে ঈশার জলাভিষেক, এবং গঙ্গানদীতে মুনি ঋষিদিগের স্নান বিধির মিলন হইল। গঙ্গা ও জর্ডন দুই ভগ্নীর মিলন হইল। পূর্ব্বতন হিন্দু ঋষিগণ এবং য়িহুদী ঋষি খ্রীষ্ট সকলেই জলের মধ্যে যে হরি বর্ত্তমান, এই সত্যের সাক্ষ্যদান করিলেন। পূর্ব্বকার হিন্দুসাধকগণ গঙ্গাতে অবগাহন করিয়া বলিলেন, জলে ব্রহ্ম; ঈশাও জর্ডন নদীর জলে নামিয়া বলিলেন, এই জলে আমার স্বর্গস্থ পিতা এবং তাঁহার পবিত্রাত্মা আবির্ভূত।

বর্ত্তমান সময়ের নববিধানভুক্ত ব্রাহ্মেরাও জলাভিষিক্ত হইয়া, অভিষেক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই সত্যের সাক্ষ্যদান করিতেছেন। হে বিশ্বাসী ব্রাহ্মগণ, তোমরা চিরকাল জলের মাহাত্ম্য গান কর। যেমন তোমরা জল দ্বারা শরীরকে মলামুক্ত করিবে, তেমনি জলের মধ্যে হরি বর্ত্তমান আছেন, এই সত্যে বিশ্বাস করিয়া জলাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে চিত্ত শুদ্ধ করিবে। হরিবিহীন জলে নিরীশ্বর জলে কখনও তোমরা স্নান করিও না, হরিবিহীন জল কখনও তোমরা পান করিও না। জলাভিষেক মন্ত্র দ্বারা তোমরা জলকে আগে হরিময় করিয়া লইবে, অর্থাৎ জলের মধ্যে হরিকে বর্ত্তমান দেখিবে, পরে সেই শুদ্ধ পবিত্র জলে আপনার শরীর মনকে ধৌত ও পরিস্কৃত করিবে। প্রতি-দিন তোমরা ব্রহ্মজলে স্নান করিবে। তোমরা অবিশ্বাসীদিগের ন্যায় একদিনও এই গঙ্গাজলকে ঈশ্বরবিহীন সামান্য জল মনে করিও না। ব্রহ্মবিহীন সামান্য জলে একদিনও তোমরা স্নান করিও না। তোমরা ব্রহ্মসন্তান, তোমরা দ্বিজ, তোমরা বিপ্র, তোমরা জলমন্ত্রে দীক্ষিত; সুতরাং তোমাদিগের নিত্যস্নান নিত্য পবিত্র অভিষেকে পরিণত হইবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে তাঁহার পুণ্যময় মধুময় সরোবরে স্নান করিতে বলিয়াছেন।

হিন্দুস্থান নানা প্রকার পাপতাপে দীপ্তশিরা হইয়াছে, এই প্রকার পবিত্র জলাভিষেক ভিন্ন হিন্দুস্থানের পাপসন্তাপ দূর হইবে না। যখন পাপসন্তপ্ত হিন্দুস্থান ঈশ্বরের পুণ্য-সাগরে, প্রেমসাগরে, জ্ঞানসাগরে শান্তিসাগরে অভিষিক্ত হইয়া

উঠিবে, তখন হিন্দুস্থানের পাপজ্বালা নির্ব্বাণ হইবে। যেমন বাহিরের নির্ম্মল জলে ডুব দিয়া আমাদিগের শরীর পরিষ্কৃত হইয়া উঠে, তেমনি আমাদিগের আত্মা ব্রহ্মসমুদ্রে ডুব দিয়া পাপমুক্ত, মলামুক্ত হইয়া উঠে। যথার্থ জলাভিষেক ভিন্ন পবিত্রতা এবং শান্তি নাই।

গৃহে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ অশান্তি, পরিবারে পরিবারে বিবাদ অশান্তি, গ্রামে গ্রামে বিবাদ, নগরে নগরে বিবাদ, দেশে দেশে বিবাদ, জাতিতে জাতিতে বিবাদ, যুদ্ধ কলহ। অতএব সকলে প্রেমতৈল মাখিয়া শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া ব্রহ্মের শান্তি সমুদ্রে অবগাহন কর। পৃথিবীর সমস্ত অশান্তি কলহ নির্ব্বাণ হইবে, এবং ধরাতলে প্রেমরাজ্য শান্তিরাজ্য অবতীর্ণ হইবে। অশান্ত মানবপরিবার প্রশান্ত হইবে। আর কেহই অশান্তিরূপ শুষ্ক মরুভূমিতে থাকিয়া প্রাণ হারাইও না, সকলে মিলিয়া অগাধ অতলস্পর্শ অসীম ব্রহ্মজলে প্রবেশ কর। সেখানে ভক্ত মীন হইয়া ইহকাল পরকালে অপার আনন্দ ও সুখশান্তি সম্ভোগ কর। জলাভিষেক ভিন্ন নবজীবনের সঞ্চার হয় না। হোমাগ্নি দ্বারা পাপে বিকৃত পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ মনুষ্য দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হয়, সেই ভস্মের উপরে যখন ব্রহ্মের কৃপাবারি বর্ষণ হয়, তাহার মধ্য হইতে নূতন দ্বিজাত্মা উত্থিত হয়। অনুতাপাগ্নিতে পাপপ্রবৃত্তি সকল ভস্মীভূত হয়, পরে ঈশ্বরের কৃপাভিষেক দ্বারা সেই ভস্মীভূত মনুষ্যের ভিতর হইতে দ্বিজাত্মা পুণ্যাত্মা বাহির হয়।

অবতারবাদ।

রবিবার ১৩ই আষাঢ়, ১৮০৩ শক; ২৬শে জুন ১৮৮১।

হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে অবতারবাদ আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মের মধ্যেও অবতারবাদ আছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অবতার-বাদী। যে ব্রহ্ম ভূমা, মহান্, যিনি আপনার মহিমাতে আপনি পূর্ণভাবে স্থিতি করেন তাঁহাকে মানুষ স্বীকার করিল; কিন্তু তাহাতে মানুষের সকল ক্ষুধা শান্তি হইল না, তাহাতে মনুষ্যস্বভাবের সকল অভাব মোচন হইল না, এই জন্য মানবমণ্ডলী কাতরস্বরে প্রার্থনা করিল, "হে পরমাত্মন, হে ভূমা মহান্ ঈশ্বর, যদি তুমি জগতের নিকটে অপ্রকাশিত এবং অলক্ষিত থাকিবে, তবে জীবের পাপ দুঃখ যাইবে কিরূপে? তোমার অদর্শনে যে মানবকুল ভয়ানক মৃত্যু ও পাপগ্রাসে পতিত হইবে, অতএব হে ভগবন, তুমি অবতীর্ণ হও, তুমি জগতের নিকট সাধুচরিত্ররূপে প্রকাশিত হও।"

দুঃখী মানবজাতির এই কাতর প্রার্থনা শুনিয়া জীবের দুঃখহারী ভগবান আপনার দয়াকে সঙ্গে লইয়া, প্রেমপক্ষ বিস্তার করিতে করিতে ধরাধামে অবতরণ করিলেন। কিন্তু এই অবতরণ দুই প্রকার। এক ঈশ্বরের নিজের প্রকাশ, দ্বিতীয় তাঁহার পুত্রের প্রকাশ। হিন্দুধর্ম্মে অনেক অবতার, খ্রীষ্টধর্ম্মে একটী অবতার। পূর্ব্বদিকে যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত এবং প্রচলিত এবং পশ্চিমদিকে যে সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও

প্রচলিত, অবতারবাদসম্পর্কে, তাহাদিগের মধ্যে ভয়ানক বিভিন্নতা দেখা যায়। খ্রীষ্টবাদীরা যে ভাবে অবতারবাদী, হিন্দুরা সে ভাবে অবতারবাদী নহেন। অথচ হিন্দু এবং খ্রীষ্টান উভয়েই বিশ্বাস করেন অবতার ভিন্ন মোক্ষপথ জানা যায় না, জীবের সদ্গতি হয় না, বৈকুণ্ঠ লাভ হয় না।

এসিয়া খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক, ইউরোপ খণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক অবতারবাদী। কিন্তু অবতার কিরূপে হয়? অবতার কি? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের লোক ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দান করিবে। কেহ বলিবে ঈশ্বর স্বয়ং রাজা অথবা ফকির, বৃদ্ধ অথবা গোপাল ইত্যাদি নানা প্রকার রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। তাহাদিগের মতে জীবের অভাব অনুসারে নিরাকার ঈশ্বর পিতা, মাতা, গুরু, রাজা, প্রভু, বন্ধু, স্বামী, ভার্য্যা, তনয়, তনয়া প্রভৃতি নানা প্রকার সাকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।

হিন্দুদিগের এক সম্প্রদায়ের মতে সৃষ্টির মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম। বৃক্ষ লতা, জল, অগ্নি, বায়ু, ফল, পুষ্প, জীব, জন্তু, সমুদয়ই ব্রহ্ম। এ সকল ভ্রান্ত মতের মধ্য হইতে নববিধান মূল্য সত্য সংগ্রহ করেন। নববিধানবাদীগণ জানেন, নিরাকার ঈশ্বর কখনও সাকার হইতে পারেন না, স্রষ্টা কখনও সৃষ্ট হইতে পারেন না, তবে সাকার এবং সৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তি দিগের মধ্যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত, সর্ব্বমূলাধার

ঈশ্বর সকল শক্তির মূলশক্তিরূপে বর্ত্তমান থাকেন। সাকার মনুষ্য কখন ঈশ্বর হইতে পারে না। কিন্তু স্বয়ং ভগবান দেহধারী মনুষ্য, হিন্দু পৌত্তলিকদিগের এরূপ বিশ্বাস।

মানবশিশুর ক্ষুদ্র তনুর মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মাণ্ডপতি বসিয়া আছেন। শিশুর বাহু, শিশুর চরণ, শিশুর চক্ষু, শিশুর শ্রোত্র, শিশুর সমস্ত অঙ্গ কেবল ঈশ্বরের হস্তরচিত তাহা নহে, ঐ সমুদয় ঈশ্বরের হস্ত পদ। যত শিশু বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ততই স্বয়ং ভগবান তাহার সঙ্গে আপনার লীলা সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখন তাহার জীবনে লীলা শেষ হইল তখন তাহার শরীর হইতে ভগবানের অন্তর্ধান হইল। হিন্দুরা এইরূপ ঈশ্বরাবতার বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলেন, যখনই জগতে অসত্য বা অধর্ম্মের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই ঈশ্বর সেই অসত্য অধর্ম্ম দূর করিবার জন্য এক একজন অসাধারণ মানুষের আকারে অবতীর্ণ হইয়া আপনার লীলা সকল প্রকাশ করেন। পাপদৈত্য, পাপাসুর, রাবণ-দানব বধ করিবার জন্য সময়ে সময়ে এরূপ অবতারের প্রয়োজন হয়। অবতারের বাহ্যিক জীবন ঠিক মানুষের মত; কিন্তু অবতার সাধারণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত অলৌকিক ব্যাপার সকল সম্পাদন করিয়া আপনার পরিচয় দান করেন।

স্বয়ং ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মখণ্ড মনুষ্য-জীবনের মূলে থাকিয়া যখন পৃথিবীতে কার্য্য করেন তখনই অবতারের প্রকাশ হয়। হিন্দুদিগের অবতারবাদ মনুষ্য ও দেবতার সংযোগ নহে।

মনুষ্যাকারে যে পূর্ণ পরব্রহ্মের প্রকাশ অথবা লীলা, হিন্দুদিগের মতে তাহাই অবতার। অসীম শক্তিশালী ব্রহ্ম মনুষ্যাকারে স্থিতি করিয়া জীবোদ্ধারের জন্য যে সকল অলৌকিক অসাধারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাহাই অবতারের কার্য্য। যাঁহারা ইহা মানেন না তাঁহারা হিন্দু নহেন। হিন্দুস্থানের অবতারবাদ এইরূপ।

ইউরোপখণ্ডও অবতারবাদী, কিন্তু ইউরোপের অবতারবাদ হিন্দুস্থানের অবতারবাদের ন্যায় নহে। ইউরোপখণ্ড মহর্ষি ঈশাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করে। জেরুজেলাম এবং সমস্ত পৃথিবী যখন পাপদুঃখভারে কাতর হইয়া ভগবানের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিল, তখন ভগবান জগতের দুঃখ বিমোচন করিবার জন্য তাঁহার প্রিয় পুত্র ঈশাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন। যেমন আর্য্যজাতি বিশেষ বিশেষ সঙ্কটের সময় ভগবানের অবতারের আশা করিয়াছিল, সেইরূপ সমুদয় য়িহুদী জাতিও ঈশ্বরের অবতারের শুভাগমনের জন্য আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়াছিল।

ঈশার জন্ম হওয়াতে য়িহুদীদিগের সেই আশা পূর্ণ হইল। মহর্ষি ঈশা ঈশ্বরের পুত্রভাবের পূর্ণ অবতার। সেই স্বর্গীয় উচ্চ পবিত্র স্বভাববিশিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র ঈশার চরণে সমস্ত পশ্চিম ভূভাগ প্রণত হইল। দুই হাত তুলিয়া আমেরিকাখণ্ড এবং ইউরোপখণ্ড বলিতেছে, "ঈশাকে স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার মহীয়ান্ কর। ঈশাকে

মানুষ বলিও না, ঈশাকে সামান্য সাধু অথবা ঋষি বলিয়া ক্ষান্ত হইও না, প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জেরুজেলেম নগরের একজন সামান্য সূত্রধরের পুত্র আপনার গুণে পৃথিবীকে ভয়ানক আন্দোলনে আন্দোলিত করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিও না। ঈশার প্রাণের ভিতরে থাকিয়া সাক্ষাৎ ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান আপনার লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

তবে হিন্দুস্থানের অবতারের সঙ্গে ইউরোপখণ্ডের অবতারের প্রভেদ কি? হিন্দুদিগের মতে ভক্তপালন এবং দুষ্টদমন করিবার জন্য ঈশ্বর স্বয়ং মনুষ্যের আকারে অবতার হন; খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপখণ্ডের মতে, ঋষি খ্রীষ্ট মধ্যে ঈশ্বর পুত্ররূপে অবতীর্ণ। এ কথা নূতন কথা ঈশার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এ কথা কেহ শুনে নাই। হিন্দুদিগের মতে কৃষ্ণ রাম প্রভৃতি স্বয়ং ব্রহ্ম, অথবা সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার; কিন্তু য়িহুদীপ্রধান ঈশা স্বয়ং ভগবান নহেন, তিনি ভগবানের পুত্র। তবে খ্রীষ্টজগৎ যে ঈশ্বর এবং ঈশা এক অথবা স্বর্গীয় পিতা এবং স্বর্গীয় পুত্র অভিন্ন আত্মা, এই কথা বলেন ইহার গূঢ় অর্থ আছে। এই কথার মধ্যে মনকে নিবিষ্ট করিয়া ইহার নিম্নস্থ মুক্তা উদ্ধার করিতে হইবে।

বাস্তবিক ঈশ্বর এবং ঈশা এক ব্যক্তি নহেন; কিন্তু তাঁহারা দুই ব্যক্তি হইয়াও এক প্রাণ। বাইবেল গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্র ঈশা পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে ব্রহ্মবাণীরূপে, অথবা ব্রহ্মকৃপারূপে ব্রহ্মবক্ষে লুকায়িত ছিলেন। ঈশা

ব্রহ্মবাক্য, ঈশা ব্রহ্মতনয়, সুতরাং ব্রহ্মেতে এবং ঈশাতে প্রভেদ নাই, কেন না সন্তানের স্বভাবে পিতার স্বভাব প্রতিবিম্বিত হয়; তনয়ের মুখে পিতার মুখের লক্ষণ প্রকাশিত হয়। পৃথিবীতেও দেখা যায়, সন্তানের মুখে পিতা মাতার মুখের সাদৃশ্য থাকে। সন্তানের মুখে পিতা মাতার মুখের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বুদ্ধিমান লোকেরা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারেন, ইহারা অমুক ব্যক্তির সন্তান। এই যে পিতা পুত্রের মুখের সাদৃশ্য ইহার মধ্যে গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ঈশা ঈশ্বরের পুত্র, ঈশার মুখে ঈশ্বরের মুখের লাবণ্য ও লক্ষণ সকল প্রতিবিম্বিত। ঈশা তনয়জীবনের আদর্শ হইয়া জগতে প্রকাশিত হইলেন, ঈশার প্রকাশে ঈশ্বরতনয়ের মর্য্যাদা প্রকাশিত হইল। জগৎ পুত্রের মুখে পিতার মুখ দেখিতে পাইল। ঈশ্বর ভূমা, মহান্, অনন্ত, বৃহৎ, তাঁহার পুত্র ঈশা ক্ষুদ্র; ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পুণ্য, অনন্ত দয়া, ক্ষমা ধৈর্য্যের আধার; ঈশা পরিমিত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, দয়া, ক্ষমা ধৈর্য্যের আদর্শ অর্থাৎ পুত্রোপযোগী ভাবসমূহের আধার। পুত্রের স্বভাব চরিত্র, পিতার স্বভাব চরিত্রের অনুরূপ। পিতা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করেন পুত্রেতে, স্বয়ং পিতা পুত্রেতে বর্ত্তমান। যাঁহারা জায়াতত্ত্ব জানেন, যাঁহারা জায়া শব্দের প্রকৃত অর্থ জানেন, তাঁহারা বলেন মনুষ্য আপনি জায়ার মধ্যে আত্মজ, অর্থাৎ তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পুত্র কেবল পিতার সদৃশ নহেন; কিন্তু এক ভাবে

পুত্র আবার পিতা, কেন না পিতা স্বয়ং পুত্ররূপে প্রকাশিত হন।

পিতা যিনি তিনি স্বয়ং জীবিত থাকেন পুত্রের আকারে। সেইরূপে স্রষ্টা পিতা, জন্মদাতা পিতা পুত্রের আকারে আপনার মহিমা ও অসীম করুণা প্রকাশ করেন। অসীম ব্রহ্মাণ্ডের পিতা স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিলেন পুত্রের আকারে। তবে যিনি সমস্ত বিশ্বের স্রষ্টা তিনিই কি পুত্র? না। পুত্র স্বয়ং পিতা নহেন, কিন্তু পুত্র পিতার ক্ষুদ্র সংস্করণ। পিতা এবং পুত্র দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি; কিন্তু স্বভাব চরিত্রে অথবা স্বরূপতঃ তাঁহারা এক। পুত্রকে স্রষ্টা ঈশ্বর বলা পৌত্তলিকতা এবং ভয়ানক পাপ। নববিধানবাদী এই পাপে কলঙ্কিত হইতে পারেন না। ঈশ্বর স্রষ্টা, খৃষ্ট তাঁহার সৃষ্ট পুত্র, স্রষ্টা ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ, সৃষ্ট সন্তান উৎপন্ন। যে বলে খৃষ্ট স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, সে ভয়ানক পৌত্তলিক।

খৃষ্ট ঈশ্বরের পুত্র, খৃষ্টের জীবনে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার লক্ষণ সকল বিশেষরূপে প্রতিফলিত, এই জন্য খৃষ্ট বিশেষরূপে ঈশ্বরের অবতার। খৃষ্ট পিতৃভক্তি ও বাধ্যতার যেরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবী অন্য কাহারও জীবনে দেখে নাই। ব্রহ্মাণ্ডপতি স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সন্তান মহর্ষি ঈশার যেরূপ গূঢ় প্রাণগত যোগ হইয়াছিল সেরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। যতই আমরা ঈশার নিগূঢ় জীবন দেখিতে পাই,

ততই আমরা তাঁহাকে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে এক প্রাণ দেখিয়া বিমোহিত হই।

যদি ঈশ্বরের সঙ্গে ঈশার বিভিন্নতা দেখিতাম, তাহা হইলে ঈশাকে আমরা বিশেষভাবে ঈশ্বরের অবতার না বলিয়া ঈশাকে আমরা শত্রু বলিতাম। ঈশার মুখে আমরা বিশেষরূপে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বরের মুখের সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি এই জন্য আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া সম্মাননা এবং শ্রদ্ধা করিতেছি। ঈশ্বর আপনার মুখের ছাঁচে তাঁহার সন্তানের মুখ গঠন করিয়াছেন। এখানে শারীরিক মুখের কথা বলা হইতেছে না, কেন না ঈশ্বর নিরাকার এবং নিরবয়ব। ঈশ্বর চিন্ময় আত্মাস্বরূপ, সুতরাং তিনি তাঁহার আত্মার মুখের ছাঁচে অর্থাৎ তাঁহার আত্মার অনুরূপ তাঁহার সন্তানকে সৃজন করিয়াছেন।

ঈশ্বর স্বয়ং অনন্ত জীবন এবং সর্ব্বশক্তিমান; তাঁহার সন্তানকেও তিনি স্বর্গীয় জীবনের অধিকারী এবং নানা শক্তিবিশিষ্ট করিয়া সৃজন করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি চিন্ময় করিয়া গঠন করিয়াছেন। ঈশ্বর নিজে প্রেমস্বরূপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি প্রেমিক ও ভক্তিমান্ করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্মরাজ এবং পুণ্যস্বরূপ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি ধর্ম্মশীল করিয়াছেন। ঈশ্বর স্বয়ং আনন্দস্বরূপ তিনি নিজে পূর্ণানন্দ এবং নিত্যানন্দ; তাঁহার সন্তানকেও তিনি

তাঁহার অসীম সুখশান্তি ও অপার আনন্দের অধিকারী করিয়াছেন।

এইরূপে পরমাত্মার এবং জীবাত্মার এক একটী স্বরূপ ও লক্ষণ দেখিলে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বর এবং মনুষ্যের আত্মার সঙ্গে গাঢ় যোগ ও ঐক্য রহিয়াছে। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার বিশেষ সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। আধ্যাত্মিক স্বভাবের মিলন আছে বলিয়াই মনুষ্যাত্মাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যায়। মনুষ্যাত্মার সঙ্গে যদি পরমাত্মার সৌসাদৃশ্য না থাকিত তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরকে মনুষ্যের পিতা না বলিয়া, তাঁহাকে কেবল মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতাম। সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর, প্রস্তর, বৃক্ষ, লতা, মৎস্য, পশু, পক্ষী, নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি সমুদয় পদার্থেরই স্রষ্টা; কিন্তু তাঁহাকে কেহই এ সকল জড় পদার্থের অথবা আত্মা বিহীন জীবের পিতা বলিয়া সম্বোধন করে না। ঈশ্বর কেবল মনুষ্যের পিতা, কেন না মনুষ্যের আত্মার সঙ্গে তাঁহার আত্মার সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। আর সকল তাঁহার সৃষ্ট, কিন্তু তাঁহা হইতে বিভিন্ন প্রকৃতি; কিন্তু মনুষ্যই তাঁহার প্রকৃতিবিশিষ্ট।

মনুষ্যই কেবল ঈশ্বরের সন্তান; কেন না মনুষ্য স্বভাবে ঈশ্বরের স্বভাব প্রতিবিম্বিত। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বর-তনয় মহর্ষি ঈশা এই তনয়ত্বমত প্রচার করেন। প্রত্যেক মনুষ্য ঈশ্বরের তনয় এই স্বর্গীয় সত্য ঈশা আপনার রক্ত ও

প্রাণ দিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুস্থান-বাসীরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছেন পিতা স্বয়ংই পুত্রেতে জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ পিতা এবং পুত্রেতে কোন প্রভেদ নাই। এই গূঢ় তত্ত্বানুসারে স্বর্গস্থ পিতা ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহার পুত্র ঈশার সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া জেরুজেলাম নগরে সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য আপনাকে পুত্রের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর আপনি তাঁহার পুত্রের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনার মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন, এই জন্য ঈশ্বরতনয় মহর্ষি ঈশাকে দর্শন করিবার জন্য নানাদিক হইতে লোক সকল আসিয়াছিল।

বিশ্বাসী ভক্তগণ ঈশ্বরতনয়কে দেখিয়া বলিলেন, "সত্য সত্যই ঈশ্বর আপনার পুত্রের মুখে, আপনার মুখ আঁকিয়া দিয়াছেন।" পিতা ঈশ্বর অনন্ত জীবন এবং অনন্ত শক্তির আধার, ছোট ছেলে অল্প শক্তিবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম জ্ঞানের আকর, ছোট ছেলে অল্প জ্ঞানবিশিষ্ট। বড় পিতা অসীম প্রেমের সমুদ্র, ছোট ছেলে ক্ষুদ্র প্রেমের নদী। বড় পিতা অনন্ত পুণ্যের সূর্য্য, ছোট ছেলে অল্প পুণ্যের প্রদীপ। অতএব পুত্রকে পিতা বলিও না, জীবকে ভগবান বলিও না, অথবা জীবকে ভগবানের অবতারও বলিও না; কিন্তু জীবা-ত্মাকে ভগবানের পুত্র বল। পিতা পুত্র নহেন, ভগবান ভক্ত নহেন, অথচ পিতা পুত্রে ও ভগবান ভক্তে ঐক্য এবং স্বভাব ও প্রেমের অভেদ আছে, ইহা মানিলেই প্রকৃত অব-

তারবাদ মানা হইল। এই পিতাপুত্রের ঐক্যবাদ অবতারবাদের যথার্থ অর্থ।

ভয় এবং প্রেম।

রবিবার, ২০শে আষাঢ়, ১৮০৩ শক; ৩রা জুলাই ১৮৮১।

পৃথিবীতে যখন প্রেমের আবির্ভাব হয়, তখন ভয়ের তিরোভাব হয়। য়িহুদীদিগের ভয়শাস্ত্র যখন শেষ হইল, তখন ঈশার প্রেমশাস্ত্র বিরচিত হইল। যখন ভয়ের পুরাতন বিধান সমাপ্ত হয়, তখন প্রেমের নূতন বিধান সমাগত হয়। এক দেশে অথবা এক সময়ে ভয় ও প্রেম উভয়ে একত্র পরস্পরের পার্শ্বে বসিয়া রাজ্যশাসন করিতে পারে না। যখন একজন রাজ্য শাসন করে, তখন আর এক জনকে সিংহাসন ত্যাগ করিতেই হইবে; যত দিন ভয়ের রাজ্য তত দিন প্রেম দূরে, এবং যখন প্রেমের রাজ্য আরম্ভ হয় তখন ভয় দূর হয়।

প্রেমের ধর্ম্ম সাহসের ধর্ম্ম। ভয়ের ধর্ম্ম ভীরুতা বৃদ্ধি করে। প্রেমের ধর্ম্মে ভীরুতা স্থান পায় না। ভয়ের ধর্ম্মে নিয়মের ভয় বিধির ভয়, শাসনের ভয়, দণ্ডের ভয়। প্রেমের ধর্ম্মে ভয় নাই, যাঁহারা প্রেমের অধীন তাঁহারা নির্ভয় এবং সাহসী। যত দিন মনুষ্যের অন্তরে প্রেমোদয় না হয়, তত দিন সে ভয়ের অধীন। এই জন্যই প্রত্যেক মনুষ্য এবং

প্রত্যেক জাতি বাল্যাবস্থায় নানা প্রকার নিয়ম ও ভয়ের দ্বারা শাসিত হয়। পরে যখন বয়োপ্রাপ্ত হয় তখন প্রেমের দ্বারা চালিত হয়। যখন প্রেমের সুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, তখন ভয়ের ভীষণ আকৃতি সকল পলায়ন করে।

প্রতি মনুষ্যের জীবনে কিংবা প্রত্যেক জাতির জীবনে ক্রমে ক্রমে প্রেমসূর্য্য সমুদিত হইয়া ভয়ের অন্ধকার নাশ করে। যখন প্রেমসূর্য্যের উদয় হয়, যখন সাধকের মনে প্রগল্‌ভা ভক্তির সঞ্চার হয়, তখন আর ভয় থাকিতে পারে না। প্রকৃত ব্রহ্মভক্ত, যথার্থ ঈশ্বর প্রেমিক, ভয়ের অতীত। পূর্ণ প্রীতি ভয়কে বিনাশ করে। যাঁহারা পূর্ণ প্রীতি এবং প্রগল্‌ভা ভক্তির সহিত প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের পূজা করেন, তাঁহারা নির্ভয়।

নববিধান পূর্ণ প্রেমের ধর্ম্ম। নববিধানসূর্য্যের অভ্যুদয়ে ভয়বিভীষিকার ধর্ম্ম চলিয়া গিয়াছে। নববিধানের ঈশ্বর অনন্ত প্রেমের আধার। নববিধানের দেবতা কখনও প্রেম-শূন্য হইয়া তাঁহার কোন সন্তানকে পরিত্যাগ কিম্বা অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহার অনেক কুসন্তান আছে, কিন্তু কেহই তাঁহার ত্যাজ্য সন্তান নহে। তিনি স্বয়ং পূর্ণপ্রেমস্বরূপ, তাঁহার প্রেমের বিকার কিম্বা পরিবর্ত্তন নাই। যাঁহারা এই নববিধানের ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন, কোন বিপদ দুর্ঘটনা তাঁহাদিগকে নিরাশ করিতে পারে না। যাহারা এই যথার্থ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে পারে না,

তাহারাই নানা প্রকার ভয়ে পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে।

ব্রহ্মবাদী গুরু বলিলেন, "হে সাধক, তুমি নিরাকার ব্রহ্মকে ধ্যান কর।" এই উপদেশ শ্রবণ মাত্র দুর্ব্বল সাধক ভয়ে বিকম্পিত হইল এবং নিরাকার ভাবিতে গেলে পাছে অন্ধকার দেখিয়া আরও ভয় পাইতে হয়, এই আশঙ্কায় ব্রহ্মজ্ঞানী আচার্য্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া, পৌত্তলিকতার শরণাগত হইল, কেন না সাকার পুতুল পূজা এবং সাকার পুতুল ধ্যান করা সহজ। দুর্ব্বল মনুষ্যের পক্ষে নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যান অত্যন্ত কঠিন। এই জন্য নিরাকার ব্রহ্ম ধ্যানের কথা শুনিয়া দুর্ব্বল সাধকেরা পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং কাশী, বৃন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু দুর্ব্বল সাধকেরা যেমন নিরাকার ব্রহ্মধ্যানের ভয়ে পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিল, তেমনি আবার অপ্রেমিক ভীরু ব্রাহ্মেরা পৌত্তলিকতার ভয়ে পৌত্তলিকতার মধ্যে যে সকল সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব রহিয়াছে, সে সমস্তও পরিত্যাগ করিল।

এক ভাবে এই প্রথম অবস্থার ভীরু ব্রাহ্ম পৌত্তলিকদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, কেন না ইহাঁরা এক নিরীশ্বর জগৎ কল্পনা করেন, ইহাঁদিগের মতে সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর নাই; ইহাঁরা বলেন চন্দ্র, সূর্য্য, সাগর, পর্ব্বত, পুষ্প লতাদির মধ্যে ঈশ্বর আছেন মনে করা কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা। এ

সকল ভীরু ব্রাহ্ম বলেন, "পৌত্তলিকতা ছাড় এবং পৌত্তলিকতার মধ্যে সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি, ব্রহ্মদর্শন, দৈববাণী শ্রবণ, নৃত্য, গীত, উন্মত্ততা যাহা কিছু আছে সমস্ত ছাড়।" কে এই কথা বলিতেছে? ভয়।

প্রেমিক সাহসী ব্রাহ্মেরা এই ভয়কে ঘৃণা করেন। তাঁহারা ভীরুতা পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিকদিগের মধ্যেও ঈশ্বরের যে সকল ঐশ্বর্য্য আছে কৃতজ্ঞহৃদয়ে এবং ভক্তির সহিত সে সমস্ত গ্রহণ করেন। তাঁহারা সাহসমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারা নির্ভয়ে সকল স্থান হইতে ঈশ্বরের ভাব ও সত্য সকল সংগ্রহ করেন। তাঁহারা কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ঘৃণা করেন না। তাঁহারা বলেন, "আমাদিগের ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী, তিনি সকল দেশের এবং সকল জাতির ঈশ্বর। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মাবলম্বীর পিতা, তিনি সর্ব্ব ঘটে প্রতিষ্ঠিত। তিনি রাম, কৃষ্ণ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি সকলের অন্তরাত্মা। তিনি মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৎস্য, কীট প্রভৃতি সমুদয় জীবের জীবন। তিনি নদীর মধ্যে, তিনি বৃক্ষের মধ্যে, তিনি জীবের মধ্যে, তিনি পুতুলের মধ্যে, তিনি সর্ব্ববস্তুতে বিরাজমান।"

প্রেমিক ব্রাহ্মের মুখে এ সকল সাহসের বাক্য শুনিয়া ভীরু দুর্ব্বল ব্রাহ্ম "ভয়ানক পৌত্তলিকতা! ভয়ানক পৌত্তলিকতা!" চীৎকার করিয়া এই কথা বলিতে বলিতে পলায়ন করিল। ভীরু ব্রাহ্ম সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টাকে দেখিতে ভয় করে।

অল্পবিশ্বাসী ভীত ব্রাহ্ম সংসারের ঘটনাবলীর মধ্যে মঙ্গলময় বিধাতার হস্ত দেখিতে পায় না। তাহার মতে সংসারে ঈশ্বরের বৈকুণ্ঠ নাই; সাংসারিক কোন ব্যাপারের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নাই, সংসার ঈশ্বরবিহীন, সংসারে মানুষ আপনি আপনার কর্ত্তা।

বাস্তবিক অল্পবিশ্বাসী ভীরু ব্রাহ্ম নাস্তিকের ন্যায় এক নিরীশ্বর জগতে বাস করে। তাহার মতে ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে হরি নাই; জলে হরি নাই, স্থলে হরি নাই, অনলে হরি নাই, অনিলে হরি নাই, চন্দ্রে হরি নাই, সূর্য্যে হরি নাই। তাহার অন্ধ অবিশ্বাসী চক্ষে সমস্ত সৃষ্টি হরিশূন্য। সে সর্ব্বদাই পৌত্তলিকতার ভয়ে সশঙ্কিত। যখনই সে দেখিতে পায় যে কেহ কোন সৃষ্ট বস্তুর নিকটে প্রণত হইতেছে তখনই সে ভয়ে অবসন্ন হয়। সে ভয় এবং দুঃখের সহিত বলে "কেন লোকে গঙ্গার বন্দনা করে? কেন তাহারা স্নানের পর সূর্য্যকে নিরীক্ষণ করিয়া সূর্য্যকে প্রণাম করে? কেন তাহারা বৃক্ষ পূজা করে? শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য হইয়া জড়পূজা? কি কলঙ্ক!"

এ সকল ভাবিতে ভাবিতে ক্ষীণ বিশ্বাসী ব্রাহ্ম ভয়ে অবসন্ন হইয়া পৌত্তলিকতার দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধির নৌকারোহণ করিয়া এক কল্পিত ব্রহ্মবিহীন জগতে প্রবেশ করে। সে মনে করে সেখানে পৌত্তলিকতার কোন ভয় নাই। সেখানে একটী বৃক্ষ নাই, যাহাতে হরি আছেন,

সেখানে একটী নদী নাই যাহাতে হরি আছেন, সেখানে একটী জীব নাই যাহার মধ্যে হরি অবস্থিতি করেন, সেখানকার সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ হরিবিহীন। হরিবিহীন দেশ, হরিবিহীন নগর, সেখানে কোন প্রকার পৌত্তলিকতার বিভীষিকা নাই। সেই রাজ্যে বস্তুপূজা নাই, জীবপূজা নাই। অনায়াসে সেখানে নিরাকার ব্রহ্মপূজা করা যায়। অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্ম এই ভাবিয়া পৌত্তলিকতার ভয়ে নাস্তিকতা অথবা মিথ্যা কল্পনার পথ অবলম্বন করে। অল্পবিশ্বাসীর এরূপ অধোগতি দেখিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিব, না দয়া সম্বরণ করিব?

যেখানে ভয়ে পলায়ন, সেখানে প্রেম নাই। ভীরু অপ্রেমিক ব্রাহ্ম পৌত্তলিকতার ভয়ে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে বিদায় করিয়া দিল, কিন্তু সাহসী প্রেমিক ব্রাহ্ম সৃষ্ট প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে হরির বর্ত্তমানতা অনুভব এবং স্বীকার করেন। সাহসী ব্রাহ্ম বলেন, কেবল একটী অশ্বত্থ অথবা বটবৃক্ষের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে হইবে না; কিন্তু লক্ষ লক্ষ বৃক্ষের মধ্যে সর্ব্বগত হরিকে দেখিতে হইবে, কেবল গঙ্গানদীর মধ্যে জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীকে দেখিলে হইবে না; কিন্তু সমুদয় নদীর মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এইরূপে বীর ব্রহ্মজ্ঞানী দ্বারা পৌত্তলিকতার ভয় দূরীভূত হইল। কারণ পৌত্তলিকতার অর্থ কি? ভূমা মহান্ বিরাট ঈশ্বরকে সঙ্কীর্ণ করিয়া কোন একটী

পরিমিত স্থানে বদ্ধ করা, সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে কেবল একটী পুতুল কিম্বা একটী বৃক্ষে প্রতিষ্ঠিত মনে করাই পৌত্তলিকতা। কিন্তু হরিময় জগৎ ইহা স্বীকার করিলে আর পৌত্তলিকতার ভয় থাকে না।

যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী বলেন, সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের সত্তায় পরিপূর্ণ, এমন কোন সৃষ্টবস্তু নাই যাহার মধ্যে স্রষ্টা বর্ত্তমান নহেন, যাহারা জগৎকে ঈশ্বরবিহীন মনে করে তাহারা নাস্তিক। বাস্তবিক ঈশ্বরপূর্ণ জগৎকে নিরীশ্বর মনে করা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মকে বিদায় করিয়া দিয়া তাঁহাকে অন্ধকার শূন্য মধ্যে নিক্ষেপ করা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। কিন্তু সঙ্কীর্ণকে বিস্তীর্ণ করা, সকল স্থান হইতে সত্য সংগ্রহ করা, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এবং সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অধিষ্ঠান স্বীকার করা যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম! কোন একজন সাধুর পক্ষপাতী হইয়া অপর সাধুগণকে ভণ্ড অথবা প্রবঞ্চক মনে করা ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে; কিন্তু পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে গ্রহণ করা, সমুদয় সাধু অবতারের মধ্যে ঈশ্বরের বিচিত্র লীলা ও রূপ গুণ দর্শন করা যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম।

পৌত্তলিকদিগের মতে কোন একটী বিশেষ বৃক্ষে, কোন একটী বিশেষ নদীর মধ্যে অথবা কোন একজন সাধু অবতারের মধ্যে ঈশ্বর বদ্ধ। প্রকৃত ব্রাহ্ম দিব্য চক্ষে দেখিতে পান, শুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্ম কোন এক স্থানে বদ্ধ নহেন, তিনি সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী। হে মুক্তিপ্রার্থী সাধকগণ, আগে তোমরা

ব্রহ্মকে সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত কর, তবে তো তোমরা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। আগে দেবমুক্তি হউক, পরে জীবের মুক্তি। হে ভ্রান্ত জীব, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, বিরাট ব্রহ্মকে কেন তুমি একটী ক্ষুদ্র বট অথবা অশ্বত্থ গাছের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিলে? যদি মুক্তি চাও, এই মিথ্যা ভ্রম দূর কর। মিথ্যা মুক্তি দিতে পারে না, সত্যই কেবল মুক্তি দান করিতে পারে। দিব্যজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মকে মুক্ত করিয়া সমুদয় বিশ্বের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর।

চক্ষু খুলিয়া দেখ ব্রহ্মময় এই জগৎ, সর্ব্বত্র ব্রহ্ম, তিনি কোন একটী বৃক্ষে কিম্বা কোন একটী স্থানে বদ্ধ নহেন। স্বর্গ হইতে নববিধান অবতীর্ণ হইয়া পৌত্তলিকতার সকল বন্ধন ছেদন করিয়া জগতের নিকট ঈশ্বরকে বন্ধন মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। নববিধান বলিতেছেন, "বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্মশাস্ত্রই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতেছে।" হরি, ব্রহ্ম, যিহোভা প্রভৃতি সমুদয় নাম সেই এক ঈশ্বরকেই দেখাইয়া দিতেছে। নববিধানের প্রভাবে ঈশ্বর বন্ধনমুক্ত হইলেন। নববিধান উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, "ঈশ্বর সকল দেশের এবং সকল জাতির দেবতা; তিনি কোন একটী বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ে কিম্বা কোন এক দেশে বদ্ধ নহেন।" পৌত্তলিকদিগের মতে হরি বদ্ধ; নববিধানবাদী ব্রাহ্মের মতে হরি মুক্ত। এক বৃক্ষে হরি, এক গ্রন্থে হরি, এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ে হরি, ইহা

পৌত্তলিকতা। সর্ব্বত্র হরি, ইহা নববিধান অথবা প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম।

হে ভ্রান্ত মনুষ্য, তুমি কি মনে কর তোমার হুকুমে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর সমুদয় সাগর ছাড়িয়া কেবল গঙ্গাতে আসিয়া বাস করিবেন? তোমার উপদেশে কি অনন্ত ঈশ্বর তাঁহার অনন্তব্যাপ্তি কাটিবেন? ঈশ্বর কদাচ তাঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। অতএব কেহই আর পৌত্তলিকতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইও না। হে ভীরু ভ্রান্ত ব্রাহ্ম, তোমাকেও বলি, তুমি কি মনে কর তুমি পাছে পৌত্তলিক হও এই ভয়ে মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার জগৎ সংসার ছাড়িয়া অন্ধকার মধ্যে গিয়া বাস করিবেন? তোমার ভয়ে কি মনুষ্যসমাজ নিরীশ্বর হইবে? ধিক্ তোমার ভয়ে, ধিক্ তোমার মতে, তুমি বিরাট ঈশ্বরকে কাটিয়া খর্ব্ব করিতে চাও? সাবধান সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত ঈশ্বরকে ক্ষুদ্র, পরিমিত, বদ্ধ মনে করিও না, এবং তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র মনে করিও না। ভূমা মহান্ ঈশ্বর কেবল ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিয়া বিচিত্র লীলা করিয়াছেন, এবং অপর কোটি কোটি মনুষ্যের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল না এরূপ মনে করিও না।

সত্য ধর্ম্ম, মুক্তির ধর্ম্ম, প্রেমের ধর্ম্ম, সাহসের ধর্ম্ম, প্রত্যেক মনুষ্য জীবনে হরিলীলা প্রদর্শন করে। হরিময় এই জগৎ,

তোমার আমার তাঁহার সকলের জীবনে হরি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। প্রাণস্বরূপ হরি বিনা কি কেহ বাঁচিতে পারে? বিশ্বাসচক্ষু খুলিয়া দেখি, যিনি আমার হরি তিনিই তোমার হরি। তোমার হরি আমার ভিতরে, আমার হরি তোমার ভিতরে। আহার করিতে যাই দেখি অন্নের মধ্যে হরি। জল পান করি, দেখি জলের ঘটীর ভিতরে হরি আপনার পবিত্র আবির্ভাব দ্বারা জলকে উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। যে দিকে তাকাই সেই দিকেই হরি। যে কোন বস্তু অথবা জীবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহারই মধ্যে হরিকে দেখিতে পাই। তুমি আমার বাড়ীতে বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, ফল, গো, অশ্ব প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলে, আমিও তোমার বাড়ীতে অন্ন, বস্ত্র, পশু, পক্ষী প্রভৃতির মধ্যে হরিকে দেখিলাম। কোথায় পৌত্তলিকতা?

নববিধানের নিশান যে দিন উড়িয়াছে, সে দিন পৌত্তলিকতার ভয় চলিয়া গিয়াছে। এক সাধুর বক্ষের ভিতরে ছিলেন যে হরি, নববিধানের আবির্ভাবে সকল সাধুর বক্ষের ভিতরে সেই হরি প্রকাশিত। এক গঙ্গা অথবা এক জর্ডন নদীতে ছিলেন যে ঈশ্বর, নববিধানের প্রভাবে আজ সেই ঈশ্বরকে সকল নদীতে এবং সমস্ত জলে দেখিতেছি। কি সুখের নববিধান! আমাদের কত সৌভাগ্য, আমরা দেখিতেছি জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল। ভক্তের চক্ষুরূপ দুই

দ্বার উক্ত হইয়াছে, সেই দুই দ্বার দিয়া দশ দিক হইতে হরি আসিয়া ভক্তের হৃদয়গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য হরিলীলা! ভক্তের অন্তর বাহির এবং দশ দিক হইতে হরিজ্যোতি বাহির হইতেছে। কি ভয়ানক হরির তেজ! ফাটিল ব্রহ্মাণ্ড ঘর, এবং বিরাট মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় হরি বাহির হইলেন, পৌত্তলিকতার মৃত্যু হইল, পবিত্র নববিধান, সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম মহীয়ান্ হইল।

যোগী অক্ষয় এবং অপার।

রবিবার ৩রা শ্রাবণ, ১৮০৩ শক; ১৭ই জুলাই ১৮৮১।

মুনিঃ প্রসন্ন গম্ভীরো দুর্ব্বিগাহ্যো দুরত্যয়ঃ।
অনন্ত পারোহ্য ক্ষোভ্য স্তিমিতোদ ইবার্ণবঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত। ১১। ৮। ৫।

অস্যার্থঃ। যোগী প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির গম্ভীর দুরবগাহ্য অক্ষয় ও অপার এবং তিনি কিছুতেই ক্ষুব্ধ হয়েন না।

এই মাত্র আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের যে কথা শ্রবণ করিলাম ইহা সত্য। যোগী ব্যক্তি সত্য সত্যই সমুদ্রের ন্যায় অক্ষয়, অপার ও দুরবগাহ্য। কিন্তু এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বর ও মনুষ্যে প্রভেদ রহিল কোথায়? যোগী কিরূপে যোগেশ্বরের তুল্য হইবে? উপাসক কিরূপে উপাস্য দেবতার গুণবিশিষ্ট হইবে? পরিমিত মানুষ কিরূপে অনন্ত

দেবতার স্বভাব লাভ করিবে? যোগী যোগসাধন বলে যতই উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হউন না, তথাপি তাঁহার বুদ্ধি, ভাব ধর্ম্ম সকলই ক্ষুদ্র ও পরিমিত। তাঁহার মনের সমুদয় ভাব অন্তবিশিষ্ট। মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণ, মন, হৃদয়, আত্মা সকলই সীমাবদ্ধ, মানুষের কিছুই অসীম অথবা পূর্ণ নহে। তবে কেন শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে, যোগী ব্যক্তি অক্ষয় অপার ও দুরবগাহ্য। অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় অর্থ আছে।

বাস্তবিক মানুষ যোগী হইলে অক্ষয় ও অপার হয়। জীবাত্মা যখন যোগ প্রভাবে ক্রমে ক্রমে অনন্তের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন আর তাহার অন্ত জ্ঞান থাকে না, তাহার ক্ষুদ্রতা বোধ থাকে না। তখন সে অনন্তের সঙ্গে একাত্মা হইয়া আপনাকে আপনি অনন্ত মনে করে, তাহার আর স্বতন্ত্রতা ও ক্ষুদ্র বুদ্ধি থাকে না। এই অসীমতা জীবের নহে, ইহা পরমাত্মার। জীব যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন দিয়া পরমাত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন সে অসীমতা বুঝিতে পারে। যেমন ক্ষুদ্র নদী যতক্ষণ আপনার দুই দিকে তট দেখিতে দেখিতে চলিতেছিল, ততক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ জানিতেছিল; কিন্তু যখন অকূল সাগরে ঝাঁপ দিল, তখন অনন্ত সাগরে মগ্ন হইয়া আর আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিতে পারিল না; সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবাত্মা যতক্ষণ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে, ততক্ষণ আপনাকে সীমাবদ্ধ দেখিতে পায়;

কিন্তু যখনই সে অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে ডুবিয়া যায় তখন আর আপনার ক্ষুদ্রত্ব দেখিতে পায় না।

ক্ষুদ্র নদীর জল অসীম সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া আপনাকে অনন্ত ও অকূল মনে করে; সেইরূপ ক্ষুদ্র জীব যোগবলে ভূমা মহান বিরাট ঈশ্বরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাকে ব্রহ্মময় জ্ঞান করে, আপনার সর্ব্বাঙ্গে এবং সকল শক্তিতে সেই অনন্ত ব্রহ্মকে দেখিতে পায়। বাস্তবিক ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মনুষ্য এমন অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে, যে অবস্থায় সে আপনাকে অনন্ত ব্রহ্মের অংশ অথবা সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করে। হে মনুষ্য, যতক্ষণ তুমি তোমার মধ্যে বদ্ধ থাক, ততক্ষণ তোমার শক্তি, ভক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি সকলই অল্প এবং অন্তবিশিষ্ট; কিন্তু যখন তুমি স্বার্থ এবং মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া অনন্ত সমুদ্রস্বরূপ ঈশ্বরেতে নিমগ্ন হও তখন অনন্ত জীবন, অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অপার প্রেম এবং অসীম পুণ্য শান্তিতে লীন হইয়া যাও।

অনন্তের সঙ্গে যখন ক্ষুদ্রের যোগ হয় তখন আর ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রতা থাকে না। বস্তুতঃ মনুষ্যসন্তান অনন্ত ঈশ্বরের অংশ, এবং অনন্তকাল সেই অনন্তস্বরূপে আরাম ও সুখ শান্তি সম্ভোগ করিবার জন্য সৃষ্ট। যত দিন সে তাহার সেই অনন্তস্বরূপ পিতাকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন সে ক্ষুদ্র নীচ জীবন ধারণ করে; কিন্তু যখনই তাহার মন জাগ্রৎ হয়, এবং অনন্ত ঈশ্বর যে তাহার পিতা ইহা তাহার স্মরণ

হয়, তখন সে সন্তপ্তচিত্তে ও কাতর স্বরে বলে, "পিতা গো একবার হের গো আমায়, আর সহে না প্রাণে। তোমারি সন্তান হয়ে রয়েছি কাঙ্গালের প্রায়।" তখন সে তাহার স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নীচ আমিত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাহার পিতার অসীম মহিমা ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যসাগরে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা করে এবং মহাযোগবলে সেই অনন্ত সাগরে আপনার নিকৃষ্ট আমিত্ব বিলুপ্ত করিতে বাসনা করে।

এই পিতাপুত্ররহস্য অতি নিগূঢ় এবং আনন্দজনক। ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন, কিন্তু পুত্র পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কি ঈশ্বর একাকী ছিলেন? পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে কি ঈশ্বর পিতৃত্ববিহীন ছিলেন? অর্থাৎ পুত্র বিনা যখন কেহই পিতা হইতে পারে না, তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে পুত্র জন্মিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর পিতা ছিলেন না। কিন্তু ঈশ্বর কখনই পুত্রবিহীন ছিলেন না। ঈশ্বর নিত্য পিতা, তিনি অনন্তকাল পিতা। ঈশ্বরেতে এমন কোন সম্পর্ক নাই যাহার আদি অন্ত আছে। এই ভাবে তাঁহার পুত্রও অনন্ত ও অক্ষয়। কেন না তাঁহার পুত্র পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্ত ভাবে তাঁহার বক্ষের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলেন ইহা সত্য, কিন্তু তিনি কোথা হইতে এবং কিরূপে সৃষ্ট হইলেন? অকস্মাৎ শূন্য হইতে কি ঈশ্বরের পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন? সন্তানের কোন উপকরণ ছিল না, অথচ

হঠাৎ কি সন্তান জন্মিল? অথবা ঈশ্বর কি মৃত্তিকা, প্রস্তর, অথবা অন্য কোন ভৌতিক পদার্থ লইয়া তাঁহার সন্তান গঠন করিলেন? না। শূন্য হইতে সন্তান জন্মে নাই এবং কোন সৃষ্ট জড় কিম্বা চেতন বস্তুর সমষ্টি দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার সন্তানকে গঠন করেন নাই। তাঁহার সন্তানের ভাব উপকরণ তাঁহার প্রাণের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল।

অপ্রকাশ সন্তান স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতেছিল, অব্যক্ত পুত্র অনাদি অনন্ত পিতার মনের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল; সুতরাং পিতা হইতে পিতার মূর্ত্তি লইয়া শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, আনন্দ, পিতার এই পাঁচটী স্বরূপ লইয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। পিতার বক্ষে পুত্র অব্যক্ত ভাবে ছিল। পিতা ডাকিলেন, "সন্তান আয়," সন্তান আসিল। পিতার ইচ্ছাতে অপ্রকাশিত সন্তান প্রকাশিত হইল। গর্ভস্থ সন্তান যেরূপ আভ্যন্তরিক নাড়ীদ্বারা জননীর শোণিত গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করে, অব্যক্ত সন্তানও সেইরূপ ঈশ্বরের মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া ঈশ্বরের জীবনে জীবিত ছিল; কিন্তু যখন সন্তান পৃথিবীতে প্রকাশিত হইল তখন কি সে পিতা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া স্বাধীন হইল? ঘটিকাযন্ত্র যেমন ঘটিকাযন্ত্রনির্ম্মাতার শক্তি ও সাহায্য ভিন্ন আপনা আপনি চলিতে পারে, ঈশ্বর সন্তানও কি সেইরূপ ঈশ্বরের শক্তি ও সাহায্য ভিন্ন পৃথিবীতে স্বতন্ত্রভাবে আপনা আপনি কার্য্য করিতে পারে? ঈশ্বর এবং তাঁহার সন্তানের সঙ্গে কি

ঘটিকাযন্ত্রনির্ম্মাতা ও ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় সম্পর্ক? না। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার সন্তানের এরূপ সম্পর্ক নহে।

ঈশ্বর তাঁহার সন্তানের জীবনের জীবন এবং তিনি তাঁহার সন্তানের সকল শক্তির মূল শক্তি। তাঁহার সন্তান তাঁহাকে ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না, একটী চিন্তা করিতে পারে না, একটী কার্য্য করিতে পারে না। পিতাকে দূরে রাখ পুত্রের আর অস্তিত্ব থাকিবে না। পৃথিবীর পিতাপুত্রের সম্পর্ক অপেক্ষাও ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তানের সম্পর্ক অত্যন্ত নিগূঢ় এবং অখণ্ড প্রাণযোগে সংযুক্ত। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মি; সেইরূপ ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তান। যেমন সূর্য্যাস্ত হইলে আর সূর্য্যের কিরণ থাকে না, সেইরূপ পিতার শক্তির তিরোভাব হইলে আর পুত্রের আবির্ভাব থাকে না।

পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে এক পদ চলেন? পিতার শক্তি ভিন্ন সন্তানের সাধ্য কি যে একটী সচ্চিন্তা পোষণ করেন, কিম্বা একটী সংকার্য্য করেন? যাঁহারা জ্যোতির তত্ত্ব শিখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন জ্যোতির মূল বন্ধ করিলে বাহিরে সমস্ত জ্যোতি নির্ব্বাণ হইয়া যায়; সূর্য্য অস্তমিত হইলে অমনি পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। তেমনি পিতা তাঁহার শক্তি প্রত্যাহার করিলে পুত্রের আর কোন ক্ষমতা থাকে না। যতক্ষণ আকাশে সূর্য্য উদিত থাকে, ততক্ষণ কোটি কোটি ক্রোশ আলোকে উজ্জ্বলিত;

কিন্তু যখনই সূর্য্যের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয়, তখন আর বিন্দু-মাত্র আলোক থাকে না। সেইরূপ যতক্ষণ পিতা পুত্রের মধ্যে বর্ত্তমান, ততক্ষণ পুত্রের মহাগৌরব এবং উৎসাহ; কিন্তু পিতা হইতে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন কর, পুত্র নিতান্ত অপদার্থ এবং মৃতপ্রায়। বাস্তবিক পুত্র বিনা পিতা থাকিতে পারেন না এবং পিতা বিনা পুত্র থাকিতে পারে না। ঈশ্বর এক, পিতৃত্ব এক, পুত্রত্বও এক।

ঈশ্বরের এক আদর্শ পুত্র হইতে বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করিতেছে। রক্ত মাংসের পুত্র ঈশ্বরের পুত্র নহে। ঈশ্বরের পুত্রত্ব কোন বিশেষ জাতির উপরে নির্ভর করে না। তাঁহার এক পুত্র, তাঁহার এক আদর্শ পুত্র। তাঁহার গৃহে হিন্দু পুত্র নাই, বৌদ্ধ পুত্র নাই, ইংরাজ কিম্বা খ্রীষ্টান পুত্র নাই, মুসলমান পুত্র নাই। তাঁহার পুত্র আত্মাস্বরূপ এবং তাঁহার অনুরূপ। ঈশ্বর নিজে যেমন হিন্দু, খ্রীষ্টান মুসলমান কিছুই নহেন, সকল প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ ও উপাধিবিবর্জ্জিত, তাঁহার আত্মিক সন্তানও সেইরূপ সকল প্রকার বাহ্যিক লক্ষণ ও উপাধিবিবর্জ্জিত। তাঁহার পুত্রের জাতিভেদ, বর্ণভেদ, কিম্বা ধর্ম্মভেদ নাই।

সূর্য্য হইতে যেমন সহস্র সহস্র রশ্মি নির্গত হইয়া সহস্র দিক আলোকিত করে; কিন্তু সমুদয় রশ্মিই এক পদার্থ; সেইরূপ ঈশ্বরের এক পুত্রভাব হইতে কোটি কোটি পুত্র জন্ম ধারণ করিয়া জগতের অজ্ঞান ও পাপ দুঃখের অন্ধকার

দর করিতেছে। যেমন প্রকাণ্ড জ্বলন্ত অগ্নি হইতে চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ সকল ধাবিত হয়, সেইরূপ এক অনন্ত ঈশ্বর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কিম্বা সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় তাঁহার ছোট ছোট সন্তানেরা জগতের হিত-সাধন করিতেছে। সকলেই তাঁহার এক পুত্রভাব প্রকাশ করিতেছে।

যেমন সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে নির্গত হইয়া সমস্ত সৌরজগৎকে আলোকিত করে; কিন্তু কিরণ কোটি কোটি যোজন দূরে গিয়াও বলিতে পারে না, যে "এখন আমি সূর্য্য হইতে বহু দূরে আসিয়াছি, এখন সূর্য্য না থাকিলেও আমি আমার কার্য্য করিতে পারি।" সেইরূপ ঈশ্বরের সন্তান স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াও ঈশ্বরবিহীন হইয়া মুহূর্ত্তের জন্যও কিছুই করিতে পারে না। সন্তানের চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা, সকলই তাহার পিতা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত এবং ঈশ্বরেরই। যেমন সূর্য্যের কিরণ সূর্য্য হইতে স্বতন্ত্র নহে, সেইরূপ ঈশ্বরের সন্তান অথবা সেই সন্তানের শক্তি, জ্ঞান, প্রেম পুণ্য ও শান্তি ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র নহে। সন্তানের সমস্ত সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, তাহার পিতার সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য। সন্তানের নিজের কিছুই নাই। যেমন সূর্য্য বলিতে পারে না আমার কিরণ আমার নহে, তেমনি ঈশ্বর বলিতে পারেন না আমার সন্তান আমার নহে। সূর্য্য যেমন কিরণ বিনা থাকিতে পারে না তেমনি পিতা পুত্র ছাড়া থাকিতে পারেন না।

জগতে যতগুলি সূর্য্যকিরণ বিকীর্ণ হয় সমুদয় সূর্য্যের মধ্যে থাকে, সেইরূপ জগতে যতগুলি ঈশ্বরসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলে অব্যক্ত সন্তানরূপে ঈশ্বরের বক্ষে নিদ্রিত থাকেন।

শরীর পৃথিবীর প্রণালী অনুসারে ভৌতিক নিয়মে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু ঈশ্বরের সন্তান ভৌতিক নিয়মানুসারে জন্মগ্রহণ করেন না। এই জন্য খ্রীষ্ট শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে মেরীতনয় মহর্ষি ঈশা পবিত্রাত্মার সন্তান। ঈশ্বরের শক্তি, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের পুণ্য এবং ঈশ্বরের শান্তি লইয়া সেই নরোত্তম ব্রহ্মকুমার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তোমার মধ্যে, সমুদয় মনুষ্যের মধ্যে, সেই কুমারের ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের রাজা ঈশ্বরের সন্তানকে বিশেষ অর্থে কুমার বলা যাইতে পারে। কুমার বলিলেই রাজার মহিমা স্মরণ হয়। রাজার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই, রাজভাব নাই, অথচ কুমার ইহা হইতে পারে না। রাজকুমার রাজার গৌরব এবং রাজশ্রী ও রাজপ্রতাপের অধিকারী। প্রত্যেক নর নারী ব্রহ্মকুমার এবং ব্রহ্মকুমারী; অর্থাৎ প্রতি জন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের অধিকারী এবং অধিকারিণী। ঈশ্বর সন্তান ঈশ্বরের সমুদয় প্রকৃতি ও শক্তির অধিকারী।

ব্রহ্মতনয় ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছুই করিতে পারে না। পিতাকে ছাড়িয়া পুত্র বাঁচিতে পারে না। জগৎ

কর্ত্তাকে ছাড়িয়া জগৎ এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্যশিশু যত দিন স্তন পান করে তত দিন মাতার উপরে নির্ভর করে, যত দিন অক্ষম থাকে, তত দিন পিতার উপর নির্ভর করে, যখন বালক বর্দ্ধিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, তখন আর সে পিতা মাতার উপর নির্ভর করে না। এ দৃষ্টান্ত ব্রহ্মতনয়ে খাটিবে না। ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মতনয়ের সেরূপ সম্পর্ক নহে। মনুষ্যশিশু প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পিতা মাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মতনয় কখনও ব্রহ্মকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না।

যেমন সূর্য্যের কিরণ সূর্য্যের সঙ্গে চিরসংযুক্ত, সেইরূপ ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মের সঙ্গে গূঢ় প্রাণযোগে চিরসম্বদ্ধ। যেমন সূর্য্য নাই অথচ সূর্য্যের জ্যোতি আছে, ইহা ভাবা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্ম নাই অথচ ব্রহ্মতনয় আছে, ইহা ভাবা যায় না। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মতনয় সংযুক্ত। ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মতনয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবা যায় না। যোগেতে এই অভিন্নতা বিশেষরূপে উপলব্ধ হয়। যোগে পিতা পুত্রের ভেদ থাকে না, সেই এক অনন্ত ব্রহ্ম পুত্রকে গ্রাস করিয়া ফেলেন। তখন জলেতে জল, জ্যোতিতে জ্যোতি। যেমন ক্ষুদ্র নদী সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে সেই নদীর আর ক্ষুদ্রতা ও স্বতন্ত্রতা থাকে না, সেইরূপ ক্ষুদ্র জীবাত্মা অসীম সমুদ্রস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলে তাহার আর ক্ষুদ্রতা ও স্বতন্ত্রতা বোধ থাকে না। তখন সেই যোগী ব্যক্তি অক্ষয়, অপার ও দুরবগাহ্য।

যোগী তখন আপনার জীবনস্বরূপ ক্ষুদ্র গঙ্গার শাদা জল দেখিতে পায় না, কিন্তু উর্দ্ধে নিম্নে, অন্তরে বাহিরে ও চারিদিকে অনন্তজীবনস্বরূপ ব্রহ্মসমুদ্রের গাঢ় সুনীল জল দেখিতে পায়।

যোগবিহীন অবস্থায় ভেদজ্ঞানে থাকে, যোগে সমস্ত একাকার। অতলস্পর্শ ব্রহ্মসমুদ্রে মগ্ন হইয়া যোগীর মন অক্ষয়, অপার ও দুরবগাহ হয়। হে মনুষ্য, তোমার দেহ ব্রহ্মতনয় নহে। ব্রহ্মতনয় তোমার দেহের মধ্যে আছেন সত্য; কিন্তু ব্রহ্মতনয় তোমার দেহের বাহিরেও আছেন। কেন না ব্রহ্মতনয় জড়দেহে বদ্ধ নহেন। দেহ ব্রহ্মতনয়ের বাড়ী নহে; কলিকাতা, ভারতবর্ষ, এসিয়া, কিম্বা ইউরোপ অথবা সমস্ত পৃথিবীও ব্রহ্মতনয়ের পূর্ণ বাসগৃহ নহে, ব্রহ্মতনয় এ সকল দেশে আছেন অথচ এ সকল দেশের অতীত। এই শতাব্দী কিম্বা অন্য শতাব্দী ব্রহ্মতনয়ের সমগ্র জীবন নহে। ব্রহ্মতনয় কালাতীত। প্রকৃত ব্রহ্মতনয় কোন দেশে কিম্বা কোন কালে বদ্ধ নহেন; ব্রহ্মতনয় অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতেছেন। ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার বাসগৃহ। যে ব্রহ্মতনয় বিহঙ্গের ন্যায় এই শরীর পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া অনন্তচিদাকাশস্বরূপ ব্রহ্মের মধ্যে বিচরণ করেন, সেই যোগী আত্মাই যথার্থ আমি। হে ব্রাহ্ম, এই ব্রহ্মতনয় তত্ত্ব অতি অদ্ভুত তত্ত্ব, অতি মধুর তত্ত্ব! এই তত্ত্ব সাধন কর, এই তত্ত্বরস আস্বাদন কর, অপার ও বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিবে।

ধর্ম্ম স্বাভাবিক।

রবিবার, ১০ই শ্রাবণ, ১৮০৩ শক; ২৪শে জুলাই ১৮৮১।

হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি যেরূপ সাধন কর না কেন তুমি কদাচ স্বভাবের বিরোধী হইও না। স্বভাব ঈশ্বরের ভাব, অতএব স্বভাবকে অবহেলা করিও না। ভক্তির সহিত স্বভাবের দেবতাকে পূজা কর। ব্রহ্মপ্রকৃতিকে পূজা কর। স্বভাবের স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দাও। কেন না স্বভাব ও ব্রহ্মেতে প্রভেদ নাই। প্রকৃতিদেবী ঈশ্বরের শক্তি। স্বভাব শব্দের অর্থ আত্মার ভাব। স্ব শব্দের অর্থ ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মা; সুতরাং স্বভাব অর্থ ব্রহ্মের ভাব, ঈশ্বরের ভাব। বাস্তবিক স্বভাব দেবভাব। যিনি স্বভাবের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত হইলেন, তিনি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত হইলেন। যিনি স্বভাবের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত তিনি ঈশ্বরকে কাটিতে উদ্যত। যিনি স্বভাবের বন্ধু তিনি ঈশ্বরের বন্ধু, যিনি স্বভাবের শত্রু তিনি ঈশ্বরের শত্রু; যাহা অস্বাভাবিক তাহা ঈশ্বরের বিরুদ্ধ, যাহা স্বাভাবিক তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং অনুমোদিত।

যে ব্যক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত, সে ঈশ্বরের ধর্ম্মপথে চলিতেছে; আর যে অস্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত, সে ধর্ম্মভ্রষ্ট। স্বভাবই ধর্ম্ম, স্বভাব লঙ্ঘন অধর্ম্ম। আত্মার স্বভাব, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, স্বর্গ, মুক্তি, একই পদার্থ। পক্ষান্তরে

স্বভাব হইতে বিচ্যুতি, অথবা আত্মার বিকার, পাপ, নরক একই কথা। অতএব হে প্রকৃত ধর্ম্মার্থী, তুমি স্বাভাবিক ধর্ম্মে ধার্ম্মিক হও। নববিধান স্বভাবের ধর্ম্ম। প্রকৃত নববিধানবাদী স্বভাব মন্ত্রে দীক্ষিত, স্বভাবের অন্যথাচরণ করা তিনি পাপ মনে করেন। কুটিল, অস্বাভাবিক পথকে নববিধানবাদী ঘৃণা করেন, তিনি সহজে স্বভাবতঃ তাঁহার সরল হৃদয়ে হরিপাদপদ্ম ধারণ করেন। যদি প্রকৃত ঈশ্বরকে চাও তবে স্বভাবকে অবজ্ঞা করিও না।

স্বাভাবিক না হইলে, সহজ মানুষ না হইলে, কেহই ঈশ্বরের ভাব বুঝিতে পারে না। অস্বাভাবিক, বিকৃত লোকেরা ঈশ্বর হইতে বহু দূরে। স্বভাব আমাদিগের গুরু। ধ্রুব নারদ প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ ভক্তগণ স্বভাবের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হে ঈশ্বরার্থী, তুমি স্বভাবের পথে চলিলে ঈশ্বরকে পাইবে। যদি তুমি স্বভাবের সহজ পথ পরিত্যাগ করিয়া তোমার আপনার বিকৃত কল্পনা অনুসারে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রণালী অবলম্বন কর, তাহা হইলে তুমি প্রকৃত ঈশ্বরকে পাইবে না।

উপাসনার সময় তোমার মুখভঙ্গীতে কিম্বা হস্ত, পদ, মস্তকাদি, চালনাতে যদি কিছু অস্বাভাবিক থাকে, অথবা তোমার কণ্ঠের স্বর যদি কিঞ্চিৎমাত্রও বিকৃত হয়, তাহা হইলে স্বভাবের ধর্ম্ম নববিধান বলিবেন, "এ ব্যক্তি আমার ছাত্র নহে।" যদি যথার্থ জীবন্ত ঈশ্বরের সাধক হইতে চাও

তবে স্বভাববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে। অস্বাভাবিক সমস্ত পরিত্যাগ করিলে তবে প্রকৃতরূপে ধর্ম্ম-সাধন আরম্ভ করিতে উপযুক্ত হইবে। অতএব হে সাধনার্থী, সাধনের পূর্ব্বে তোমার শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা সমস্ত স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

সর্ব্বপ্রথমে শরীরকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র সাধনে নিযুক্ত করিবে না, সাধনের সময় যে ভাবে শরীরকে রাখিলে স্বভাব সন্তুষ্ট হয় সেই ভাবে শরীরকে রাখিবে। যদি কোন ভাবে বসিলে শরীরের কষ্ট হয়, সে ভাবে বসিবে না। চক্ষু নাসিকা প্রভৃতিকে কোন প্রকার অস্বাভাবিক, উৎকট অবস্থায় অবস্থিত হইতে দিবে না। যে ভাবে মস্তক, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি রাখিলে মন নিরুদ্বেগ ও শান্ত থাকে, সেই ভাবে শরীরের অঙ্গ সকল রাখিবে। সর্ব্বতো-ভাবে স্বভাবের সঙ্গে মিলিয়া ধর্ম্ম সাধন করিবে।

অস্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি, প্রকৃতি সহজে ঈশ্বরের ইচ্ছা, রুচি ও অনুরাগ প্রদর্শন করেন, অতএব প্রকৃতিদেবী আমাদিগকে যে শিক্ষা দান করেন, তদনুসারে চলিলেই আমরা প্রকৃত ঈশ্বরকে লাভ করিব এবং আমাদিগের ধর্ম্ম প্রকৃতিমূলক সত্য ধর্ম্ম হইবে। যদি প্রকৃতির বিরুদ্ধে, অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির বিরুদ্ধে আমরা কোন প্রকার কল্পিত ধর্ম্ম সাধন করি, তাহা হইলে আমাদিগের বিকৃতি ও

মৃত্যু হইবে। স্বভাবের বিরোধই বিকার। জীবনের সকল বিষয়ে ও সকল কার্য্যে যদি আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা স্বভাবের অধীন অর্থাৎ ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন রহিয়াছি তাহা হইলে আমাদিগের মনে স্ফূর্ত্তি ও শান্তি থাকে। আর যখনই আমরা স্বভাবভ্রষ্ট হই, যখনই স্বেচ্ছাচারী হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ধর্ম্মব্রত পালনে উদ্যত হই, তখন কিছুতেই আমাদিগের মনে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ থাকে না।

ঈশ্বর দর্শন যে এত বড় ব্যাপার ইহা যদি স্বাভাবিক হয় তবেই সাধকের কল্যাণ হয়, ইহা যদি অস্বাভাবিক হয় তবে সাধকের জীবনে অনেক বিপদের আশঙ্কা। ব্রহ্ম-দর্শনের সময়, ধ্যানের সময়, কত লোক মুখকে বিকটাকার করে, চক্ষুকে ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া লয় এবং নানা প্রকার ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গী করে এবং কেহ কেহ নিঃশ্বাস বন্ধ করে, কিন্তু এ সকল অস্বাভাবিক উপায়ে কদাচ ব্রহ্মদর্শন হয় না। যেমন সহজে ও স্বাভাবিক নিয়মে শরীরের নিঃশ্বাস প্রশ্বাস-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেইরূপ সহজে ও স্বভাবতঃ যদি জীবাত্মা পরমাত্মাকে দেখিতে পায়, সেই দর্শনই যথার্থ ব্রহ্মদর্শন।

চক্ষু যেমন সহজে সৃষ্টি ও সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, শ্রোত্র যেমন সহজে বাহিরের শব্দ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করে, হস্ত যেমন সহজে বাহিরের বস্তু সকল স্পর্শ, করে সেইরূপ অন্তরের বিশ্বাসচক্ষু যখন সহজে ব্রহ্মদর্শন করে, অন্তরের

বিবেককর্ণ যখন সহজে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করে এবং হৃদয়ের ভক্তি হস্ত যখন সহজে ব্রহ্ম পাদপদ্ম স্পর্শ করে, সেই সহজ অবস্থায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ সকলই যথার্থ ও অকৃত্রিম। তখন স্বভাব আপনি বলিয়া দেয় "হাঁ, ঠিক ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণ ও ব্রহ্মস্পর্শ হইয়াছে।" নতুবা নানা প্রকার কষ্টে মস্তিষ্ক আলোড়ন এবং চিত্ত বিলোড়ন করিয়া যে ব্রহ্মদর্শন করিবার চেষ্টা তাহা অস্বাভাবিক এবং বিফল। সে কল্পনার ব্রহ্মদর্শন, সেই দর্শন হইতে অমৃত উৎপন্ন না হইয়া বরং বিষ এবং মৃত্যু উৎপন্ন হয়। সেই কল্পিত ব্রহ্মদর্শন শত্রুর প্রদত্ত বিষাক্ত ফল।

অস্বাভাবিক কিছুই ভাল নহে। যাহারা অস্বাভাবিকরূপে যোগ, ধ্যান অথবা ব্রহ্মদর্শন করিতে চেষ্টা করে, তাহারা আত্মপ্রবঞ্চিত হয়। কোন কোন ভ্রান্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা চক্ষু মুদিত ও নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া ব্রহ্মকে এক প্রকার জ্যোতিঃস্বরূপ কল্পনা করে এবং নানা প্রকার চমৎকার জ্যোতি দর্শনের গল্প করিয়া জগৎকে আশ্চর্য্য করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু সে সমস্ত দর্শন অসত্যমূলক, সুতরাং তদ্দ্বারা মুক্তি ও অনন্ত জীবন লাভের প্রত্যাশা নাই। যথার্থ ব্রহ্মদর্শন সহজ ও স্বাভাবিক। যেমন চক্ষু খুলিলেই সম্মুখস্থ গোলাপ কিম্বা পদ্ম দেখিতে পাই, তেমনই অন্তরের চক্ষু খুলিয়া যখন সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মকে দেখিয়া বলি, "ব্রহ্ম তুমি আছ," তখনই যথার্থ ব্রহ্মদর্শন হয়।

যুক্তি, তর্ক ও বিচার করিয়া যে ব্রহ্মের অস্তিত্ব নিষ্পন্ন করা তাহা ব্রহ্মদর্শন নহে। যখন ব্রহ্মদর্শন হয়, তখন তাহা অতি সহজে হয়, এক নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন হয়। নতুবা এক বৎসর কিম্বা এক শতাব্দীতেও ব্রহ্মদর্শন হয় না, কেন না ব্রহ্ম কেবল স্বাভাবিক সরল সাধকের নিকটেই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। কুটিল অস্বাভাবিক লোক বহুকাল সহস্র প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াও তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না। ঈশ্বর সরলতার বন্ধু। মহাপাপীও যদি সরল অন্তরে তাঁহাকে ডাকে ঈশ্বর তাহাকে দর্শন দেন, আর ধর্ম্মাড়ম্বরপ্রিয় কুটিল ব্যক্তি যদি লক্ষ বার তাঁহাকে ডাকে, তথাপি সে তাঁহার দেখা পায় না।

যেমন ঈশ্বরদর্শন সহজ ও স্বাভাবিক, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধি লাভ করাও সহজ এবং স্বাভাবিক। যখন হইবার তখন এক মিনিটের মধ্যে হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয়; আর যাহার সহজে শুদ্ধ হইবার ইচ্ছা না হয়, সে বহুকাল নানা প্রকার কঠোর সাধন করিলেও জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। যদি তেমন ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বল হয়, এক পলকের মধ্যে রিপু জয় করিতে পারিবে, আর যদি তেমন ইচ্ছা ও সঙ্কল্প না হয়, তবে যুক্তি ও বাহ্যিক সাধন দ্বারা দশ বৎসরেও ইন্দ্রিয়দমন করিতে পারিবে না। একবার যদি দুর্জ্জয় ব্রহ্ম-বলে বলী হইয়া জোরের সহিত বলিতে পার, "আর মনের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মায়া, অহঙ্কার, হিংসা, স্বার্থপরতা

প্রভৃতি কিছুই পোষণ করিব না," তখনই এ সকল দুরন্ত রিপু তোমার হৃদয় হইতে পলায়ন করিবে। তখন দেখিবে আর তোমার মনে আসক্তি নাই, রাগ নাই, হিংসা নাই এবং শরীরে অন্য কোন প্রকার রিপুর উত্তেজনা ও জ্বালা নাই। এইরূপে যদি পার এক মিনিটে মনঃসংযম এবং ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিতে পারিবে, নতুবা চল্লিশ বৎসরেও পারিবে না।

যেমন ইচ্ছা হইলেই পলকের মধ্যে দাঁড়াইতে পার, কিম্বা উপর দিকে হাত তুলিতে পার, তেমনই ইচ্ছা হইলেই বিপথ হইতে সুপথে, পাপ হইতে পুণ্যের দিকে মনকে ফিরাইতে পার। যেমন শরীর সঞ্চালন সহজ ও স্বাভাবিক, তেমনি মন ফেরান সহজ ও স্বাভাবিক। ঐ তোমার সমক্ষে পুষ্প পল্লবে সজ্জিত একটী সুন্দর বৃক্ষ রহিয়াছে; যদি তুমি ইচ্ছা কর পলকের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবে, তাহা দেখিবার জন্য চক্ষু ঘর্ষণ কিম্বা অন্য কোন প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না। সহজে শীঘ্র তাহা দেখিতে পাইবে। এই মন্দিরের মধ্যে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কি কেহ বলিতে পারেন বস্তু দর্শন বহু আয়াস সাধ্য এবং কালসাপেক্ষ। সকলেই এক বাক্যে বলিবেন বস্তুদর্শন অতি সহজ, অনায়াসসিদ্ধ এবং কিছুমাত্র সময়সাপেক্ষ নহে।

হে নির্ব্বোধ মন, যদি বাহিরের ও দূরের বস্তু অতি সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে দেখা যায়, তবে যিনি তোমার প্রাণের প্রাণ, যিনি তোমার অন্তরতম, নিকটতম, তাঁহাকে

দর্শন করিতে কি তোমার অধিক সময় লাগিবে? ব্রহ্মদর্শন সময়ের অতীত। নিমেষের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন হয়। যদি একবার সরলভাবে হরিকে ডাকিতে পারে, তবে নিমেষে পাতকী স্বর্গে গিয়া ব্রহ্মদর্শন লাভ করে। হে ব্রহ্মপদার্থ, তুমি অত্যন্ত নিকটে আছ, অথচ আমাদিগের বিকৃত মন তোমাকে দেখিতে পাইতেছে না। চক্ষের সম্মুখে তুমি রহিয়াছ, অথচ আমরা চক্ষু রগড়াইতেছি। নির্ম্মল স্বচ্ছ স্বভাবকে আমরা বিকৃত ও মলিন করিয়াছি, তাই আমাদিগের এই দুর্দ্দশা।

মনের সহজ অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন সহজ, আর বিকৃত অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন অসম্ভব। যেমন ব্রহ্মদর্শন সহজ ও স্বাভাবিক তেমনই ব্রহ্মবাণী শ্রবণ ও ব্রহ্মস্পর্শও সহজ এবং স্বাভাবিক। যেমন শরীরের কাণ পাতিয়া থাকিলেই বাহিরের শব্দ শুনিতে পাই, সেইরূপ ভিতরের বিবেককাণ পাতিয়া রাখিলে অতি সহজে আমরা ব্রহ্মবাণী শুনিতে পাই; আর যদি পাপের কুমন্ত্রণা ও কোলাহল শুনিতে শুনিতে বিবেককর্ণকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখি, তবে লক্ষ বৎসরেও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ হইবে না। নির্ম্মল বিবেক যেমন সহজে ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করে, ভক্তিহস্ত তেমনি সহজে ব্রহ্মপাদস্পর্শ করে।

অস্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ, ব্রহ্মস্পর্শ, সকলই অসম্ভব। মন স্বাভাবিক থাকিলে এক পলকের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মশ্রবণ এবং ব্রহ্মস্পর্শ হয়, আর মন বিকৃত

থাকিলে চল্লিশ বৎসরেও দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ কিছুই হয় না। বাস্তবিক ঈশ্বরের রাজ্যে চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা এক শুভ মুহূর্ত্তের মূল্য অধিক। পৃথিবীর চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা স্বর্গের এক মিনিট অধিক মূল্যবান, ইহাতে আর সন্দেহ কি? অনেকেই এই কথা জানেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে একখানি দীর্ঘ চিঠি লেখা যাইতে পারে; কিন্তু অল্প শব্দে একখানি ভাল চিঠি লিখিতে অধিক সময়ের প্রয়োজন। অল্প সময়ে বাহুল্য লেখা হয়; কিন্তু ভাল লেখাতে অধিক সময় লাগে। খুব বুদ্ধি চালনা এবং বিচার করিয়া লিখিতে হইলে অধিক সময়ের আবশ্যক; কিন্তু হৃদয়ের ভাবে চালিত হইয়া লিখিলে অল্প সময়ের মধ্যেও সহজে অনেক লেখা যায়। সেইরূপ যাহারা বুদ্ধি ও যুক্তি দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ করিতে চায়, তাহাদিগের অনেক সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু যাহারা সরল হৃদয়, তাহারা অনায়াসে পলকের মধ্যে ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্ম-শ্রবণ এবং ব্রহ্মস্পর্শ করে।

পৃথিবীর বুদ্ধির লক্ষ বৎসর অপেক্ষা স্বর্গের সরলতার এক পলকের মূল্য অধিক। পৃথিবীর ঘড়ী, কলিযুগের ঘড়ী নরকের সময় রাখিতেছে। এ সকল ঘড়ী স্বর্গের শুভ মুহূর্ত্ত প্রকাশ করিতে পারে না। তুমি শাক্য ও ঈশাকে জিজ্ঞাসা কর পাপ জয় করিতে কত সময় লাগে। তাঁহারা বলিবেন এক মিনিট। দুর্জ্জয় তেজের সহিত ঈশা বলিলেন, "দূর হও সয়তান্," আর এক মিনিটের মধ্যে চিরকালের জন্য

সয়তান ঈশাকে পরিত্যাগ করিল। সেইরূপ তেজস্বী শাক্য দেব প্রতাপের সহিত বলিলেন, "দূর হও মার," আর মার তৎক্ষণাৎ চিরকালের জন্য শাক্যকে পরিত্যাগ করিল।

প্রত্যেক সাধু বলিবেন, হয় সহজে ও এক মিনিটে রিপু দমন করিবে, নতুবা ত্রিশ হাজার বৎসরেও রিপুজয় করিতে পারিবে না। অস্বাভাবিক উপায়ে প্রকৃতরূপে ব্রহ্মদর্শন কি মনঃসংযম কিছুই হয় না। স্বভাব লঙ্ঘন করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া যদি তুমি আপনি আপনার পরিত্রাণের ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে তোমার যত্ন বিফল হইবে। ঈশ্বরাধীন, স্বভাবাধীন হইয়া যদি সাধন কর, তবে এক শুভ মুহূর্ত্তে, এক শুভ লগ্নে তুমি সিদ্ধ হইবে, আর যদি স্বভাবের বিরুদ্ধে তুমি চল্লিশ বৎসর সূর্য্যের দিকে তাকাইয়া থাক, উপবাস কর, জাগরণ কর, কিম্বা কণ্টকশয্যায় শয়ন কর, অথবা গ্রীষ্মকালে অগ্নির মধ্যে বাস এবং শীতকালে জলের মধ্যে বাস কর, কিম্বা ঊর্দ্ধবাহু হইয়া থাক, তথাপি প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি এবং ব্রহ্মলাভ করিতে পারিবে না। সহজ স্বাভাবিক সাধনে পলকের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করিবে, আর অস্বাভাবিক সাধনে শতবর্ষেও কিছু হইবে না।

বিধাতা কি সময়ে কার্য্য করেন? না। তিনি একেবারে পলকের মধ্যে মহাব্যাপার সকল সম্পন্ন করেন। তাঁহার বিধি পলকের বিধি। যিনি কালাতীত, তাঁহার সময়ের প্রয়োজন কি? তিনি নিত্য, তিনি যাহা করেন,

একেবারে করেন। যেমন পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ ছুটে, তেমনি পলকের মধ্যে সমস্ত বিশ্বময় তাঁহার দয়া ছুটিতেছে। তিনি এক শতাব্দীতে অমুক জাতির মধ্যে, অন্য শতাব্দীতে আর এক জাতির মধ্যে, অদ্য এই নগরে, কল্য ঐ নগরে প্রবেশ করিলেন তাহা নহে। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী এরূপ নহে। তিনি অপরিবর্ত্তনীয়, সুতরাং সময়ে তাঁহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। পলকের মধ্যে তিনি ভক্তকে দর্শন দেন, পলকের মধ্যে তিনি পাপীর উদ্ধার করেন। তাঁহার ইঙ্গিতে ভক্ত পলকের মধ্যে ভবসাগর পার হইয়া যায়। পলকের মধ্যে নিত্যানন্দের জাহাজ ভবসাগরের এ পার হইতে ও পারে চলিয়া যায়।

যখন মন প্রকৃতিস্থ হয়, যখন মন ব্রহ্মযোগে যোগী হয়, তখন পলকের মধ্যে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বর্গের সুধা পান করে। এই পলকতত্ত্ব বড় মধুর তত্ত্ব। পলকেতে ব্রহ্মের সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, কোন কার্য্য সমাধা করিতে ব্রহ্মের চেষ্টা কিম্বা বিলম্ব হয় না। বিদ্যুতের গতি অপেক্ষাও ব্রহ্মের গতি দ্রুতগামিনী। তাড়িতের গতি অপেক্ষাও ব্রহ্মকৃপার গতি ভক্তকে অধিক বিস্মিত করে। এই অর্দ্ধ মিনিট আগে পাপী নরকের গভীরতম স্থানে পতিত ছিল, আর ব্রহ্মকৃপাবলে এখনই সে আনন্দময়ীর চরণে উপস্থিত। স্বর্গের প্রত্যেক ব্যাপার এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে হয়। পলক অশ্বের উপরে আরোহণ করিয়া ভক্ত নিমেষের মধ্যে স্বর্গে প্রবেশ

করিয়া যুধিষ্ঠির ঈশা প্রভৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হন। পলকের মধ্যে ভক্ত সমস্ত স্বর্গ দর্শন করেন, এবং পলকের মধ্যে ভক্ত সমস্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেন। এই পলকতত্ত্ব বিশ্বাস কর, কৃতার্থ হইবে। পলকের মধ্যে এ পাপরাজ্য ছাড়িয়া আনন্দময়ী মাকে দেখিতে যাও। মাকে দেখিতে যাইতে দেরি করিও না।